কর্ণফুলী

বারীন্দ্রনাথ দাশ

প্রথম প্রকাশ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬১

প্রকাশক

নির্মলকুমার সরকার

ক্যালকাটা বুক ক্লাব লিমিটেড

৮[illegible] হ্যারিসন রোড কলিকাতা ৭

মুদ্রাকর

সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রতিভা আর্ট প্রেস

১১৫এ আমহার্স্ট স্ট্রীট কলিকাতা ৯

প্রচ্ছদ

[illegible] সরকার

ব্লক

টাওয়ার হাফটোন কোং

মুদ্রণ

দি নিউ প্রাইমা প্রেস

দাম তিন টাকা

[এক]

কর্ণফুলী—।

পূবসীমান্তের সবুজ আর নীলাভ ধূসর পাহাড় থেকে বেরিয়ে পড়ে শাল আর দেবদারু আর সেগুন বন পেছনে ফেলে রাঙামাটির পাশ কাটিয়ে সমতল ভূমিতে পড়বার আগে বয়ে আসতে হয় অনেকখানি আঁকাবাঁকা পথ। সেখানে নেই নানান জাতের নেয়েদের নৌকো বেয়ে আসা যাওয়া। সেখানে শুধু কখনো বা বুনো হরিণের জল খেতে এসে চমকে ওঠা, জলের বুকে নিজের বেপথুমানা ছায়া দেখে। আর কখনো বা পাহাড়িয়া মেয়ের জল নিতে এসে চুপ করে বসে থাকা বড়ো পাথরের টুকরোর উপর, কালো মাটির কলসিটি এক পাশে নামিয়ে রেখে। নেহাত যদি কেউ জংলা পাহাড়ের আড়াল খুঁজে, নিঃশঙ্ক দৃষ্টি চারিদিকে বুলিয়ে, লাল সাদা সুতোর কাজ করা কালো বসনের অন্তরাল থেকে নিটোল দেহটি উন্মুক্ত করে নেমে পড়ে ফটিকের মতো জলে, লজ্জা পেয়ে পালায় শুধু আশেপাশের ঘন গাছগুলোর নানা রঙের পাখীরা। ওরা তখন আর মুখ দেখায় না, শুধু গান শোনায়। পাহাড়ি মেয়ে যখন অবগাহনের শেষে জল থেকে উঠে পড়ে জল নিয়ে চলে যায়, আর বনের আড়ালে দ্রুত লুকিয়ে যায় বাদামী-গায়ে-সাদা-সাদা-ফুটকি কাজল-চোখ হরিণ, একটা বিপুল স্তব্ধতা নামে চারদিকে, যেই স্তব্ধতায় সৃষ্টির আরম্ভ, যেই স্তব্ধতা এখনো ক্ষুব্ধ হয়নি। পাখীর কাকলিতে সেই স্তব্ধতা ক্ষুন্ন হয় না;

পাখির কাকলি যেন সেই শুরুতারই পরিপূরণ। নিঝুম সন্ধ্যায় সেখানে পাহাড়ের ওপার থেকে চাঁদ উঠে আসে বাইরের দুনিয়ায় সবার সামনে মুখ দেখানোর আগে নদীর জলের আয়নায় একবার শেষবারের মতো নিজের চাঁদমুখখানি দেখে নিতে। জ্যোৎস্নার প্রসাধনের শেষ ছোঁয়াটি দিয়ে তারায় তারায় ঝলমলো রাত্তিরের নীল ব্রোকেডের অবগুণ্ঠনখানি ভালো করে টেনে নেয়, তারপর মেঘে মেঘে ভেসে চলে আরো দূর পশ্চিমে। আর নদীর বুকে কুয়াশা নামে ঘুম ঘুম ঠাণ্ডায়।

রাঙা মাটির জঙলা দেশের পাতা ঝিরঝির দীর্ঘ রাত যখন ফিকে হয়ে আসে নাগকেশরের ক্রমশ মদীর হয়ে ওঠা গন্ধে, সারারাত জাগা কোকিলের তখনো শেষ না হওয়া গান শুনে বাঁশবনের ওপার থেকে চুপচাপ উঁকি মারে সোনালী-লাল সূর্য, আর নানারঙের বৈচিত্র্য জাগে পাহাড়ি ফুল আর বুনো অর্কিডে। নানা রঙে রঙিন সেই রাঙা মাটির দেশ আরো পেছনে ফেলে কর্ণফুলী কলস্বরে নেমে আসে দক্ষিণ-পশ্চিমের সমতল ভূমিতে। এপার ওপারের বিস্তীর্ণ শ্যামলিমায় মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ তখন থেকেই। ঘন গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে দেখা দেয় ছবির মতো গ্রাম, দূরান্ত কুটীরের সোনালী খড়ের চালে চালে লাউ কুমড়োর ফিকে সবুজ আভাষ। কোথাও বা অশথবটের ছায়ায় নৌকোর ঘাট। তিন চারটে ডিঙি নৌকো বাঁধা। তারই কোনো একটায় জেলেদের বাচ্চা ছেলে বসে জাল বোনে হয়তো। নদীর কোলে এখানে সেখানে দু'একটা ছোটো বড়ো চর। একপাশে দু' চারটে নৌকো বাঁধা। ছইয়ের ভিতর থেকে হুঁকোর আওয়াজ অস্পষ্ট ভেসে আসে নদীর হাওয়ায়। দু'একটা নৌকো ভাসে জলের উপর। সেদিক থেকে নদীর বুকে জাল ছোঁড়ার ঝুপঝাপ শব্দ।

ওপারের হাটে অস্পষ্ট কোলাহল। এপারের খেয়াঘাটে খাঁটিতে প্রায় ভরে ওঠা খেয়ার নৌকো বাঁধা। পাড়ে দাঁড়িয়ে যাত্রীদের ডেকে ডেকে শাঁখ বাজায় খেয়া নৌকোর মাঝি। নৌকো যাবে সহরে। ছাড়বার সময় হয়ে এলো যে!

ছবির মতো গ্রাম বাঁয়ে রেখে, কোলাহলমুখর হাট ডাইনে ফেলে আরো খানিকটা এগুলে দেখা যায় অনেক তফাতে তফাতে পাল খাটানো নৌকোর পর নৌকো। সবই যাচ্ছে সহরে। কোনোটা নিয়ে যাচ্ছে যাত্রী, কোনোটায় মাল বোঝাই। এই নৌকোর মাঝি সুর মেলায় ওই সাম্পানের মাঝির গানের সঙ্গে। ওই নৌকোর মাঝি তারস্বরে কুশল জিজ্ঞেস করে এই নৌকোর মাঝিকে। নিঃসঙ্গ কোনো মাল-বোঝাই সাম্পান দ্রুত অতিক্রম করে যায় অন্য নৌকোদের। দূরে কালুরঘাটের পোল ক্রমশ বড়ো আর আরো বড়ো হয়ে কাছিয়ে আসে। পোলের ওপর দিয়ে খেলনার মতো ছোটো ট্রেন চলে যায় নদীর এপারে ওপারে প্রতিধ্বনি তুলে। পোলের নীচে থামের এপাশে ওপাশে জলের বুকে ঘূর্ণি জাগে। পোলের তলা দিয়ে নৌকোগুলো বেরিয়ে যায় একটা পর একটা। তারপর কালুরঘাটের পোল ছোটো আর আরো ছোটো হয়ে আবছা হয়ে দূরে মিলিয়ে যায়। প্রশস্ত থেকে প্রশস্ততরো হয়ে উদ্দাম হয়ে ওঠে কর্ণফুলী। একূল ওকূল ছাপিয়ে ওঠে জোয়ারের ঢেউ। তারপর হঠাৎ কখন বহুদূরে দেখা যায় নোঙ্গর করা জাহাজ। হুইস্‌লধ্বনিতে উড়ন্ত বকের ঝাঁকে আলোড়ন এনে, নদীর বুকে ঢেউ তুলে দ্রুত পাশ কাটিয়ে যায় রাঙামাটির লঞ্চ। ঢেউএর ধাক্কায় নৌকোগুলো দুলতে দুলতে ডানদিকে কোণাকুণি পাড়ি দেয়। পাড়ের কাছাকাছি এলেই চোখে পড়ে একটি চওড়া খালের মুখ। সে চাকতাইএর খাল। নৌকোগুলো একটার পর

একটা ঢুকে পড়ে খালের মধ্যে। খালের ওদিক থেকে একটার পর একটা বেরিয়ে আসা নৌকোগুলোর পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যায়। আরো খানিকটা গিয়ে নৌকোয় সাম্পানে ঠাসাঠাসি। মাঝি আর যাত্রীদের কোলাহল। আর দাঁড় বাওয়া যায় না। বাঁশের লগি দিয়ে ঠেলে ঠেলে ঘাটের দিকে এগিয়ে যায় নৌকোগুলো, অসংখ্য টিনের চালাঘর, আড়ত আর গুদাম দু'পাশে রেখে। তারপর চাকতাইএর ঘাটে হুড়মুড় করে নেমে যায় যাত্রীরা।

আর কর্ণফুলী আরো, আরো এগিয়ে বয়ে চলে যায় চাটগাঁ বন্দরের জাহাজগুলো পেছনে ফেলে। খাড়ির মুখ পেরিয়ে ভেসে আসা দূরান্ত সমুদ্রের আহ্বান জোয়ারের কলোচ্ছ্বাসে মুখর হয়ে ওঠে। সাদা সাদা একঝাঁক পাখী ঝটপট উড়ে এসে জলের বুকে নেমে পড়ে ভাসতে থাকে, আর মাছ ধরে ঝটপট উড়ে চলে যায়।

তাদের পাখার ঝাপটায় আরো উতল হয়ে ওঠে কর্ণফুলী।

* * *

চাকতাইএর খালের ধারে তখন জনতার কোলাহল উদ্দাম হয়ে উঠেছে।

খুখুরে ঘোড়ায় টানা নড়বড়ে ফিটনখানি মহাজনদের গদি আর সওদাগরদের আড়তগুলি ডাইনে বাঁয়ে পেছনে ফেলে জনাকীর্ণ অলিগলির মোড় ফিরে ফিরে শেষ পর্যন্ত এসে থামলো খোয়াবিকীর্ণ পথটির শেষপ্রান্তে। সেখানে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে দুটো টিনের চালাঘর। ব্যাপারীদের সোরগোল ভেসে এলো ভেতর থেকে। ঘর দুটির মাঝখান দিয়ে একটি সরু কর্দমাক্ত পথ চলে গেছে। তাকাতেই চোখে পড়ে পথের ওমাথায় খালের ঘোলাটে জল, রোদ্দুরে চিক চিক করছে। সাম্পানে নৌকোয় ঠাসাঠাসি।

কল্যাণ রায় নামলো গাড়ি থেকে। পেছন পেছন নামলো শ্যামল সেন।

চালাঘরের সিমেণ্ট বাঁধানো দাওয়ায় বসে হুঁকো টানছিলো একজন। গাড়িটি থামতে দেখে উঠে এলো। চাটগেঁয়ে মুসলমান সে। মাথায় আধময়লা মলমলের টুপি। খালি গা'। পরণে লাল-কালো ছিটের লুঙ্গি। মুখের উপর অসংখ্য কুঞ্চিত রেখায় রেখায় তিন কুড়ি শীত আর নিদাঘের জীবন সংগ্রাম তার স্মরণ রেখে গেছে। কিন্তু পেশী হিল্লোল শরীরের গঠন গ্রীক ভাস্করদের সৃষ্টির মতো নিখুঁত।

"আরে আবুল মাঝি যে!"

"আদাব দাদাবাবু। ঘাটে সাম্পান লাগিয়ে বসে আছি অনেকক্ষণ। জোয়ার এসে গেছে। দেরী করবেন না, চলুন," বলে একটি সুটকেশ আর একটা হোল্ডঅল তুলে নিলো সে।

"তোমায় কুন্তলামাসী পাঠিয়েছেন বুঝি," কল্যাণ জিজ্ঞেস করলো। হাসিমুখে ঘাড় নাড়লো আবুলমাঝি।

"ইনি কে জানো," শ্যামলকে দেখিয়ে কল্যাণ জিজ্ঞেস করলো।

"মেজকর্তার ছেলে না? আমি শুনেছি হাসিদি'র কাছে। আপনার চিঠি পেয়ে হাসিদি আর কুন্তলামাসী আমায় ডাকিয়ে বলে দিলো আপনাদের তুলে নিয়ে যেতে।"

"তুমি ভালো আছো তো আবুল মাঝি?"

"খোদার মেহেরবাণীতে দিন কেটে যাচ্ছে কোনো রকমে।" শ্যামলের দিকে ফিরে বল্ল, "আপনি তো আমায় চেনেন না। কিন্তু আপনার বাবাকে আমি চিনতাম সেই এতটুকু বয়েস থেকে।"

"তোমার কথা আমি বাবার মুখে শুনেছি অনেকবার," শ্যামল একটু হেসে বল্ল।

"শুনেছেন? উনি বলতেন আমার কথা?" আবুল মাঝির চোখ দুটো চিক চিক করে উঠলো। "সেই যে সেবার আমার সাম্পানে চড়ে সহরে এলেন, সেই শেষ দেখা। পঁচিশ বছর কেটে গেল। তারপর আজ আপনি ফিরে আসছেন। অবিকল বাপের চেহারা পেয়েছেন দাদাবাবু। কেউ বলে না দিলেও ঠিক চিনতে পারতাম। দাঁড়ির ফাঁক দিয়ে হাসির আভাস দেখা গেল আবুল মাঝির মুখে।

বাঁশের ঢালু মাচান বেয়ে কল্যাণ আর শ্যামল নেমে এলো বড়ো সাম্পানটির পাশে।

ছইয়ের ভিতর থেকে মুখ বাড়িয়ে বছর উনিশ কুড়ি বয়েসের একটি মেয়ে মিষ্টি হেসে বল্ল, "এত দেরী হোলো কেন কল্যাণদা। আমরা কখন থেকে বসে আছি।"

"তোমরা? আর কে আছে সঙ্গে?" কল্যাণ জিজ্ঞেস করলো।

"দাদু।"

"দাদু? কোথায় সে?"

"ছইয়ের ভেতর কুঁকড়ে বসে আছে।"

"ছইয়ের ভেতর? কেন? বেরুতে বলো।"

"ওর লজ্জা করছে।"

"লজ্জা? ও, শ্যামলকে দেখে?" কল্যাণ হাসলো। "তারপর তোমরা এসে জুটলে কোত্থেকে?"

"ফিরিঙ্গি বাজারে দিন দুয়েকের জন্যে বেড়াতে এসেছিলাম মেজ পিসীর বাড়ি। আবুল এসে বল্লে তোমরা আসছো। তাই চলে এলাম।"

জুতো জোড়া খুলে খালের জলে পা' ধুয়ে কল্যাণ আর শ্যামল উঠে বসলো সাম্পানে, ছইয়ের বাইরে।

"তারপর কল্যাণদা, কিরকম আছো, ভালো তো? অনেকদিন আসোই নি আমাদের বাড়ি। এক কাজ করো কল্যাণদা, সোজা আমাদের ওখানে গিয়ে উঠবে চলো। খাওয়া দাওয়া সেরে রাতটা কাটিয়ে কাল সকালে বাড়ি ফিরবে, কেমন?"

"না, না, পাগল নাকি," আপত্তি জানালো কল্যাণ, "আমি লাম্বুর হাটে নেমে যাবো—।"

"তোমায় লাম্বুরহাটে নামতে দিচ্ছে কে," বল্ল মেয়েটি, "চলো না। বেশ ভালো ভালো লাক্ষা আর রূপচাঁদার শুঁটকি নিয়ে যাচ্ছি, আর নোনা ইলিশের ডিম—"

ব্যস, আর বলতে হোলো না। রসনা সিক্ত হোলো কল্যাণ রায়ের। অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে রন্ধনশাস্ত্রের উপর থিসিস ঝাড়তে লাগলো সে। আবুল মাঝি সুটকেস আর হোল্ডঅলটি সাম্পানে তুলে দিয়ে আবার ফিরে গেল।

শ্যামল তাকিয়ে দেখলো কল্যাণ আর মেয়েটিকে। তার উপস্থিতি ভুলে গিয়ে ওরা তখন অমুক পিসীর ঝিঙে চচ্চড়ি আর তমুক মাসীর নারকোল সুক্তর সুখ্যাতি জুড়ে দিয়েছে। চোখ ফিরিয়ে দৃষ্টি হানলো ছইয়ের ভিতর। দেখলো বছর পনেরো ষোলোর ভারী ছেলে মানুষ দেখতে একটি মেয়ে ডাগর চোখে প্রচুর কৌতুহলভরে নির্নিমেষ তাকিয়ে আছে তার দিকে। তার চোখ পড়তেই মেয়েটি চোখ ফিরিয়ে নিলো। অন্য মেয়েটির মধ্যে বেশ সহুরে সহুরে ভাব আছে। খুব সপ্রতিভ কথাবার্তা। কিন্তু এ মেয়েটি একেবারে গাঁয়ের। বেশ মিষ্টি দেখতে। শ্যামলও চোখ ফিরিয়ে নিলো।

তখন বেলা ন'টা। ঘণ্টাখানেক আগে চাটগাঁ মেল এসেছে কলকাতা থেকে। গ্রামাঞ্চলের যাত্রীরা, যারা ট্রেনে যাবে না, যাবে নৌকোয়,

সবাই লটবহর নিয়ে এসে পড়েছে চাকতাইএ। তাদের মধ্যে অনেকেই অফিসের চাকুরে, কয়েকদিনের ছুটিতে এসেছে পরিবার নিয়ে কলকাতায় ফিরে যেতে। এসব সীমান্ত অঞ্চল ছেড়ে পালানোর হিড়িক তখন, সে বছরটা উনিশ শো চুয়াল্লিশ, চৈত্র মাসের মাঝামাঝি, জাপানী সৈন্যেরা আসামের সীমানায় এসে গেছে। আসাম আক্রান্ত হবো-হবো, চাটগাঁও যেন খুব নিরাপদ নয়,—সেই আশঙ্কায় ব্যাকুল হয়ে কলকাতা থেকে ছুটে আসছে একদল লোক, যাদের চাকরী ওখানে আর বৌ ছেলে মেয়ে এখানে, আসছে প্রত্যেকদিনের গাড়িতেই। আর আসছে এক একদল মিলিটারী কনট্রাক্টার, ফাঁকির মুনাফায় কর্মব্যস্ততার বৈচিত্র্য সৃষ্টি করতে।

যাত্রীদের নিয়ে মাঝিতে মাঝিতে কাড়াকাড়ি। কেউ বা এক একটা আস্ত নৌকোই ভাড়া করে ফেলেছে। আর কেউ বা যাবে খেয়ার নৌকোয়। বাঁশের লগি দিয়ে কাদা ঠেলে ঘাট ছাড়ছে নৌকাগুলো। খেয়ার নৌকাগুলো তখনো যাত্রীতে পুরো বোঝাই হয়নি, মাল্লারা চেঁচিয়ে তাদের গন্তব্যস্থল ঘোষণা করছে। দূরে খান'কয় সাম্পান খাল পেরিয়ে নদীতে গিয়ে পড়েছে, জোয়ার এলো বলে, দাঁড় তুলে রেখে পাল খাটাতে ব্যস্ত মাঝিরা, এখান থেকে তাদের দেখাচ্ছে মহামুনির মেলায় কেনা খুব ছোটো কালো কালো পুতুলের মতো। আরো দূরে নদীর মাঝখানে রাঙামাটির লঞ্চ ধোঁয়া ছাড়ছে আর হুইস্‌ল্‌ ছাড়ছে। এদিক ওদিক দৃষ্টি চালিয়ে শ্যামল বিমুগ্ধ হয়ে গেল।

সাম্পান ছাড়তে আরো কতক্ষণ? শ্যামল অধৈর্য হোলো। এখানের এই জনতা আর ভালো লাগছে না। নদীর বুকে ঝিরঝিরে হাওয়ায় উজান চলার জন্যে তার মন ব্যাকুল হোলো। কোথায় গেল আবুল মাঝি? তখনো দেখা নেই। ভীড়ের ভিতর দিয়ে দৃষ্টির

অনুসন্ধান হানলো। দেখতে পেলো না। এই ভীড়ের ভিতর দিয়ে আসতে হয়েছে তাকে, পথের কাদা ঠেলে, সুঁটকীর আড়তের পাশ দিয়ে, ভ্যাপসা গুমোট গন্ধ অতিক্রম করে। এখানে আরো কিছুক্ষণ বসে থাকবার সম্ভাবনা তাকে মোটেও খুশি করলো না। কলকাতায় বড়ো হওয়া ছেলে সে, চাটগাঁয় এই তার প্রথম আসা, আগে কোনোদিন আসেনি। কল্যাণ তার মামাতো ভাই, এসেছে তারই সঙ্গে। কল্যাণ তাকে পৌছে দেবে শ্রীপুর, তার পিসতুতো বোন হাসিদি'র বাড়ি, তারপর ফিরে যাবে নিজের গাঁয়ে, নোয়াপাড়ায়। তারপরের প্রোগ্রাম কিছুই ঠিক করা হয়নি এখনো।

একটুখানি হাসি শুনে শ্যামল ফিরে তাকালো। যে মেয়েটি কল্যাণের সঙ্গে কথা বলছিলো, সে হেসে জিজ্ঞেস করলো তাকে, "শ্যামলদা কথাই বলছেন না আমাদের সঙ্গে, কি অতো ভাবছেন?"

"এদের তুমি চেনোনা শ্যামল?" কল্যাণ জিজ্ঞেস করলো।

"কি করে চিনবে," মেয়েটি বল্ল, "আমাদের পরিচয় ওঁকে দিয়েছো বলে তো মনে হচ্ছে না।"

"এদের কথা তোমায় আমি বলিনি শ্যামল? ও, হ্যাঁ, মনেই ছিলো না। এ হোলো লাতুরী, হাসিদির ননদ আর ওটি হোলো দাতু, হাসিদির আরেকটি ননদ, লাতুরীর পিসতুতো বোন। সেই যে কুন্তলা মাসীর কথা বলেছি তোমায়, তাঁরই মেয়ে।"

"কুন্তলামাসী আর হাসিদির কথা মায়ের কাছে শুনেছি," শ্যামল বল্ল, "এদের কথা শুনিনি।"

লাতুরী বল্ল, "আমরা কিন্তু আপনার কথা অনেক শুনেছি। শুধু হাসিবৌদির মামাতো ভাই বলে নয়, একজন ফ্যাসিবিরোধী লিখিয়ে হিসেবে আপনার যে পরিচয়, তাও জানি।"

শ্যামল একটু বিব্রত বোধ করলো।

"আপনার কয়েকটি ফ্যাসিবিরোধী কবিতা পড়েওছি। মনেও আছে কিছু কিছু," লাতুরী বল্ল, "শুনবেন ?

আকাশের লাল সূর্য দেখা দিলো বিপ্লবের
রক্তরাঙা পতাকার মতো
আমরা সৈনিক যতো
বজ্রমুঠি তুলেছি আকাশে—
নতুনের পাতা কিছু
জুড়ে দিয়ে যাবো
ইতিহাসে।

দেখছেন, কি রকম স্মৃতিশক্তি ?"

শ্যামল হাসলো, কোনো উত্তর দিলো না।

আবুল মাঝি ফিরে এলো। হাতে একটি প্রকাণ্ড তরমুজ।

"এ আবার কে আনতে বল্ল তোমায়," কল্যাণ জিজ্ঞেস করলো।

আবুল মাঝি উত্তর দেওয়ার আগেই উত্তর এলো ছইয়ের ভিতর থেকে, "আমি আনিয়েছি।"

তরমুজটা ছইয়ের ভিতর চালান হয়ে গেল।

আবুল মাঝি লগি দিয়ে সাম্পানটি ঠেলে নিয়ে এলো খালের মাঝখানে। তারপর এগিয়ে চল্ল খালের মুখের দিকে।

লাতুরী গল্প জুড়ে দিলো কল্যাণের সঙ্গে।

শ্যামল চুপ করে তাকিয়ে রইলো বহুদূর নদীর ওপারে, যেখানে সবুজ গাছপালার আবছা আভাস।

তারপর এক সময় শুনলো পেছন থেকে কে যেন ডাকছে।

"এই নিন—,"

চোখ ফিরিয়ে শ্যামল দেখে দাতু নামে সেই মেয়েটি বেরিয়ে এসেছে ছইএর ভিতর থেকে। তার হাতে একটি ছোটো থালায় বড়ো বড়ো তিন টুকরো তরমুজ, ওদের তিনজনের জন্যে।

"সকাল থেকে কিছু খান নি বুঝি ?" দাতু জিজ্ঞেস করলো।

ঘাড় নাড়লো শ্যামল।

"আপনার মুখ দেখেই বুঝেছি। এটা খেয়ে ফেলুন। বেশ মিষ্টি।"

শ্যামল তার দিকে একবার তাকালো, তারপর তাকালো লাতুরীর দিকে।

তারপর তুলে নিলো এক টুকরো তরমুজ।

* * * * *

খালের মুখ ছাড়িয়ে কর্ণফুলীতে এসে পড়লো আবুল মাঝির সাম্পান। কর্ণফুলীর কাদাময় কূলে কূলে শুক্লাপঞ্চমীর জোয়ার তখন নির্মম হয়ে উঠেছে। মাঝি তার দাঁড় তুলে ফেলে পাল খাটিয়ে নিলো। পশ্চিমী হাওয়ায় আর জোয়ারের ব্যাকুলতায় অসম্ভব দ্রুত হয়ে উঠলো আবুল মাঝির সাম্পান, প্রায় পাল্লা দিয়ে চল্ল রাঙামাটির লঞ্চের সঙ্গে। দশটা প্রায় বেজে এলো। রোদ্দুর তখন প্রভাতের স্নিগ্ধতা কাটিয়ে ঝাঁঝালো হয়ে উঠছে।

দাতু বল্লে, "আপনারা ভেতরে এসে বসুন, রোদ্দুর লাগছে আপনাদের।"

ছইয়ের ভিতর একটুখানি জায়গায় কুঁকড়ে বসে থাকতে ইচ্ছে হোলো না শ্যামলের। বল্লে, "লাগলেই বা, বাইরে বেশ লাগছে আমার।"

দাতু নিজেই বেরিয়ে এলো ছইয়ের ভিতর থেকে। এসে পা মুড়ে বসে পড়লো লাতুরীর পাশে।

কল্যাণ. জিজ্ঞেস করলো শ্যামলকে, "দেশেতো এই প্রথম আসছো। কি রকম লাগছে ?"

শ্যামল একটু হাসলো। কোনো উত্তর দিল না।

"শুধু নদী আর গাছপালা দেখেই তো দেশকে চেনা যায় না কল্যাণদা," বল্ল লাতুরী, "দেশের মানুষজন দেখুক আগে !"

"এই কর্ণফুলীই দেশের জান দিদি", আবুল মাঝি বল্লে ছইয়ের ওধার থেকে, "কর্ণফুলীকে চিনলেই দেশটাকে চেনা যায়।"

লাতুরী হেসে বল্ল, "আমি অন্য চেনার কথা বলছি আবুল চাচা।"

আবুল বল্ল, "আমি জানিনা দিদিমণি চেনার রকমফের আছে কিনা। তবে তোমরা ভদ্রলোকের জাত, সহরে বন্দরে থাকো, চাকরী বাকরী করো, সপ্তাহের শেষে বা বছরের শেষে দেশে বেড়াতে আসো। তোমাদের কাছে দরিয়াটা একটা আসা যাওয়ার পথ মাত্র। তাই তোমরা মানুষজন না দেখলে দেশটাকে চিনতে চাও না। তবে দেশের মানুষজনকেও তোমরা সবাই চোখে দেখ না। দেখলে বুঝতে তামাম দেশের যতো গরীব দুঃখী চাষা জেলে মাঝি, সবারই জান হচ্ছে এই কর্ণফুলী। এই দরিয়ায় নৌকা বেয়ে আমাদের রুজি রোজগার, এই দরিয়ায় মাছ ধরে আমাদের দিন গুজরান, এই দরিয়ার দুই পাড়ে নরম জমিতে চাষবাস করে আমাদের সারা বছরের মোটা ভাতের বন্দোবস্ত করা। এই দরিয়ার দিল ভালো থাকলে আমাদেরও ভালো, এর দিল খারাপ হলে আমাদেরও দুঃখের অবধি নেই। এ আমাদের জান দিয়ে জিইয়ে রেখেছে, আবার মর্জিমাফিক জান নিয়েও নেয় কতো জনের।"

কল্যাণ একটু হেসে আস্তে আস্তে বল্ল, "আবুল মাঝির মনটা কর্ণফুলীর মতো। জীবনে জোয়ার ভাটা যাই আসুক প্রাণের প্রাচুর্যে

সব সময় টলমল করছে। সেন্টিমেণ্টের বান জাগলে তোমার আমার মতো খড়কুটো কথার তোড়ে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে।"

শ্যামলও হাসলো, বল্ল, "বেশ লাগছে লোকটিকে।"

"ও আমাদের তিন পুরুষের মাঝি," লাহুরী বল্ল. "আমাদের বাপঠাকুর্দাদের জীবনের বহু সুখ দুঃখের সঙ্গে জড়িয়ে আছে।"

আবুল মিঞা তার নিজের মনে বলে চল্ল, "আমাদের সুখ দুঃখ সব কিছুর ভাগীদার এই দরিয়া। কতো জনের কতো সুখ দুঃখের কথা এর বুকে জমা আছে যা ভুলে গেছে আর সবাই। জানেন দাদাবাবু, সেই বহুত জমানা আগে এক মগ বাদশা'জাদীর মহব্বত হয়েছিলো হিন্দুস্তানের এক বাদশা'জাদার সঙ্গে। বাদশাজাদা সফর করতে গিয়েছিলো মগের দেশে। বাদশাজাদীকে দেখে বল্ল তোমায় সাদী করবো। এই বলে, তাকে দিলো একজোড়া সোনার মাকড়ি। তারপর শাহজাদা নিজের দেশে এসে মেয়েটার কথা বেবাক ভুলে গেল। শাহজাদী অনেকদিন তার জন্যে বসে থেকে থেকে বল্লে, না, আমিই যাবো হিন্দুস্তান। সঙ্গে নিলো সোনার মাকড়ি জোড়া, তাই দেখিয়ে নিজের পরিচয় দেবে, যদি শাহজাদা তাকে চিনতে না পারে। ময়ুরপঙ্খীতে চড়ে যাচ্ছিলো এই দরিয়া বেয়ে। যেতে যেতে হঠাৎ সোনার মাকড়ি হাত থেকে পড়ে গেল দরিয়ার অথৈ জলে। তারপর শাহজাদার সঙ্গে যখন শাহজাদীর দেখা হোলো সে আর তাকে চিনতে পারে না। সেই কানের মাকড়ি দরিয়ার জলে হারিয়ে গিয়েছিলো বলে দরিয়ার নাম হোলো কর্ণফুলী। সেই জমানা থেকে আজ পর্যন্ত কতোজন তাদের জীবনের কতো মহব্বত, কতো সুখের খোয়াব এই দরিয়ার এপারে ওপারে গড়ে তুলেছে, আবার ভেঙেও ফেলেছে। তারা কেউ নেই, তাদের খোয়াবও নেই, তাদের কারো

ম্মদও নেই। শুধু আছে কর্ণফুলী আর আছি আমি এক বুড়ো মাঝি, যার সাম্পান চড়ে কতো জন বিদেশে চলে গেছে আর ফেরেনি, কতোজন এদেশে এসে এদেশকে ভালোবেসে আর এদেশ ছেড়ে যায়নি। কত নতুন বৌ হাসতে হাসতে বাপের বাড়ি ফিরেছে, আবার চোখের জল ফেলতে ফেলতে শ্বশুরবাড়ি ফিরে গেছে। কতোজন এর পাড়ে বসে ভেবেছে বিদেশে বহুদিন দেখা না হওয়া কোনো একজনের কথা, কতোজন বিদেশে বসে ভেবেছে অন্যজনের কথা যার বাড়ি কর্ণফুলীর পাড়ে কোন এক গাঁয়ে। এই দরিয়াকে চিনলেই আমাদের এই দেশটাকে চেনা হয়ে যায় দাদাবাবু। এ দেশের সাধারণ মানুষের জীবন এই দরিয়ার মতোই, তা'তে জোয়ার আছে, ভাটা আছে, ভাঙন আছে, দুঃখ আছে, ঝড় আছে, তুফান আছে, কিন্তু তবু সেই জীবনের শেষ নেই, বয়ে চলেছে তো বয়েই চলেছে।"

আবুল মাঝির কথাগুলো শ্যামলের কানে ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে এলো। তার মন ভেসে গেল অন্য কোথায়। বাবার কথা মনে পড়লো। পঁচিশ বছর আগে প্রিয়গোপাল সেন বুড়ো বাপ গোপাল সেনের কথায় রাগ করে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে চলে গিয়েছিলো। তারপর আর এ মুখো হয়নি। মা কতোবার বলেছেন, চলো একবার দেশে গিয়ে বাবাকে দেখে আসি। বুড়ো হয়েছেন, কদ্দিন বা বাঁচবেন। বড়ো ছেলে অল্প বয়েসে এক ছেলে রেখে মারা গেছে। ছোটো ছেলে বিপ্লবী আন্দোলনে মিলিটারীর গুলিতে মরেছে। মেজো ছেলেকে কাছে পেলে ওঁর শেষ ক'টা দিন একটু সুখে কাটবে। কিন্তু এলো না প্রিয়গোপাল সেন। তারপর একদিন হঠাৎ করোনারি থ্রমবোসিসে আক্রান্ত হোলো। ব্যাকুল হয়ে উঠলো বুড়ো বাপকে দেখবার জন্যে। কিন্তু ডাক্তারেরা বল্লে এ অবস্থায় বিছানা ছেড়ে উঠতে পারবেন না,

কোথাও যাওয়া তো দূরের কথা। ঠিক হোলো বুড়ো বাপকেই খবর দিয়ে আনানো হবে। কিন্তু খবর দেওয়ার আগেই হঠাৎ যাওয়ার ডাক এলো। ছেলে চলে গেল। বুড়ো বাপ গোপাল সেন পড়ে রইলেন। কিন্তু দারুণ অভিমানে কোনো চিঠিই দিলেন না পুত্রবধূকে। কারণ সেই বহু বছর আগে পুত্রবধূকে উপলক্ষ্য করেই ঝগড়া হয়েছিলো ছেলের সঙ্গে, সেই থেকে ছেলে পর হয়ে গেল।

"কি অতো ভাবছো," কল্যাণ জিজ্ঞেস করলো।

শ্যামল একটু হেসে সিগারেটের টিনটা খুল্লো, কোনো উত্তর দিলো না।

আবুল মাঝির সাম্পান তখন কালুরঘাটের পোলের কাছাকাছি এসে পড়েছে। একটা ট্রেন চলে যাচ্ছে পোলের উপর দিয়ে। দূরে নদীর পাড় ছুটো সবুজ। সারি সারি সুপুরী আর নারকোলের আড়ালে টিনের ছাউনী দেওয়া ঘরবাড়ির চালগুলো চৈতি রোদ্দুরে ঝিকঝিক করছে। টুকরো টুকরো আনমনা মুসাফির মেঘগুলোর গায়ে গায়ে উড়ন্ত চিলগুলো সব কালো কালো ফুটকি।

সাম্পানের পেছন দিকে পালের দড়ি কষে বসে আছে আবুল মাঝি। কালো বুকের উপর শাদা ধবধবে দাড়ি হাওয়ায় উড়ছে। মাথায় তার লেস বসানো সাদা মলমলের টুপি, তার নীচে প্রশস্ত কপাল ঘামে আর তেলে চিক চিক করছে। আনমনা অকুণ্ঠায় গুনগুনিয়ে গান এলো তার মুখে, চাটগাঁর ভাষায়, প্রায় দুর্বোধ্য, তবু মিষ্টি।—সেই গানের নদীর বহুদূর ওপারে সারি সারি সুপুরি গাছের আড়ালে যে টিনের ছাউনী, সেখানে বাসা বেঁধেছে কোনো এক পয়সাওয়ালা কাশেম আলী কেরাণী, আরাকানের বংশালে কাজ করে তার অনেক পয়সা, তাকে বিয়ে করেছে আবুল মাঝির বঁধূ, যাকে সে বিয়ে

করতে পারেনি, কারণ তার পয়সা নেই, সে এক গরীব পাল্লাণীর মাঝি। তার গানের এপারে কর্ণফুলীর বুকে যে সাম্পানটি ঢেউয়ে ঢেউয়ে দোল খেয়ে উজান বেয়ে চলে, সেটা হয়তো বা দূর থেকে কাশেম আলির বৌয়ের সুর্মা আঁকা চোখে পড়ে কোঠার ছোটো জানালা দিয়ে। কিন্তু আর পাঁচ দশটা নৌকো সাম্পানের মতো এটিকেও সে লক্ষ্য করে না, শুধু বসে বসে হাতের নখ আর পাতা রাঙায় মেহেদী পাতার রসে—আর কখনো যখন দমকা দখিন হাওয়ায় লঙ্কা ক্ষেতের টুকটুকে লঙ্কাগুলো আরাকানের শাহজাদীর কানের চুণীর দুলের মতো দুলে দুলে ওঠে, তখন হয়তো আবছা মনে পড়ে, অমনি এক লঙ্কাক্ষেতের পাশে কবে যেন কে একজন তার থরথর নরম দুটো হাতে ভিন গাঁয়ের মেলায় কেনা লাল কাচের চুড়ি পরিয়ে দিয়েছিলো, যার নাম আজ আর মনে নেই।

(দুই)

হাসি দি'কে প্রণাম করতে হাসি দি' শ্যামলকে বুকে জড়িয়ে ধরলো। বল্ল, "কীরে তুই এত বড়ো হয়ে গেছিস? কবে তোকে সেই এতটুকু দেখেছিলাম কলকাতায়, আর এই এদ্দিন পর দেখা।"

প্রথম দেখাতেই হাসি দি'কে ভীষণ ভালো লেগে গেল শ্যামলের। হাসি দি'র জন্যে মা সাড়ি দিয়েছিলেন একটি। বাক্স খুলে সেটি বার করে দেওয়ার আর তর সইলো না।

"মা পাঠিয়েছেন আপনার জন্যে।"

হাসি দি বল্ল, "মাসীমা তবু কখনো সখনো চিঠি পত্তর লেখেন, কিন্তু তুই তো খোঁজও রাখিস না তোর দিদিটির।"

"তোমার মতো একটি দিদি আছে জানলে ঠিক খোঁজ রাখতুম।"

"কেন, আমার কথা তুই কারো কাছে শুনিস নি কোনোদিন?"

"শুনেছি। তবে সে কিরকম শোনা জানো? এই যেমন, আমার একজন পিসী ছিলো। সে' পিসীর এক মেয়ে আছে। তার বিয়ে হয়ে গেছে অনেকদিন। শ্বশুরবাড়ি আমাদের গাঁয়েই—এই পর্যন্ত। মাঝে মাঝে সে মায়ের কাছে চিঠি লেখে, সে চিঠির শেষ লাইনে লেখা থাকে 'মামাকে সভক্তি প্রণিপাত এবং ভাইটিকে স্নেহাশীষ জানাইবেন।' এর বেশী কিছু জানতে পারি নি কোনোদিন।"

"তা'হলে বলছিস কেন যে আমার মতো একটি দিদি আছে জানলে ঠিক খোঁজ রাখতিস?"

শ্যামল বল্লে, "দেখ হাসি দি, সম্পর্কের মামাতো মাসতুতো দিদি দু'একজন যে দেখিনি তা নয়। তাদের সঙ্গে একটা লৌকিকতার যোগাযোগও আছে। দিদি সম্বন্ধে আমার ওটুকুই অভিজ্ঞতা। কিন্তু যে দিদি দেখা হতেই তুই সম্বোধন করে আমার মতো একটি বুড়ো ধাড়ি ছেলেকে বাচ্চা খোকার মতো বুকে টেনে নিতে পারে তেমন একটির সন্ধানতো আগে কোনোদিন পাইনি, তাই খোঁজ রাখবার অবকাশও হয়নি।"

"ওরে গাধা," হাসি দি ঠোঁট কামড়ে বল্লে, "আমার তো নিজের ভাই বোন কেউ নেই। তোর চেয়ে আপন আমার আর কে আছে বল?"

হাসি দি'র বর কাছেই দাঁড়িয়ে একটি কৌটোয় মাছের চার ভরছিলেন। হাসি দি'র কথা শুনে হেসে ফেলে বল্লেন, "ভায়া, কি পাল্লায় পড়েছো তা'তো জানো না, আদরের ঠ্যালা কাকে বলে দু'দিনে বুঝবে। তিন দিনের দিন তল্পীতল্পা গুটিয়ে যদি না পালাও তো আমার নাম ভূপতি মজুমদার নয়। নেহাৎ স্বামী স্ত্রীর হিন্দুশাস্ত্রবিহিত সম্পর্কটা জন্মজন্মান্তরের বলে, তা নইলে কবে তালাক দিতাম তোমার দিদিকে।"

হাসি দি বল্ল, "যে' ভগ্নীপতি শালার সঙ্গে প্রথম দেখা হতে বৌ'কে তালাক দেওয়ার কথা ছাড়া অন্য কোনো রসিকতা ভাবতে পারে না তেমন লোককে আমি নিজেই তালাক দিতাম যদি শাস্ত্রে ব্যবস্থা থাকতো। যাও, পালাও এবার, যেখানে যাচ্ছো যাও। আমাদের কথার মাঝখানে তোমায় টিপ্পনি কাটতে হবে না।"

"তালাক দেওয়ার কথাই বুঝলে। আর কি বোঝাতে চেয়েছি বুঝলে না। তোমরা মেয়েরা এতই বেরসিক," বলে ছিপ ঘাড়ে তুলে ভূপতি মজুমদার হাসতে হাসতে প্রস্থান করলো।

"দাদুর ওখানে না উঠে আমার বাড়িতে উঠলি কেন? মামীমার আর কল্যাণের চিঠি পেয়ে তুই এখানে আসছিস শুনে আমি তো অবাক। নিজের চোখকে বিশ্বাসই করতে পারিনি প্রথমটা।"

"তোমাদের এখানে এসে উপস্থিত হওয়াটা তোমার যদি অপছন্দ হয় তো বলো চলে যাই।" শ্যামল হেসে বল্ল।

"ওমা, সে কথা কে বলেছে। এখান থেকে তোকে যেতে দিচ্ছে কে? কিন্তু, বলছিলুম কি, দাদুর কাছে না গিয়ে যে সোজা এখানে এলি, উনি কি ভাববেন বলতো? হাজার হোক ওটা তোর নিজের বাড়ি তো!"

"সে কথা আমি যে ভাবি নি, তা' নয়," শ্যামল বল্ল, "কিন্তু তারপর ভাবলাম বাবা বেঁচে থাকতে যে বাড়ির ছায়া মাড়ান নি, সেখানে গিয়ে ওঠা আমার পক্ষে অনুচিত হবে।"

"দাদুর সঙ্গে দেখা করতে যাবি না?"

"নিশ্চয়ই যাবো, তবে ভাবছি যদি কিছু বলে বসেন—"

"উনি বুদ্ধিমান লোক, "হাসি দি' বল্ল, "সবই বোঝেন। মুখ ফুটে কিছুই বলবেন না।"

"ও বাড়ি এখান থেকে কদ্দূর?"

"এই মিনিট দশেকের রাস্তা।"

"তা' হলে চলো আজই যাই," শ্যামল বল্ল।

"বেশ তো, যাওয়া যাবে সন্ধ্যেবেলা," বল্ল হাসি দি'।

"সন্ধ্যেবেলা আবার কোথায় যাচ্ছো তোমরা? ছেলেটা এতদূর থেকে এসেছে, দু' একদিন জিরোতে দাও ওকে!"

মুখ ফিরিয়ে শ্যামল দেখলো ঘরে ঢুকছেন একজন বিধবা মহিলা।

বয়েস চল্লিশের ওপারে, গায়ের রঙে এখনো অতীত যৌবনের অস্তগামী রূপের শেষ আভাটুকু পড়ে আছে বিষণ্ণ গোধূলির মতো।

"এ' বুঝি প্রিয় গোপাল দা'র ছেলে ?"

"হ্যা।" শ্যামলের দিকে ফিরে হাসি দি বল্ল, "ইনি কুন্তলা পিসী।"

শ্যামল প্রণাম করলো।

"তোমার নাম কি বাবা ?"

"শ্যামল।"

"যাও, এবার স্নানটান করে খেয়ে নাও। রান্না হয়ে গেছে। দাতু তোমার জন্যে গরম জল করে রেখেছে। গোয়াল ঘরের পাশে একটা খালি ঘর আছে। সেখানেই স্নান করে নাও। বাইরে সাবান তোয়ালে নিয়ে দাতু দাঁড়িয়ে আছে, সেই দেখিয়ে দেবে সব।"

শ্যামল বল্ল, "মাসীমা, শুনেছিলাম আপনি মায়ের ছেলেবেলার বন্ধু। আপনার কাছে এতটা অনাদর পাবো ভাবি নি।"

মুখ হঠৎ ফ্যাকাশে হয়ে গেল কুন্তলার। "কেন বাবা, ও কথা বলছো কেন ?"

"আমার স্নানের ব্যবস্থা শেষ পর্যন্ত গোয়াল ঘরের পাশে ?"

হেসে ফেল্লেন তিনি। "ও, এই কথা! কিন্তু কি করবো বাবা, এমন পাড়াগাঁয়ে তো স্নানের ঘর বড়ো একটা থাকে না কারো বাড়িতে।"

"পুকুর তো থাকে।"

"না বাবা, পুকুরে চান করে কাজ নেই। সহরের ছেলে তুমি, পুকুরের জল সহ্য না হয়ে যদি অসুখ বিসুখ করে—।"

"কিছু হবে না মাসীমা। গরম জলের কোনো দরকার নেই। এই

চৈত্র মাসের দুপুরে গরম জলে চান, ওরেব্বাপরে বাপ। আমি পুকুরেই চল্লাম। কল্যাণ দা, লাতুরী, এরা সব কোথায়।

"ওরা গেছে ডিসপেনসারিতে," বল্লেন কুন্তলা।

"ডিসপেনসারিতে! কেন?"

"ও, তুমি জানো না বুঝি," হাসি দি' বল্ল। "লাতুরী তো এখানকার—"

"ওসব কথা পরে হবে এখন, ও আগে খাওয়া দাওয়া সেরে নিক," কুন্তলা বললেন। যাও বাবা, দাতু দাঁড়িয়ে আছে অনেকক্ষণ।"

"বেচারী দাতু!" শ্যামল মনে মনে ভাবলো।

* * * * *

খাওয়া দাওয়া সেরে লাতুরী আর কল্যাণ আবার বেরিয়ে গেল। শ্যামলকে বলে গেল, "একটা জরুরী ব্যাপারে বড্ড ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। তুমি হাসিদি'র সঙ্গে বসে গল্প করে কাটাও দুপুরটা। হাসিদি' খুব জমিয়ে গল্প করতে পারে। কিম্বা টেনে ঘুম দাও, সন্ধ্যের পর আড্ডা দেওয়া যাবে।"

দু'তলার বারান্দায় মাদুর পেতে দিলো হাসি দি'। তার উপর শ্যামল বসলো তাকিয়া ঠেস দিয়ে। হাসি দি' পাশে বসলো পানের বাটা নিয়ে।

"লাতুরী আর কল্যাণ দা, গেল কোথায় আবার?"

"ওরা নানারকম ব্যাপার নিয়ে মেতে আছে," হাসি দি' বল্ল। একদিকে ফ্যাসিবিরোধী সংঘ, অন্যদিকে কিষাণ আন্দোলন। শুনিস নি বুঝি, লাতুরী কিষাণ আন্দোলনে একজন বেশ নামকরা কর্মী।"

"তাই নাকি?" শ্যামল বল্ল। "আমায় বলেনি তো, বেশ স্মার্ট আছে মেয়েটি। পাড়াগাঁ অঞ্চলে এরকম মেয়ে দেখতে পাবো ভাবিনি।"

"ও তো পাড়াগাঁ'র মেয়ে নয়। ও বরাবর চাটগাঁ সহরে থেকে এসেছে। ওখানে পড়তো কলেজে। আই-এ পাশ করে পড়া ছেড়ে দিয়ে কিষাণ আন্দোলন নিয়ে পড়ে আছে। ও তো শ্রীপুরে এসে থাকছে মোটে মাস ছয়েক। এখানে এসেও বসে নেই, এখানকার গোপাল সেন গার্লস্ স্কুলে পড়াচ্ছে, আর নিজে একটা ফ্রি মর্ণিং স্কুল করেছে গরীব চাষা-ভুষোদের মেয়েদের জন্যে তা' ছাড়া মহিলা সংঘ করেছে, পল্লী নাট্য সংঘ করেছে, গাঁয়ের চ্যারিটেব্‌ল ডিসপেন্সারির ম্যানেজিং কমিটিতে ভিড়েছে। দিনরাত এক মুহূর্ত বিশ্রাম নেই। শুধু এখান থেকে ওখানে চড়কি পাক খেয়ে বেড়াচ্ছে। পাড়াগাঁয়ে এসেছো বলে ভাবিস নে যে স্মার্ট মেয়ে এখানে দেখতে পাওয়া যাবে না, যুদ্ধের কল্যাণে অনেক কিছুই সম্ভব হয়েছে।"

"কি রকম ?"

"জাপানী বোমার ভয়ে তো সহর ছেড়ে সবাই গাঁয়ের বাড়িতে এসে আস্তানা গেড়েছে যারা আগে গাঁয়ের ছায়াও মাড়াতো না সহজে। ওদের বাড়ির মেয়েরা কি আর রাতারাতি পাড়াগাঁয়ের মেয়ে বনে যাবে ? ওরা সহরে যেভাবে থাকতো গাঁয়েও সেভাবেই থাকে। বরং ওদের দেখাদেখি পাড়াগাঁয়ের মেয়েরাই একটু একটু করে বদলে যেতে সুরু করেছে।"

"আচ্ছা, গোপাল সেন গার্লস্ স্কুলটা কি দাদুর নামে ?"

"হ্যাঁ, তাও জানিস না বুঝি। ও স্কুলটার পেছনে তাঁরই টাকা, চ্যারিটেব্‌ল্ ডিসপেন্সারীও তিনিই করে দিয়েছেন। লাতুরীরা এখন টাকা পয়সা তুলে একটি ছোটো প্রসূতি সদন প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা করছে।"

"তাই নাকি, বেশ কাজের মেয়ে তো," শ্যামল বল্ল।

"হ্যাঁ। ও তোর বৌদি হবে একদিন," হাসি দি মুখ টিপে হেসে বল্ল।

"আমার বৌদি? মানে?"

"তোর একজন জ্যাঠতুতো ভাই আছে জানিস তো?"

"বড়ো জ্যাঠামশায়ের ছেলে? হ্যাঁ শুনেছি। ওরা তো দাদুর সঙ্গেই থাকে, না?"

"দাদু ওদের সঙ্গে থাকেন বল্লেই ঠিক হয়। ওরাই এখন বাড়ির কর্তা। যাই হোক বড় মামার ছেলে শঙ্খকুমার—"

"কি নাম বল্লে?"

"—শঙ্খকুমার। কেন?"

"কী নাম! শঙ্খকুমার। বাপ্ স্"

"শঙ্খকুমারই এখন স্কুল এবং ডিসপেন্সারী দেখা শোনা করে। সে দুটোরই সেক্রেটারী, ডিসপেন্সারীর আর্-এম্-ও।"

"প্র্যাকটিস জমানোর জন্যে এসব মন্দ নয়," বল্ল শ্যামল।

"হ্যাঁ, বেশ পয়সা কড়ি কামায় সে। দাদুর খুব ইচ্ছে লাতুরীর সঙ্গে শঙ্খের বিয়ে দেওয়ার। সে আর লাতুরী ছেলেবেলা থেকেই দুজন দুজনকে চেনে। একসঙ্গে খেলাধূলোও করেছে। লাতুরীর সঙ্গে যথেষ্ট অন্তরঙ্গতাও আছে তার, তা'ছাড়া আমরাও রাজি। মাস দু'তিনের মধ্যেই বিয়ে হয়ে যাবে।"

খানিকক্ষণ চুপ করে রইলো শ্যামল। তারপর বল্ল, "দাদু শঙ্খের সঙ্গে লাতুরীর বিয়ে দিতে চাইছেন কেন?"

"কেন? কি হয়েছে তাতে?"

"না, শঙ্খ এল-এম-এফ ডাক্তার, তার অনেক ভালো ভালো কনে জুটতো, এই, আর কি?" শ্যামল বল্ল। হাসি দি একটু

তাকিয়ে দেখলো শ্যামলের দিকে, তারপর বল্ল, "লাতুরী আর শঙ্খ ছেলেবেলার বন্ধু।"

"ও," শ্যামল চুপ করে গেল।

হাসি দি চুপচাপ পান সাজলো একটা, সেটি এগিয়ে দিলো শ্যামলের দিকে, তারপর আরেকটি সেজে, সেটি মুখে পুরে বল্ল, "অবশ্যি আরো একটি কারণ আছে যে জন্যে দাদু লাতুরীর বিয়ে দিতে চান শঙ্খের সঙ্গে।"

"কি কারণ ?"

"দাদুর জীবনের একটি মস্তো বড় স্বপ্ন আমাদের বাড়ির একটি মেয়ে তাঁর বাড়ি নিয়ে যাওয়া।"

"কেন ?" শ্যামল জিজ্ঞেস করলো।

"সে এক মস্তো ইতিহাস। তুই বোধ হয় জানিস না, দাদু এত পয়সা করেছিলেন কি করে জানিস ?"

"কে যেন দিয়েছিলো বলে শুনেছিলাম।"

"তুই পুরো ব্যাপারটা জানিস না। শোন তা' হলে—"

* * * *

অনেকদিন আগেকার কথা,—পঞ্চাশ বছরেরও বেশী।

গোপাল সেনের বয়েস তখন তিরিশেরও কম। চাকরী করেন চাটগাঁ সহরে এক সদাগরের গদীতে। মাসে সাড়ে সাত টাকা মাইনে। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত খাতায় মুখ গুঁজে হিসেব লেখেন আর রাত্তিরে বসে ভাবেন কানুনগোপাড়ার যশোদা নামে একটি শ্যামলা মেয়ের কথা।

যশোদা গোপাল সেনের মাসীর ভাসুর ঝি, মাসীর বাড়ি বেড়াতে গিয়ে তাকে দেখেন। মাসীর ইচ্ছে ছিলো বোনপোর সঙ্গে ভাসুর ঝি'র বিয়ে দেওয়ার। যশোদাকে দূর থেকে দেখে গোপালেরও ভালো

লেগে ছিলো। তখনকার দিনে আলাপ পরিচয়ের সুযোগ ছিলো না। তবু সেই দূর থেকে দেখে ভালো লাগার মাধুর্যই ছিলো অসীম। মাসী গোপাল সেনকে ডেকে একদিন জিজ্ঞেস করলেন, কি বলিস, তোর মায়ের কাছে কথাটা পাড়বো? গোপাল সেন মুখ লাল করে মাথা নীচু করে বসে রইলো।

মাসতুতো বোন যশোদাকে গিয়ে বল্ল, "গোপাল দা'কে তোর পছন্দ হয়?" যশোদা "যাঃ অসভ্য" বলে ছুটে পালালো।

এদের মন বুঝে নিলেন গোপাল সেনের মাসী। তারপর কথা পাড়লেন যশোদার বাপের কাছে।

সেখানেই গণ্ডগোল বাধলো।

গোপাল সেন পড়াশুনো করেছে কদ্দুর?—নিম্ন প্রাইমার পর্যন্ত। কি করে সে?—কিচ্ছু না। তার বাপের ভিটে বাড়িটিও যে বাঁধা দেওয়া আছে অবিনাশ মহাজনের কাছে, সেটা ছাড়ানো হয়েছে?—

এমন ছেলেকে মেয়ে দিতে রাজি হোলো না যশোদার বাপ। যার চাল নেই, চুলো নেই, তার সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার চেয়ে মেয়েকে কর্ণফুলীতে ভাসিয়ে দেওয়া অনেক ভালো, তিনি বল্লেন।

জামাকাপড়ের পুটলী বেঁধে গোপাল সেন তখন সহরে চল্ল চাকরির খোঁজে। মাসতুতো বোনের কাছে শুনলো যশোদা তাকে বলেছে, সে গোপালকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করবে না। যদি দরকার হয় তো সারা জীবন অপেক্ষা করবে গোপালের জন্যে। শুধু গোপাল যেন তাকে ভুলে না যায়।

চাকরী পেলো। মোটে সাড়ে সাত টাকা মাইনে। তাতে একজনের চলে, সংসার করা চলে না।

আট নয় মাস কাজ করেই কর্তাকে খুসী করে দিলো সে। কর্তা বল্লে, মাইনে দশ টাকা করে দেবে আগামী বৈশাখ থেকে।

মাসীকে এই সুখবর জানিয়ে চিঠি লিখে দিন গুনতে লাগলো গোপাল সেন।

তারপর একদিন—চৈত্রমাস শেষ হতে তখনো দিন আঠারো বাকি—মাসী-র কাছ থেকে খবর এলো যশোদার বিয়ের ঠিক হয়ে গেছে। ছেলেটি সুপাত্র, গৈরলার এক স্কুলে মাষ্টারী করে।

আর সেই সঙ্গে পেলো মাসতুতো বোনের গোটা গোটা অক্ষরে লেখা চিঠি: সে বলিয়াছে সে বিবাহ করিবে না। তুমি অবশ্য ২ আসিয়া তাহাকে লইয়া যাইবে। তাহা যদি না হয় সে বিষ খাইয়া আত্মহত্যা করিবে।

খবর পেলো সন্ধ্যের মুখে। একটি রাতও তার সবুর সইলো না। তক্ষুনি বেরিয়ে পড়লো ঘর থেকে। চাকভাই এসে দেখে খেয়ার নৌকো চলে গেছে অনেকক্ষণ।

আলুর চালান নিয়ে ব্যাপারীদের একটা নৌকো ছাড়ছিলো।

"আমায় নেবে?" জিজ্ঞেস করলো গোপাল সেন।

"কোথায় যাবে?"

"শ্রীপুর।"

"শ্রীপুর তো নৌকো যাবে না। আমরা যাবো লাম্বুর হাট।"

"ঠিক আছে। সেখান থেকে সাম্পান নিয়ে নেবো। শ্রীপুর আর লাম্বুরহাট তো নদীর এপার আর ওপার।"

জোয়ারের টান কমে আসছিলো। নৌকো যখন লাম্বুরহাট পৌছালো, এক প্রহর রাত।

আকাশে খুব ফ্যাকাশে এক ফালি চাঁদ। নদী স্তব্ধ। স্রোত প্রায়

নিশ্চল। ঢেউ নেই একটুকু। চারদিক থমথমে। গাছের পাতা নড়ছে না। ডাল নড়ছে না। আঁধারের বুক থেকে শুধু অসংখ্য ঝিঁ ঝিঁ পোকার সাড়া, শেয়ালের ডাক নেই, ব্যাঙের আওয়াজ নেই— দূরান্ত গ্রামের দু' একটি প্রদীপ দূর আকাশের নিস্প্রভ তারার মতো মিটমিট করছে।

সাম্পান পাওয়া গেল না। একটি জেলে ডিঙি বাচ্ছিলো! গোপাল সেন তাকে ডাকলো।

মালনৌকোর মাঝি বল্লে, "আজ আর ওপারে নাই বা গেলেন বাবু। আমি ভালো বুঝছি না। তুফান উঠবে মনে হচ্ছে। এদিকে চেনা শোনা কারো বাড়ি নেই কি? রাতটা এদিকেই থেকে যান। না হয় আমার সঙ্গে চলুন, আমি রায় বাবুদের কাছারীতে আপনার থাকবার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

গোপাল সেন হেসে বল্ল, "আমি গাঁয়ের ছেলে, তুফানে নদী পেরুনো আমার কাছে কিছু নতুন নয় মাঝিদাদা। এখন চৈত্রমাস। ঝড় তো হামেশাই হবে। তাই বলে কি কেউ নদী পার হবে না। আমায় যেতেই হবে।"

একটি বাচ্চা জেলের ছেলে ডিঙি বাইছিলো। এক আনা পারাণী পাবে শুনে নদী পার হতে রাজি হোলো।

তখনো ভাটার টান সুরু হয়নি, ডিঙিটা প্রায় মাঝ দরিয়ায় গেছে, এমন সময় ঝড় এলো। খাড়া খাড়া তালগাছগুলো প্রায় নুয়ে পড়লো মাটিতে, এপারে ওপারে গাছের শাখায় শাখায় উদ্দাম হয়ে উঠলো ঝড়ের উন্মাদনা। শান্ত কর্ণফুলীর বুকে হঠাৎ অসংখ্য ঢেউ জাগলো মাথার সমান উঁচু হয়ে। এক নিমেষে সারা আকাশ ঢেকে গেল নিকষ কালো মেঘে, আর মুহুর্মুহু বিদ্যুৎস্ফুরণের অসংযত বিহ্বলতায়, প্রচণ্ড

বজ্রনির্ঘোষের শ্রুতিবিদীর্ণ পরিবেশে, ঢেউয়ের আঘাতে আর ঝড়ের ঝাপটায় সমস্ত পৃথিবীর উন্মত্ত ঘূর্ণি সুরু হোলো গোপাল সেনের চারদিকে এবং সমস্ত পৃথিবী তার স্মরণ থেকে অবলুপ্ত হোলো কয়েক নিমিষের মধ্যেই।

যখন জ্ঞান হোলো, তখন দেখে সে শুয়ে আছে একটি কোঠা ঘরে। এক থুথ্থুরে বুড়ি তার জন্যে দুধ নিয়ে আসছে একটি জামবাটি ভরে।

শুনলো যে তুফানের পর তিন দিন কেটে গেছে। বুড়ির কয়েকঘর জেলে প্রজা আছে। তুফানের পরদিন ওরা তাকে নদীর পাড়ে কাদার মধ্যে পড়ে থাকতে দেখে তুলে নিয়ে এসে বুড়ির বাড়ি পৌঁছে দিয়ে গেছে।

বিছানা ছেড়ে উঠতে আরো দিন ছয় সাত লাগলো।

সেখানেই বুড়ির কাছে শুনলো যে এরকম তুফান বুড়ি আর তার সাড়ে তিন কুড়ি বয়েসের মধ্যে আর দেখেনি। বহু জায়গায় বন্যা হয়েছে আর ঘর বাড়ি ভেঙে চুরে, মানুষজন গরু ছাগল ভেড়ার প্রাণহানি হয়ে দেশের যে কি পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে তার আর হিসেব করা যায় না।

গোপাল সম্পূর্ণ সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত বুড়ি তাকে কিছুতেই ছাড়তে চাইলো না। বল্ল, বহু বছর আগে তার একমাত্র ছেলে কর্ণফুলীতে ঝড়ে নৌকোডুবি হয়ে মরেছে, আর আজ বহু বছর পর আরেক ছেলে সে ফিরে পেয়েছে এই তুফানের পর। "তোর মা নেই, বাপ নেই, এমন কি টান তোর দেশের উপর যে তোকে যেতেই হবে?"

এ গাঁড়ে বুড়ির জমাজমি আছে কিছু। গাঁয়ের সবাই ভালোবাসে তাকে, তার দেখাশুনো করে। লোকের বিপদে আপদে বুড়িও তাদের দু'চার পয়সা ধার দেয়। নিজে একবেলা খিচুড়ি রেঁধে খায়, অতিথি এলে

তাকেও খিচুড়ি রেঁধে খাওয়ায়। তাই লোকে তার নাম দিয়েছে খিচুড়ি বুড়ি।

"কে তোর অপেক্ষায় দিন গুনছে, বল আমায়—," জিজ্ঞেস করলো খিচুড়ি বুড়ি।

গোপাল সেন ভাবলো অনেকক্ষণ। তার বহু ঢোক গিলে কান দুটো লাল করে তার গোপন কথা বলে ফেল্ল বুড়িকে।

শুনে খিচুড়ি বুড়ি হেসে বল্ল, "ও, এই ব্যাপার?"

তার পরের ব্যাপারটা ঠিক রূপকথার গল্পের মতো।

বুড়ির স্বামী মিউনিটির সময় চাকরী করতো সিপাইদের ব্যারাকে। যখন বিদ্রোহ আরম্ভ হলো, সেপাইরা ট্রেজারি লুঠ করে পালাবার সময় একজন সেপাই তার ভাগের মোহরগুলো গচ্ছিত রেখে গেল এদের কাছে। বহুবছর কেটে গেল। কেউ আর ফিরে এসে মোহরগুলো দাবী করলো না। বুড়ির স্বামী হিসেবী লোক। দেশে সামান্য কিছু জমাজমি করে বাকি টাকাটা সঞ্চয় করেই সে ইহলীলা সংবরণ করলো। এখন আর সে টাকা ভোগ করবার কেউ নেই।

বুড়ি বল্লে, "টাকাগুলো তুই নে।"

দিন দুই পর গোপাল সেন যখন শ্রীপুরে ফিরে এলো, তখন সে বেশ বিত্তবান লোক। সবাই শুনলো সহরে ব্যবসা করে গোপাল সেন দু'পয়সা করেছে। মহাজনের হাত থেকে নিজের পৈত্রিক ভিটে বাড়ি ছাড়িয়ে নিলো গোপাল সেন। ডাইনে বাঁয়ে প্রতিবেশী জ্ঞাতিদের জমিগুলো কিনে রাতারাতি বাড়ীর সীমানা বাড়িয়ে দিলো। তুফানের পর দেশের তখন দুর্দিন যাচ্ছে। যে যা' টাকা পেলো তা'তেই জমি ছেড়ে দিলো গোপাল সেনকে।

দিন পাঁচেক পর গোপাল সেন কাঁচি পাড় ধুতি পরে পাল্কী চেপে চল্ল কানুনগো পাড়ায় মাসীর বাড়ি।

"দেখি এবার কি বলে ব্যাটাচ্ছেলে যশোদার বাপ," গোপাল সেন ভাবলো।

গিয়ে দেখলো যশোদা নেই। তার বিয়ে হয়ে গেছে। সারোয়াতলির স্কুল মাষ্টারের সঙ্গে নয়। আরেকজনের সঙ্গে। সে সহরে হাস-পাতালের কম্পাউণ্ডার।

চুপ করে শুনলো গোপাল সেন। তারপর মুখ সহজ ভাবে মাসীকে বল্ল, মাসীমা, এবার একটা ভালো সম্বন্ধ দেখুন আপনার পছন্দ মতো।"

* * * * *

বছর তিরিশ পঁয়ত্রিশ পরের কথা।

বহুকাল আগেকার সেই ভীষণ তুফানের কথা লোকে ভুলে গেছে। কখনো সখনো শুধু তার আবছা-স্মরণ গল্প শোনা যায় বুড়োবুড়িদের মুখে।

গোপাল সেনের বাড়ি তখন লোকজন আশ্রিত পরিজনে গমগম করছে।

তাঁর তিন ছেলে ও এক মেয়ে—মণিগোপাল, প্রিয়গোপাল, নন্দগোপাল ও সুরমা। সুরমার ভালো বিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু বছর খানেকের মধ্যেই সে বিধবা হয়ে একমাত্র মেয়েকে নিয়ে বাপের বাড়ি ফিরে এসেছিলো।

মেয়েটির নাম হাসি।

বড়ো ছেলে মণিগোপাল একেবারে নিষ্কর্মা।

তারও এক ছেলে, নাম শঙ্খকুমার।

মেজ ছেলে প্রিয়গোপাল আর ছোটো ছেলে নন্দগোপালের অবশ্য

বিয়ে হয়নি। মানুষ হয়েছে এরা দুজনই। প্রিয়গোপাল অনার্স নিয়ে বি-এ পাশ করেছে, আর নন্দগোপাল আই-এ পড়ছে চাটগাঁ কলেজে।

এমন সময় হাসপাতালের চাকরী থেকে রিটায়ার করে দেশে ফিরলো যশোদার স্বামী, শ্যামাচরণ মজুমদার। সঙ্গে এলো যশোদা আর তাদের তিন ছেলেমেয়ে। বড়ো ছেলে নৃপতির বিয়ে হয়ে গেছে, ছেলে আছে একটি। দুই মেয়ে নির্মলা আর কুন্তলার তখনো বিয়ে হয় নি।

মনে মনে একটা অঙ্ক কষলেন গোপাল সেন।

সেনেদের বাড়ির ছেলেকে কে মেয়ে দেবে?—একদা বলেছিলো যশোদার বাপ্। সে কথা কোনোদিন ভুলে যাননি গোপাল সেন।

কাউকে কিছু বল্লেন না।

দু' বাড়ির মধ্যে আনাগোনা সুরু হোলো।

একদিন মেজোছেলে প্রিয়গোপালকে ডেকে বল্লেন—তোর বিয়ের ঠিক করেছি।

আকাশ থেকে পড়লো প্রিয়গোপাল। সে তখন বিলেত যাওয়ার পরিকল্পনা করছে।

"কোথায়?"

"শ্যাম মজুমদারের মেয়ে নির্মলার সঙ্গে—।"

প্রিয়গোপাল তখন জানালো যে সে আপাততঃ বিয়ে করবে না।

গোপাল সেন ভাবলেন হয় তো নির্মলাকে ওর পছন্দ নয়, তিনি দু' চার কথায় মেয়েটির এবং মেয়েটির বাপের সুখ্যাতি করলেন।

"সে জন্যে নয়," প্রিয়গোপাল বল্ল, "ভাবছি এম-এ পাশ না করে বিয়ে করবো না।"

এই নিয়ে বাপে ছেলেতে তুমুল তর্কাতর্কি হয়ে গেল।

ছুপুরে খেতে বসে কেউ কারো সঙ্গে কোনো কথা বল্ল না।

সন্ধ্যেবেলা উঠোনে পায়চারী করতে করতে বাপ ভাবলো, আচ্ছা, বিয়ে করতে চায় না তো না করুক, কিন্তু ছেলেটা আমার কথা দিক যে সে এম-এ পাশ করে এ মেয়েকেই বিয়ে করবে। আমি সে ভাবেই পাকা কথা দিয়ে রাখি শ্যাম মজুমদারকে।

বোঝাপড়ার ভিত্তি হিসেবে এই প্ল্যান মন্দ লাগলো না প্রিয় গোপালের বাপ গোপাল সেনের।

সন্ধ্যের পর বাড়ীর ভিতর এসে খোঁজ করলেন প্রিয়গোপালের।

শুনলেন ছেলে বাড়ি নেই।

"কোথায় গেল আবার ?"

"নোয়াপাড়া।"

"সেখানে কি ?"

"কেন এক বন্ধুর বাড়ি রাত্তিরে নিমন্ত্রণ।"

"ফিরে এলে আমার ঘরে একবার পাঠিয়ে দিও।"

"রাত্তিরে ফিরবে না। কাল সকালে ফিরবে।"

ফিরে চলে গেলেন গোপাল সেন।

প্রিয় গোপাল তার পরদিন সকালে ফিরলো। কিন্তু একা নয়—

সঙ্গে একটি পাল্কী।

বাড়ির সবাই অবাক হয়ে দেখে পাল্কী থেকে নামছে একটি ভারী সুন্দর মেয়ে। ফর্শা গায়ের রঙ, মাথায় সিঁদুর, পরণে লাল চেলী।

"তুই বৌ আনলি নাকি রে ?"

অপ্রতিভ হাসি হাসলো প্রিয় গোপাল।

ভবিতব্যের কাছে এরকম বোকা বনবে সে ভাবতে পারেনি।

এক বন্ধুর বাড়ি নেমন্তন্ন খেতে গিয়েছিলেন।

কাছে আরেকটি বাড়িতে তখন শানাই বাজছে। খুব গরীব বিধবার একমাত্র মেয়ের বিয়ে। লগ্ন রাত দশটায়।

খাওয়া দাওয়া সেরে প্রিয়গোপাল আর তার বন্ধু শুয়ে পড়লো।

তারপর হঠাৎ হৈ চৈ সুরু হোলো বিয়ে বাড়িতে। মারধোরের আওয়াজ পাওয়া গেল।

ছুটে গেল প্রিয়গোপাল আর তার বন্ধু।

গিয়ে দেখে ব্যাপারটা আর কিছু নয়, বিয়ের বর এক পঁয়ষট্টি বছরের বুড়ো।

সে বিদায় নিলো অর্ধচন্দ্র খেয়ে।

কিন্তু মেয়েটি হাতে মালা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ছাতনাতলায়—সে কি ফিরে যাবে?

উতরোল উলুধ্বনি মধ্যে পিড়ির উপর উঠে দাঁড়ালো প্রিয়গোপাল।

বুড়ো গোপাল সেন ক্ষেপে গেলেন। "এ গল্প আমায় বিশ্বাস করতে বলো? ও সব মতো বাজে কথা। আসলে অন্য ব্যাপার। বিয়ের ঠিক ছিলো আগের থেকে নিশ্চয়ই। আমায় লুকিয়ে বিয়ে করে এখন আষাঢ়ে গল্প ফাঁদা হচ্ছে।"

ছেলেকে বল্লেন, "কী হে, তুমি না বলেছিলে এম-এ পাশ না করে বিয়ে করবে না? এখন কোন মুখে পরের বাড়ি মেয়ে একটা আমার ঘাড়ে এনে ফেলছো? যাও, বৌকে বাপের বাড়ি দিয়ে এসো গে। যেদিন নিজে রোজগার করবে, সেদিন বৌকে ঘরে আনবে, তার আগে নয়।"

প্রিয়গোপাল চোখ তুলে তাকালো বাপের দিকে। তারপর বল্ল, "বেশ, বৌকে নিয়ে যাচ্ছি। নিজেই রোজগার করে খাওয়াবো বৌকে। [illegible] জন্যে আপনাকে আর ভাবতে হবে না কোনোদিন। আমিও

আর ফিরবো না এ বাড়িতে। যে বাড়িতে আমার বৌকে প্রথম দিনই অপমান পেতে হয়, সে বাড়ির সম্পর্ক আমি আর রাখবো না।"

সেই পাল্কীতেই বৌ চলে গেল। পেছন পেছন গেল প্রিয়গোপাল।

সেই থেকে গোপাল সেন আর কোনো খবর পান নি প্রিয়-গোপালের। বহুদিন পর একদিন শুনেছিলেন, ওর ছেলে হয়েছে একটি, নাম তার শ্যামল।

* * * * *

গোপাল সেনের ছোটো ছেলে নন্দগোপাল। তখন তার বয়েস খুব বেশী নয়। চাটগাঁ কলেজে ফোর্থ ইয়ারে পড়ে। বাপের অত্যন্ত বাধ্য। গ্রামের প্রত্যেকেই খুব ভালবাসতো তাকে।

মজুমদার বাড়িতে তার যাওয়া আসা ছিলো।

যেতো বিলাস চৌধুরীর কাছে। বিলাস চৌধুরী মজুমদার বাড়ির প্রাইভেট টিউটার, যশোদার নাতি ভূপতিকে পড়াতো। থাকতো এবং খেতো মজুমদার বাড়িতেই। সম্প্রতি ভিড়ে গিয়েছিলো রাজনৈতিক আন্দোলনে। বাড়ি থাকতো খুব কম দিনই। তবু প্রাইভেট টিউটারের পদে কায়েমীভাবেই বহাল ছিলো, কারণ তাকে ভালবাসতো সবাই এবং বাড়ির ছেলের মতোই হয়ে উঠেছিলো সে। নন্দগোপাল যেতো তারই কাছে, রাজনীতি, সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতি নানারকম বিষয় আলোচনা করে সময় কাটাতো।

কিছুদিন থেকেই বিলাস চৌধুরীর পেছনে আই-বি'র লোক ঘুরছিলো। একদিন বিলাস চৌধুরী ফেরার হোলো।

তারপর দেখা গেল নন্দগোপাল ভূপতিকে পড়াতে স্বরু করেছে।

গোপাল সেন একদিন ছেলেকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুই হঠাৎ ওদের বাড়ি টিউশানী নিতে গেলি কোন দুঃখে।"

ছেলে বল্ল, "টিউশানী তো নয়। এমনি পড়াচ্ছি। বিলাস দা' বলে গেছেন মাঝে মাঝে গিয়ে ভূপতির পড়াটা দেখিয়ে দিতে। তা' নইলে ছেলেটার অসুবিধে হবে।"

গোপাল সেন মুখে আর কিছু বল্লেন না, কিন্তু নজর রাখলেন ছেলের উপর। বেশীদিন অপেক্ষা করতে হোলো না। পরপর তিনদিন যখন তাকে দেখতে পেলেন হাওলার কালাচাঁদ ঠাকুরের মন্দিরের কাছে অশথ গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে আর মন্দির থেকে বেরিয়ে পাল্কীতে উঠছে যশোদা আর তার মেয়ে কুন্তলা, তখনই বুঝে নিলেন আকর্ষণ কোথায়।

এরকম একটি ইচ্ছে যে তাঁর মনে ছিলো না তা' নয়, তবে এমনি হয়তো ছেলে বি-এ পাশ করবার আগে কাউকে কিছু বলতেন না। কিন্তু এবার ভাবলেন যে, নাঃ, বিয়েটা তাড়াতাড়ি করিয়ে দেওয়াই ভালো।

নন্দগোপালের চুরি করে করে কুন্তলাকে দেখে নেওয়াটা যশোদার চোখ এড়ায়নি। বহুদিন তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে বিলাসের সঙ্গে তর্ক করতে করতে বাড়ির ভিতর চেনা গলায় হাসির আওয়াজ শুনে নন্দগোপাল আনমনা হয়ে গেছে, সন্ধ্যেবেলা ভূপতিকে পড়াতে পড়াতে জানালা দিয়ে তার চোরা চাউনি চলে গেছে উঠোনের ওধারে ঠাকুর ঘরের দিকে, সেখানে বিগ্রহের আরতি করছে বাড়ির পুরোহিত সাঁইর ঠাকুর, আর কুন্তলা শাঁখ হাতে নিয়ে বসে আছে আরতির শেষে প্রণাম করে ঠাকুরের চরণামৃত নেবার অপেক্ষায়।

যশোদা নিজের থেকে এসেই কথা পাড়লেন গোপাল সেনের কাছে। গোপাল সেন খুসি মনে রাজি হয়ে গেলেন।

তখন শোনা গেল কুন্তলা কান্নাকাটি করছে। সে বলছে সে এখন

বিয়ে করবে না, সে মাকে ছেড়ে থাকতে পারবে না, এবং আর যা' সব বলে থাকে বিয়ে করতে নারাজ মেয়েরা।

শুনে নন্দগোপাল খুব মর্মাহত হোলো। বাপকে এসে বল্ল, বিয়েটা এখন স্থগিত থাক বাবা। ও যখন বিয়ে করতে চাইছে না তখন আরো কিছুদিন যাক, আমি বি-এ টা পাশ করে নি—

গোপাল সেনের মুখ থেকে মেঘ গর্জন নিস্থত হোলো। "তোরা কী ভেবেছিস। বিয়ে থা'কি সব তোদের ইচ্ছে মতো হবে নাকি। আমরা যেন বাড়ির কেউ নই, আমাদের বুদ্ধি বিবেচনা মতামতের যেন কোনো দাম নেই। যা, যা, দূর হ' আমার সামনে থেকে—।"

যশোদা বল্লেন, "বিয়ের আগে সব মেয়েই ওরকম কান্নাকাটি করে। মা'কে ছেড়ে থাকতে পারবে না তো থাকতে বলছে কে। বিয়ে করে তো আর চোখের আড়াল হবে না। এপাড়ায় বাপের বাড়ি আর ও পাড়ায় শ্বশুর বাড়ি, এরকম সৌভাগ্য ক'টা মেয়ের হয় ?"

বিয়ের আয়োজন পুরোদমে চল্ল। নৌকো বোঝাই তৈজসপত্র উপকরণ আসবাব এলো সহর থেকে। আবুল মাঝির নৌকো এবেলা ও বাড়ির কুটুম নিয়ে আসে তো ও বেলা কুটুম নিয়ে আসে এ বাড়ির। আত্মীয় স্বজন এ বেলা গোপাল সেনের বাড়ি নেমন্তন্ন খায় তো ও বেলা খেতে যায় শ্যাম মজুমদারের বাড়ি। কালাচাঁদ ঠাকুরের বাড়ি পূজো দিতে দু'বাড়ির মেয়েরা দল বেঁধে যায় একসঙ্গে।—এমনি ভাবে ঘটা করে বিয়ের আয়োজন করলেন গোপাল সেন, প্রিয়গোপালের বিয়ে নিজের হাতে দিতে না পারার দুঃখ ঘুচাতে চাইলেন নন্দগোপালের বিয়েতে জাঁকজমক করে।

গায়ে-হলুদের দিন সন্ধ্যেবেলা যখন বেহাগ-খাম্বাজে শানাই বাজছে গোপাল সেনের দেউড়িতে, আর মুহুর্মুহু হুলুধ্বনিতে চমকে চমকে উঠে

সামনের পুকুরের ওপারের কদম গাছে সোরগোল জুড়ে দিয়েছে বাড়ি ফিরে আসা পাখীগুলো, কাছারি ঘরের বারান্দায় যখন হুঁকো গড়গড়ার ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় পরচর্চার তুফান তুলেছে ভিনপাড়ার কলকণ্ঠ অভ্যাগতেরা, গোপাল সেনের এক জ্ঞাতিভাই ছুটে এলো অন্দর মহলে, এসে চেঁচিয়ে বল্লে, অনুষ্ঠান বন্ধ করো।

সোরগোল পড়ে গেল চারদিকে। লোকজন ছুটে এলো। মেয়েরা ভীড় জমালো দরজা, জানালা, ঘুলঘুলির পেছনে। কি হয়েছে রে, কি ব্যাপার—এ জিজ্ঞেস করতে লাগলো ওকে আর ও জিজ্ঞেস করতে লাগলো তা'কে।

ব্যাপারটা জানাজানি হতেই সোরগোল থেমে গেল অকস্মাৎ, স্তব্ধ হয়ে গেল সারা বাড়ি, থেমে গেল হুঁকো গড়গড়ার মেঘমন্দ্র ধ্বনি।

কনেকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

কনে পালিয়ে গেছে, বলছে সবাই। কান্নাকাটি পড়ে গেছে মজুমদার বাড়িতে। যশোদার মূর্ছা ভাঙেনি এখনো।

কে যেন বলছে, বিকেল নাগাদ পূজারী বামুন সাইর ঠাকুরকে সে দেখেছে অন্দরমহলের দিকে যেতে। আর দেখেছে কুন্তলাকে বেরিয়ে এসে তার সঙ্গে কথা বলতে। সাইর ঠাকুরের সর্বত্র অবারিত দ্বার, কেউ অতো গা' করেনি তার উপস্থিতিকে। তার পর সাইর ঠাকুর চলে গিয়েছিলো কিনা, কুন্তলা দু'তলায় ফিরেছিলো কিনা কেউ সঠিক বলতে পারে না। কাজের ভীড়ে সবাই যখন সবার চোখের সামনে থাকে কেউ নাকি কাউকে লক্ষ্য করেনা অতোটা।

কে যেন এসে বল্লে, সাইর ঠাকুরকেও দেখা যাচ্ছে না কোথাও। ঘোষ পাড়ায় কোনো বাড়িতেই সে আরতি করতে যায়নি এবেলা।

কেউ নিজের কানও বিশ্বাস করতে চায় না।

সাইর ঠাকুর অবশ্যি উত্তীর্ণযৌবন নয়, কিন্তু তা' হলেও সে বিবাহিত, বাড়িতে বৌ ছেলেমেয়ে আছে, অত্যন্ত নির্মল চরিত্রের নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। তার সম্বন্ধে নোংরা কিছু ভাবতেই বাধে।

কিন্তু গোলামবাড়ির কানাই পুতু যে বলছে সে ঠিক সন্ধ্যে নাগাদ সাইর ঠাকুরকে নদীর ধারে আবুল মাঝির সাম্পানে চাপতে দেখেছে হাতে একটি পুটুলি নিয়ে! সঙ্গে নাকি ছিলো কে একজন অবগুণ্ঠিতা, যার মুখ সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসা আধো অন্ধকারে ভালো করে দেখতে পায় নি কানাই পুতু।

সাইর ঠাকুরের বাড়ি থেকে খবর এলো সাইর ঠাকুরের বৌ আর্তনাদ সুরু করে দিয়েছে।

গোপাল সেন সিংহ গর্জন ছাড়লেন—যেমনি ভাবেই হোক, যেখান থেকে হোক, মেয়ে নিয়ে এসো আমার ছেলের জন্যে। আমি টাকা চাই না, রূপ চাই না, শুধু ভালো ঘর হলেই হোলো। মেয়েপক্ষের সব খরচা আমার।

এক ডজন মেয়ের খোঁজ এসে গেল দশ মিনিটের মধ্যে। কিন্তু নন্দগোপাল সব বানচাল করে দিলো। মাকে ডেকে বল্ল, "আমার বাক্সপত্তর সব গুছিয়ে দাও মা, কাল সকালের নৌকোয় আমি সহরে যাচ্ছি।"

"নন্দগোপাল!" জন্মদাতার বজ্রনিনাদ শ্রুত হোলো।

এতদিনকার মুখচোরা ছেলে আজ নন্দগোপাল নির্বিকার ভাবে বল্ল, "পরশু থেকে আমার কলেজ খুলে যাচ্ছে। আমি এখানে বসে থেকে আর সময় নষ্ট করতে পারবো না।"

শানাই বগলে চেপে ঢাক কাঁধে তুলে রসুনচৌকির দল বিদায় নিলো।

কাঠের খড়ম ঠক ঠক করতে করতে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গিয়ে নিজের ঘরে খিল দিলেন গোপাল সেন।

* * * * *

তিন দিন পর কুন্তলা ফিরে এলো সাইর ঠাকুরের সঙ্গে। মাথায় সিঁদুর, হাতে লোহা। বাপের বাড়িতেই গিয়ে উঠলো। কেউ কিছু বল্ল না, বরং তাকে আদর করেই ঘরে তুলে নিলেন যশোদা। সাইর ঠাকুরকে কেউ কিছু তো বল্লই না, বরং সে আরো বেশী শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে উঠলো সবার কাছে। যজমানদের বাড়ি পূজো করে বেড়াতে লাগলো আগের মতো। তার স্ত্রী কোনোরকম অভিমান করলো না তার উপর।

—কারণ ওরা ফেরার আগেই সবাই জেনে গিয়েছিলো কুন্তলার বিয়ে হয়েছিল কার সঙ্গে।

বিলাস চৌধুরী তার নাম।

তখন দেশজুড়ে তার পরিচয়খানি মজুমদার বাড়ির প্রাইভেট টিউটারের পরিচয়ের চেয়ে অনেক অনেক উঁচুতে। সে তখন ফেরার— কিন্তু সারা দেশ তার নামে গর্ববোধ করে। বিপ্লবী আন্দোলন তখনো সুরু হয়নি, কিন্তু প্রস্তুতি চলছে সেই কয়েক বছর আগে থেকেই, এমন কি আন্দোলনের নেতারা অনেকে প্রাকাশ্যেই চলাফেরা করে তখনো। সেই অনাগত আন্দোলনের সংগঠনে মাষ্টার দা, অম্বিকা চক্রবর্তী, অনন্ত সিং, গনেশ ঘোষদের নামের সঙ্গে বিলাস চৌধুরীর নামও তখন সবার মুখে মুখে ফিরতে সুরু করেছে।

বিলাস চৌধুরীর সঙ্গে কুন্তলার হৃদয় বিনিময় করে নেওয়া ছিলো অনেকদিন আগে থেকেই। শুধু তাকে ফেরার হয়ে যেতে হওয়ায় অভিভাবকদের জানানোর অবকাশ হয়নি। বিয়ের মুখে সাহায্য পাওয়ার

মতো আর কাউকে না পেয়ে নিরুপায় হয়ে বাড়ির পুরোহিত সাইর ঠাকুরকেই ব্যাপারটা ভেঙে বলেছিলো কুন্তলা। সাইর ঠাকুরই বিলাস চৌধুরীর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে, সব কিছু ব্যবস্থা করে, কুন্তলাকে নিয়ে চলে গিয়েছিলো কর্ণফুলীর ওপারে এক কেউ-না-জানা গাঁয়ে কা'রো-না-জানা বাড়িতে। সেখানেই কুন্তলার বিয়ে হলো বিলাস চৌধুরীর সঙ্গে। সাইর ঠাকুরই দিয়েছিলো বিয়েটা।

বিলাস চৌধুরীর বৌ যে, সে দেশের সবারই সম্মানের পাত্রী।

তাই আর কোনো কথাই উঠলো না।

* * * * *

কুন্তলা ফেরার রাজনৈতিক কর্মী স্বামী নিয়ে ঘর সংসার করতে পারেনি আর দশজনের মতো। বেশীর ভাগ সময় বাপের বাড়িতেই থেকেছে সে। কিন্তু তার সুখের অভাব হয় নি। নিজের কাজের ফাঁকে ফাঁকে কুন্তলার বাপের বাড়িতে এসেই তার সঙ্গে দেখা করে যেতেন বিলাস চোধুরী, সে সময় তিনি ফেরারই থাকুন বা প্রাকাশ্যেই থাকুন।

বিলাস চৌধুরীর মনকে কোনোদিন সংসারের দিকে টানেনি কুন্তলা, বরং যথেষ্ট প্রেরণা জুগিয়েছিলো তাঁর নিজের কাজে। এসব নিয়ে ঝঞ্ঝাট কম পোয়াতে হয়নি। পুলিশের উৎপাত তো লেগেই ছিলো সব সময়, কিন্তু পুলিশের চোখ এড়িয়ে কি করে স্বামী আর স্ত্রী উপভোগ করতো বিপুল কাজের ফাঁকে কখনো সখনো পাওয়া নিরালা অবসরের মুহূর্ত, কি করে পারিবারিক জীবনের মাধুর্যে ভরে তুলতো নিজেদের অনিশ্চয়তাময় জীবন, তার পূর্ণ বিবরণ কেউ না জানলেও, তার রোমাঞ্চ সবারই মনে আনতো সহানুভূতির শ্রদ্ধা।

কুন্তলার মেয়ে দাতু যখন জন্মালো তখন চাটগাঁর বিপ্লবী আন্দোলনের প্রস্তুতি প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। বেশীর ভাগ নেতাই ফেরার।

বিয়ে ভেঙে যাওয়ার পর নন্দগোপালের জীবনেও একটা পরিবর্তন এলো। গোপাল সেন সেটা লক্ষ্য করলেন বেশ উৎকণ্ঠার সঙ্গেই।—ছেলের মন ঠিক সংসারে নেই, কোনো আগ্রহ নেই সাংসারিক ব্যাপারে, অন্য কিছু যেন তার সমস্ত সত্তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। ছেলে বেশীর ভাগ সময় বাড়ি থাকে না, বাড়ি থাকলেও কারো সঙ্গে বেশী কথাবার্তা বলে না। তিনি বুঝবার চেষ্টা করলেন, বুঝতে পারলেন না, বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলেন, সফল হলেন না, নিজেকে বোঝাতে চাইলেন, বোঝাতে পারলেন না।

তখন হাল ছেড়ে দিয়ে স্ত্রীকে বল্লেন, "যাকগে, ও যা' খুসি করুক।"

এলো উনিশ শো তিরিশ।

গোপাল সেনের বিধবা মেয়ে সুরমা থাকতো তাঁরই সঙ্গে। তার মেয়ে হাসি বড়ো হয়ে উঠলো ইতিমধ্যে। যশোদার নাতি ভূপতি, বড় হয়ে উঠলো সেও।

গোপাল সেন আর যশোদা একদিন বসে স্থির করলেন, যাক, এর ছেলের সঙ্গে ওর মেয়ের বিয়ে পর পর দুবার চেষ্টা করেও যখন হোলো না তখন এর নাতনীর সঙ্গে ওর নাতিরই বিয়েটা হোক তা' হলে।

যশোদার স্বামী শ্যাম মজুমদার বল্লে, আমার নাতি যে একেবারে ছেলেমানুষ, সবে কুড়ি পেরুলো—

গোপাল সেনের স্ত্রী সরলা বল্লে, আমার নাতনি যে একেবারে কচি মেয়ে, সবে চোদ্দোয় পড়েছে—

গোপাল সেন বা যশোদা ওসব আপত্তি কানে তুল্লেন না। বল্লেন, একেবারে ছেলেমানুষ হলেই বিয়েটা নিশ্চিন্ত হয়ে দেওয়া যায়।

এবারেও বিয়ের আয়োজনটা বেশ ঘটা করেই হোলো।

দিন স্থির হোলো, এপ্রিলের আঠারোই।

কিন্তু গোপাল সেনের বাড়িতে তখনো নন্দগোপালের দেখা নেই। গোপাল সেন বার বার লোক পাঠালেন সহরে। কেউ তার দেখা পায় না। অবশেষে বিয়ের আগের দিন খবর পেলেন, ছেলে বলে পাঠিয়েছে তার মাকে—অত্যন্ত কাজে ব্যস্ত বলে আসতে পারছে না, বিয়ের দিন রাত্তিরে আসবে।

বিয়ের দিন রাত্তিরে আরো একজনের আসবার কথা। বিলাস চৌধুরীর। খবর পাঠিয়েছিলো কুন্তলার কাছে।

বিয়ের দিন সন্ধ্যেবেলা যখন বাড়ি শুদ্ধ সবাই আনন্দ কোলাহলে মত্ত, মেয়েদের উলু আর শাঁখের আওয়াজে যখন প্রায় জোয়ার এসে গেল কর্ণফুলীতেও, আর বিয়ে দেখতে আকাশের তারাগুলোও সব এসে জড়ো হলো গাছের ডালে ডালে আর উঁকি মারলো পাতার আড়াল থেকে, বনবাদাড়ের শেয়ালগুলোও যখন গলা মেলালো শানাইয়ের ইমন কল্যাণের সঙ্গে—তখন দু'বাড়ির দু'জন শুধু মিশে যেতে পারলো না ভীড়ের মধ্যে, ভাগ নিতে পারলো না উৎসবের। মন পড়ে রইলো খেয়াঘাটের দিকে। একজন বার বার ঘুরে ঘুরে এসে দাঁড়ালো দরজায়, তাকিয়ে দেখলো অন্ধকার নেমে আসা বড়ো রাস্তার দিকে। আরেকজন বারবার ঘুরে ঘুরে দুতলার ঘরটির জানালায় গিয়ে দাঁড়ালো গরাদ ধরে, স্নিগ্ধ প্রদীপের কম্পিত শিখায় দেওয়ালের উপর ছায়াটা কেঁপে উঠলো বার বার, উৎকণ্ঠ হৃদয়ের সঙ্গে সঙ্গে।

চারদিন আগে অস্ত্রাগার লুণ্ঠন হয়ে গেছে। কে জানে যদি পুলিশের হাতে ধরা পড়ে থাকে বিলাস চৌধুরী ?

ন'টা বাজলো, দশটা বাজলো। বিয়ে শেষ। এগারোটা বাজলো, বারোটা বাজলো। শেষ হয়ে এলো খাওয়া দাওয়ার পাট। একটা বাজলো, দুটো বাজলো। স্তব্ধ হয়ে এলো নিদ্রাতুর বিয়ে বাড়ি।

দেখা নেই নন্দগোপালের। দেখা নেই বিলাস চৌধুরীর।

বুড়ো গোপাল সেন লণ্ঠন হাতে একটি লোক নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন ফটকের সামনে।

মজুমদার বাড়ির দু'তলার জানালায় প্রদীপ জেলে বসে রইলো কুন্তলা।

তিনটে বাজলো, চারটে বাজলো। চাঁদ অস্ত গেল আমবনের আড়ালে। দমকা হাওয়া এলো মন্থর কর্ণফুলীর বুক পেরিয়ে। আমতলায় ঝুপ ঝুপ করে আম পড়লো দু'চারটে। শেষ রাতের অন্ধকার আরো গভীর কালো হয়ে ঘিরে এলো চারদিক।

জানালার নীচে মেঝের উপর বসে বসেই তন্দ্রা এসেছিলো কখন। ডাক শুনে চোখ খুল্লো। ঝির ঝির হাওয়ায় ঠাকুর-দালানের পাশের যুঁই ফুলের ঝাড় থেকে মৃদু গন্ধ ভেসে এলো ঘরের ভিতর।

চোখ খুলে শুনলো নীচে সোরগোল হচ্ছে।

চট করে উঠে দাঁড়ালো জানালায়। দেখে অনেক লোক জড়ো হয়েছে সামনের উঠোনে। শুনলো গোপাল সেন মূর্ছিত হয়ে পড়ে আছে অনেকক্ষণ থেকে। কেন?—ডেকে জিজ্ঞেস করলো কুন্তলা।

শুনলো, জালালাবাদ পাহাড়ে ভীষণ যুদ্ধ হয়ে গেছে আগের দিন সন্ধ্যায়। বিপ্লবী এবং মিলিটারী, উভয় পক্ষেই অনেক হত ও আহত হয়েছে।

বুক কেঁপে উঠলো কুন্তলার—

বিলাস চৌধুরী—?

না।

বিপ্লবীদের মধ্যে যারা মারা গেছে মিলিটারীর গুলিতে—তাদের মধ্যে একজন গোপাল সেনের ছেলে নন্দগোপাল।

আহত হয়েও বিলাস চৌধুরী পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলো। কিন্তু পুলিশ তাকে শেষরাত্রে গ্রেপ্তার করেছে নন্দনকাননের একটি বাড়িতে।

* * * * * *

"সেই থেকে দাদু কি রকম যেন বদলে গেলেন," হাসি দি' বলে চল্ল, "আগে জীবনে আসক্তি ছিলো পয়সা কড়ি আর জমিজমা। নিজে বিলাসিতা করে উড়িয়েছেন প্রচুর, কিন্তু কাউকে কোনোদিন দান করেন নি এক পয়সাও, কারো কোনোরকম উপকার করেন নি জীবনে। কিন্তু হঠাৎ তাঁর জীবনে একটা পরিবর্তন এলো। টাকা যেন বিলিয়ে দিতে পারলেই তিনি বাঁচেন, এরকম একটি ভাব এলো তাঁর মনে। গাঁয়ে একটা স্কুল করলেন, দাতব্য চিকিৎসালয় করলেন, আরো অনেক ব্যাপারে দান ধ্যান করে ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স প্রায় অর্ধেক করে আনলেন। চাটগাঁ শহরে নিজের বিরাট ওষুধ ও ষ্টেশনারীর ব্যবসায় লালবাতি প্রায় জ্বলে জ্বলে, তখন কি করে যেন বড়ো ছেলে মণিগোপালের বিধবা স্ত্রী আর গোপাল সেনের স্ত্রী যে যার নিজের নিজের বাপের বাড়ির লোকদের সঙ্গে সলা পরামর্শ করে গোপাল সেনকে বুঝিয়ে বুঝিয়ে পুরো সম্পত্তিটা একটা ট্রাষ্ট ফাণ্ড করে ফেলে নিজেরা তার ট্রাষ্টি হয়ে বসলো। এখন বুড়ি আর বেঁচে নেই, আছে মণিগোপালের স্ত্রী আর তাঁর ছেলে শঙ্খকুমার। সেই এখন সর্বেসর্বা।"

"এই তা'হলে আমাদের পরিবারের ইতিহাস," শ্যামল বল্ল।

"হ্যাঁ, আর ইতিহাসটা শুধু সেন-পরিবারের নয়, মজুমদার পরিবারের ইতিহাসও এর মধ্যে মিশে আছে," বল্লে হাসি দি।

"তা'হলে এখন পরিস্থিতিটা কি রকম?"

হাসি দি' হাসলো, বল্ল, "পরিস্থিতি? এখন ও বাড়িতে থাকেন দাদু,

শঙ্খ আর বড়ো মামীমা। ব্যস, আর কেউ নয়। এ বাড়িতে আছি আমি, তোর জামাইবাবু, আমার ননদ লাতুরী, কুন্তলা পিসী আর কুন্তলা পিসীর মেয়ে দাতু। কুন্তলা পিসী মাঝখানে কিছুদিন শ্বশুরবাড়ি গিয়ে থাকবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সেখানে এমন একটি বদমায়েস দেওর ও তার একটি দজ্জাল বৌ আছে যে উনি আর ওখানে বেশীদিন টিকতে পারেন নি, ফিরে এসেছেন এ বাড়িতে।

আর বর্তমান পরিস্থিতির সব শেষের খবর হলো,—কলকাতা থেকে মেজমামা অর্থাৎ প্রিয়গোপালের একমাত্র পুত্র শ্যামল কুমারের আগমন।"

"একটা খবর বাদ দিয়ে গেছ হাসি দি" বল্ল শ্যামল।

"কোনটা?"

"লাতুরীর সঙ্গে শঙ্খকুমারের বিয়ের ঠিক হওয়ার খবর—।"

"ও," হাসি দি' তাকালো শ্যামলের দিকে। নিমেষের মতো ডাগর চোখে একটি মেয়েলি বিশ্লেষণ-প্রচেষ্টার ছায়া ভেসে গেল। তারপর বল্ল, "দাতুর জীবনের একটি মস্তো বড় স্বপ্ন হোলো আমার দিদিশাশুড়ি অর্থাৎ যশোদার বাড়ির কোনো একটি মেয়ের সঙ্গে একদিন না একদিন নিজের বাড়ির একটি ছেলের বিয়ে দেওয়া। বেশ মজার স্বপ্ন, না? যশোদাকে নিজের জীবনে পাননি বলেই হয়তো। মেজমামার বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলেন নির্মলার সঙ্গে, ছোটোমামার বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলেন কুন্তলার সঙ্গে, কোনোটাই পেরে উঠলেন না।—অনেক বছর পর হঠাৎ একদিন মনে হোলো তাইতো, লাতুরী আর শঙ্খকুমার একসঙ্গে খেলাধূলা করতো, দু'জন দু'জনকে চেনে, দু'জন দু'জনকে বেশ পছন্দ করে। দু'জনের কাজের ক্ষেত্রেও একটু মিল আছে। শঙ্খ ডিসপেনসারির ম্যানেজিং কমিটির সেক্রেটারী ও মেডিকেল অফিসার, লাতুরী গ্রামের অধিবাসীদের নির্বাচিত সদস্য। শঙ্খ গোপাল

সেন গার্লস্ স্কুলের সেক্রেটারী, লাতুরী স্কুলের এসিষ্ট্যাণ্ট হেডমিস্ট্রেস। লাতুরীর কিষাণদের মধ্যে খুব প্রতিপত্তি। শম্ভুও আগামী নির্বাচনে পল্লী কেন্দ্র থেকে দাঁড়াবার মতলবে আছে।—তখন দাদু একদিন কথা প্লাড়লেন আমাদের কাছে। আমরা সানন্দে রাজি হয়ে গেলাম। এখন মাস খানেকের মধ্যে একটা দিন দেখে বিয়েটা দিয়ে দিলেই হয়।"

"বাবার মুখ থেকে বাড়ির কোনো কথাই কোনোদিন শুনিনি," শ্যামল আস্তে আস্তে বল্ল। তাই জানতুমও না যে আমার কে কে আছেন এবং কোথায় আছেন। যেটুকু শুনেছি পরে পরে মায়ের মুখেই শুনেছি।"

হাসি দি কিছু বল্ল না।

"আচ্ছা, দাতুর বাবার কি হলো শেষটায় বল্লে না?" জিজ্ঞেস করলো শ্যামল।

"দাতুর বাবা? কেন, জানিস না বুঝি? বিচারে ওঁর ফাঁসির হুকুম হয়। ১৯৩২এর ১২ই জানুয়ারী তো সূর্য সেন ও তারকেশ্বর দস্তিদারের ফাঁসি হয়, তার ঠিক দশদিন পর ২২শে জানুয়ারী ফাঁসি হয় বিলাস চৌধুরীর।"

"দাতু ওর বাপকে কোনোদিন দেখেনি, না?"

"না," বল্ল হাসি দি। কি যেন একটুখানি ভাবলো। তারপর হঠাৎ বল্ল, "আচ্ছা শ্যামল—" বলেই থেমে গেল। বল্ল, "না, থাক, আরেকদিন বলবো।"

"কি শুনিনা?"

"না। আজ সবে প্রথম এসেছিস, চট করে এত কথার মধ্যে গিয়ে কাজ নেই। ভাবছি মেজমামী, অর্থাৎ তোর মা'কে একটা চিঠি লিখবো। অনেকদিন ও'র কোনো চিঠি পাইনি। ভালো কথা, বিকেলে

ক'টায় চা খাস তুই? সময় তো হয়েছে দেখছি। চা করে এনে দোবো?"

"ওরা আসুক না, তারপর খাবো," শ্যামল বল্ল।

"ওরা আবার কারা?"

"কেন, লাতুরী আর কল্যাণ।"

"ওদের কোনো ঠিক ঠিকানা নেই। ওদের কথা ভাবছিস কেন? চল, রান্নাঘরে গিয়ে বসি। তো'তে আমাতে মিলে বেশ জমিয়ে চা' খাওয়া যাবে'খন।—সন্ধ্যের পর তোতে আমাতে মিলে দাদুর সঙ্গে দেখা করতে যাওয়া যাবে, কেমন?

(তিন)

তখনো সন্ধ্যে হয়নি।

দু'তলার বারান্দায় ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে শ্যামল বসেছিলো চুপচাপ। উঠোনের ওধারে বড়ো জারুল গাছটির ডালে ডালে ফিরে-আসা পাখীদের মুখর কলরবে দক্ষিণের হাওয়া তখন বিপর্যস্ত হয়ে উঠেছে। বেলা শেষের আলো তখনো তার মমতা কাটাতে পারে নি, তখনো ওপাশে ঠাকুর ঘরের চালে এলিয়ে পড়ে আছে। ঠাকুর ঘরের পেছন দিক থেকে শোনা যাচ্ছে ঢেঁকিতে পাড় দেওয়ার ধুপ থাপ শব্দ। শ্যামল চোখ নামিয়ে তাকালো সেদিকে। ঢেঁকিশালের ওপাশে গোয়াল ঘর। ধবল গাইটি তখনো বাইরের খুঁটিতে বাঁধা। দেখলো, গরুর দুধ দুইছে দাতু। আরেকটি খুঁটিতে বাঁধা বাছুরটি ডাক জুড়ে দিয়েছে প্রাণপণে।

দুধ দোয়া শেষ হতে ঝকঝকে পিতলের ছোটো কলসিটি তুলে নিয়ে দাতু ঘুরে দাঁড়ালো। চোখ তুলে তাকালো উপরে বারান্দার দিকে। শ্যামল তার দিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে আছে দেখে চোখ নামিয়ে চলে গেল। কিন্তু ঈষৎ স্ফুরিত হাসিটি লুকিয়ে যেতে পারলো না শ্যামলের কাছে।

"শ্যামল!"

শ্যামল মুখ ফিরিয়ে দেখলো সিঁড়ি বেয়ে হাসি দি' উঠে আসছে।

এসে বল্ল, "শ্যামল, আমার তো যাওয়া হোলো না দাতুর ওখানে,

জুনোর একটু গা' গরম হয়েছে। কাঁদছে খুব। আমায় ছেড়ে থাকছে না কিছুতেই।"

জুনো হাসি দি'র ছেলে। বছর তিন বয়েস।

"জ্বর হয়েছে বুঝি? হঠাৎ? এই তো দুপুরে দেখছিলুম ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে," শ্যামল বল্ল।

"জ্বর ফর নয়। এই একটু সর্দি হয়েছে," বল্ল হাসিদি।

"তা হলে আজ থাক। কাল পরশু একদিন যাওয়া যাবে দাদুর ওখানে।"

"সে কি করে হয়? আমি যে দাদুর কাছে খবর পাঠিয়েছি। উনি বসে থাকবেন তোর জন্যে।"

"যাবো কার সঙ্গে?"

"সে ব্যবস্থা করেছি। লাতুরী এসে পড়বে এক্ষুনি। সেই তোকে নিয়ে যাবে।"

"সন্ধ্যের পর ওর বেরুনো কি ঠিক হবে", শ্যামল জিজ্ঞেস করলো।

হাসি দি হাসলো। বল্ল, "কেন?"

শ্যামল একটু আমতা আমতা করে বল্ল, "না, মানে, আমি একেবারে নতুন। অনাত্মীয় ছেলে। গাঁয়ের কে দেখে কি বলবে। আজ থাক না। কাল সকালে কল্যাণকে নিয়ে যাবো।"

"তোর লজ্জা করছে বুঝি লাতুরীর সঙ্গে একলা যেতে," হাসিদি একগাল হেসে জিজ্ঞেস করলো।

কান দুটো লাল হয়ে গেল শ্যামলের। বল্ল, "না হাসিদি, ওকে আমি লজ্জা করতে যাবো কেন। তা' নয়। যদি কেউ কিছু বলে—"

"কেউ কিছু বলবে না," হাসি দি একটু গম্ভীর হয়ে বল্ল, "লাতুরীকে নিয়ে কেউ কিছু বলার কথা ভাবতেও পারে না।"

"কেন ?"

"লাতুরীকে সবাই ভালোবাসে," বল্ল হাসি দি। তারপর বল্ল, "কিন্তু তোর মনে হঠাৎ এসব ভাবনা এলো কেন? তোরা শহুরে ছেলে, তোদের তো এরকম কোনো সঙ্কোচ থাকবার কথা নয়!"

"মা বলে দিয়েছেন", শ্যামল বল্ল, "গাঁয়ের সমাজ একটু অন্যরকম, তাই একটু সজাগ হয়ে চলতে।"

"গাঁয়ের সমাজ বলতে উনি যা বোঝেন," হাসি দি আস্তে আস্তে বল্ল, "তা'র আর আগের বিষ নেইরে। গাঁয়ের চাষাভূষো শ্রেণীর লোকেরা যাকে ভালোবাসে তার নামে কোনো কথা বলতে হলে চণ্ডী মণ্ডপের বুড়োদের আগে দশবার ভাবতে হয়।"

"গাঁয়ের চাষাভূষোরা লাতুরীকে খুব ভালোবাসে বুঝি ?"

হাসি দি হাসলো একটু। উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন হোলো না।

"কেন ?" শ্যামল জিজ্ঞেস করলো।

"দু'চারদিন থাক নিজেই বুঝতে পারবি," বল্ল হাসি দি।

লাতুরী ফিরলো মিনিট পনেরোর মধ্যে।

"সারাদিন দেখা নেই, কী ব্যাপার ?" শ্যামল জিজ্ঞেস করলো।

"কয়েকদিন ছিলাম না, তাই কয়েকটি ব্যাপারে একটু গণ্ডগোল পাকিয়ে উঠেছে। তাই নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম," লাতুরী আঁচল দিয়ে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বল্ল, "চলুন বেরিয়ে পড়ি।"

* * * * *

ভটচাজ পাড়ার পেছন দিকে বাড়িগুলোর বেড়া ঘেঁষে ঘেঁষে, চৌধুরীদের পুকুরের পাড়ের উপর দিয়ে, ঘোষদের আমবাগানের পাশ দিয়ে আঁকাবাঁকা পথ। কোথাও সরু, কোথাও বেশ চওড়া। দু'জন পাশাপাশি চলা যায় স্বচ্ছন্দে।

শ্যামল জিজ্ঞেস করলো, "দাদু এ গাঁয়ের লোকের জন্যে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় করে দিয়েছেন না ?"

"হ্যাঁ, তবে শুধু এ গাঁয়ের লোকের জন্যেই নয়। আশে পাশের গাঁ থেকেও লোকজন আসে। বেশ নাম আছে ডিসপেনসারির," লাতুরী উত্তর দিলো।

"বড়ো জ্যাঠামশাইর ছেলেই তো দেখা শোনা করেন, তাই না ?"

"কে শঙ্খ দা ? হ্যাঁ, উনিই দেখাশোনা করেন। উনি ওখানকার ডাক্তার। তা' ছাড়া উনি ডিসপেনসারি কমিটির সেক্রেটারীও।"

"ডিসপেনসারির একটা কমিটি আছে বুঝি ?

"হ্যাঁ, সেটি যে পল্লী উন্নয়ন সমিতির সম্পত্তি। দাদু সমিতিটা গড়ে তার হাতে ছেড়ে দিয়েছেন এই ডিসপেনসারি।"

"তুমিও তো একজন কমিটি মেম্বার।"

লাতুরী ঘাড় নাড়লো।

"এই একটা ডিসপেনসারির কমিটি মেম্বার হয়েই তোমার নাওয়া খাওয়ার সময় নেই ?"

"ডিসপেনসারির জন্যে ঠিক নয়। সমিতিকে নিয়ে একটা গোলমাল বেধেছে। তাই ইদানিং একটু ব্যস্ত আছি।"

"ও, ব্যাপারটা তাহলে ক্লাব পলিটিক্স্ ?"

"ক্লাব পলিটিক্স্ হলে ভাবনা ছিলো না। এ অনেক বেশী গুরুতর ব্যাপার," লাতুরী বল্ল।

"কি রকম ?"

"প্রথমতঃ ওষুধ পত্তর কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না।"

"হ্যাঁ, এই যুদ্ধের বাজারে ভালো ওষুধপত্তরের অভাব হয়েছে বটে" শ্যামল বল্ল।

"ঠিক সেই জন্যে নয়," লাতুরী বল্ল, "আমাদের ষ্টকে অনেক ওষুধ পত্তর ছিলো, এমিটিন, কুইনিন, কোরামিন, গ্লুকোজ, ক্যালসিয়াম ইত্যাদি প্রায় এক বছরের সঞ্চয় মজুদ ছিলো। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে তার অনেকখানি উধাও হয়ে গেছে। হিসেব পত্তরে দেখা যাচ্ছে যে অতো ওষুধ খরচা হয়নি। বহু চেষ্টা করেও বুঝতে পারা গেল না ষ্টক থেকে মাল উধাও হোলো কি করে। কয়েকজনকে সন্দেহ করা হোলো যদিও, তাদের ঠিক মতো ধরবার কোনো রাস্তা পাওয়া গেল না। তখন বহু চেষ্টা করে আর কিছু মাল আনানো হোলো। আর কতকগুলো নতুন নিয়ম কানুন করে দেওয়া হোলো যাতে প্রত্যেকদিনই ষ্টকের হিসাব নেওয়া যায় আর বেহিসেবী খরচা না হয়। দু'জন খুব বিশ্বাসী দারোয়ান রাখা হোলো। আজ এসে শুনি আবার গণ্ডগোল সুরু হয়েছে। শম্ভু দা' কাকে কয়েকটি গ্লুকোজ ইনজেকশান দিয়েছিলেন। তাতে কোনো ফল পাওয়া যায়নি। এরকম অভিযোগ চারদিক থেকেই পাওয়া যাচ্ছিলো সম্প্রতি। এ রোগীটির বাড়ির লোকের সন্দেহ হোলো। ওরা একটি ইন্‌জেকশানের এমপুল সহরের হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়। সেখান থেকে রিপোর্ট আসে যে ওষুধটা জাল। তখন ডিসপেন্‌সারির ষ্টকের ওষুধগুলো সব যাচাই করে দেখা গেল ষ্টকে যা আছে সবই হয় জাল, নয় ভেজাল। শুনে তো আমাদের চক্ষু স্থির। আমরা মাল আনিয়েছি সোজা ম্যানুফ্যাকচারারের কাছ থেকে। ওরা তো কোনোদিনই ভেজাল জিনিষ দেবে না। বেশ বোঝা গেল যে নিশ্চয়ই কেউ আবার ষ্টক থেকে মাল সরিয়েছে, এবং এবার জাল জিনিষ দিয়ে ষ্টকটা মিলিয়ে দিয়েছে। শুধু তাই নয়, আসে পাশে ছোটো বড়ো প্রত্যেকটা গ্রাম থেকেই খবর আসছে যে বেসরকারী হাসপাতাল ডিসপেন্‌সারি সব জাল ওষুধে ছেয়ে গেছে।"

"ভেতরের লোক কেউ আছে নিশ্চয়ই," শ্যামল বল্ল।

"তাতো আছেই। কিন্তু কে সে কিছুতেই জানতে পারছি না।"

"সন্দেহ হয়না কাউকে ?"

একটু চুপ করে থেকে লাতুরী বল্ল, "হয়, তবে ঠিকমতো প্রমাণ না পেলে তো মুখ ফুটে কিছু বলবার উপায় নেই—"।

"সন্দেহ হয় কার উপর ?"

লাতুরী একটু ভাবলো, তারপর বল্ল, "এখন কাউকে বলবেন না যেন। পল্লী উন্নয়ন সমিতির প্রেসিডেণ্ট প্রসাদ চৌধুরী,—কে জানেন ? দাতুর কাকা, সেই বিপ্লবী বিলাসী চৌধুরীর ভাই—সে এই যুদ্ধের বাজারে মিলিটারী কনট্রাক্টএ বহু টাকা কামিয়েছে। সন্দেহ হচ্ছে তার উপর, কিন্তু কোনো প্রমাণ নেই। যাই হোক, আমি আজ দুজন লোক লাগিয়েছি ওর উপর নজর রাখতে। জানেন, লোকটা ভারী বদ। দেশে তেল নুন চিনির দর খুব বেড়ে গেছে। তেলে ভেজাল, চিনি তো পাওয়াই যাচ্ছে না ঠিক মতো। এসবের পাইকারী ব্যবসা করে এই লোকটি। সবারই ধারণা ও একটি ব্ল্যাক মার্কেটিয়ার। ও জমিদারী করেছে অনেক। কিন্তু চাষারা আজ আর ঘরে ধান তুলতে পারছে না। গত বছর দুর্ভিক্ষের সময় প্রসাদ চৌধুরী তাদের প্রত্যেক দিন একবেলা এক খুরি খিচুড়ি খাইয়েছিলো। তারপর টাকা দাদন দিয়েছিলো সে আর আরো দু'চারজন। এবার ফসল হতে তার বেশীর ভাগ সুদ আর আসলের কিস্তি বাবদ তুলে নিয়ে গেছে। এখন বাজারে চালের ঘাটতি হয়েছে। গোলার ধান ও ফুরিয়ে এসেছে প্রত্যেক বাড়িতে। কনট্রোলের চাল ঠিক মতো ধরা যাচ্ছে না। অথচ চোরা বাজারে চাল পেতে কোনো অসুবিধে নেই। আর চোরা বাজারের কথা উঠলে লোকে আড় চোখে

প্রসাদ চৌধুরীর দিকে তাকায়। কিন্তু মুখে কিছু বলতে সাহস পায় না।

দাদুর নামে একটা স্কুল আছে। সেখানে প্রাইমারী ক্লাসগুলো ফ্রী ছিলো। এখন দেশের অর্থনৈতিক দুরবস্থার নাম করে সে সব ক্লাসেও মাইনে নেওয়ার নিয়ম করা হয়েছে। করেছে প্রসাদ চৌধুরী। স্কুলটাও চালায় পল্লী উন্নয়ন সমিতি। প্রসাদ চৌধুরীর লোক স্কুল কমিটির চেয়ারম্যান। সে নিজে সেক্রেটারী। মাষ্টারদের মাইনে দেওয়া হচ্ছে না ঠিকমতো। যা'ও বা দেওয়া হচ্ছে সেটা খাতাপত্তরে সই করে নেওয়া মাইনে থেকে অনেক কম, অথচ আমরা জানি স্কুলের আয় বেড়েছে। কারণ সহর থেকে অনেক পরিবার যুদ্ধের হিড়িকে গাঁয়ে চলে এসেছে। তাদের ছেলেমেয়েরা অনেকেই এখানেই পড়ে কাজে কাজেই ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা বেড়ে গেছে অনেক। তা' ছাড়া দাদু স্কুলে অনেক কোম্পানির কাগজ দিয়েছেন। সেগুলোর একটা বাঁধা আয় আছে। তবু দেখি হিসেব পত্তরে টাকার ঘাটতি। বুঝি সবই, কিন্তু হাতে নাতে ধরবার উপায় নেই।"

"তুমি, শঙ্খদা, তোমরা কি করছো, শঙ্খদাও তো স্কুল কমিটির মেম্বার।"

"শঙ্খদার কথা বলবেন না," লাতুরী বল্ল, "ও বড় বেশী ভালো মানুষ। ও কারো কথার উপর কথা বলতে পারে না। বিশেষ করে গুরুজনদের। সে বলে দু'দিন বাদে সব ঠিক হয়ে যাবে। এখন একটু অস্বাভাবিক সময় পড়েছে। তাই এসব গণ্ডগোল। তা' না হয় বুঝলাম। কিন্তু তাই বলে যে এসব সহ্য করতে হবে সে কথা কে বলেছে। এটা কিছুতেই শঙ্খদা'কে বোঝাতে পারি না। ও কোনো গণ্ডগোলের মধ্যে থাকতে চায় না। না চায় না চা'ক,

যাক গে চুলোয়, কিন্তু আমরা তো সইতেও পারছি না, চুপ করে থাকতেও পারছি না। কিন্তু কিছু করতেও পারছি না।"

"প্রসাদ চৌধুরীকে সরিয়ে দেওয়া যায় না?"

"চেষ্টা যে করছি না তা' নয়, কিন্তু সবাই ওর হাতের লোক। হয় কিনে রেখেছে নয় দাবড়ে রেখেছে। সবাই সব কিছু জানে কিন্তু মুখ ফুটে বলবার সাহস নেই। যতক্ষণ ওকে একস্‌পোজ করা না যাচ্ছে, ততক্ষণ কিছুই করবার উপায় নেই।"

শ্যামল হাসলো। বল্ল, "একস্‌পোজ কি ভাবে করবে?"

"সেটা একটা মস্তো সমস্যা। যতোক্ষণ হাতে নাতে ধরতে না পারছি—।"

"ওর পেছনে ঘুরে ঘুরে তো আর ওকে ধরতে পারবে না।" শ্যামল বল্ল।

"তা' হলে?"

"ওকে ফাঁদে ফেলতে হবে।" শ্যামল আস্তে আস্তে বল্ল।

"ফাঁদে?" লাতুরী তাকালো শ্যামলের দিকে। "কি রকম ফাঁদ?"

"চুরীর ফাঁদ, জোচ্চুরীর ফাঁদ, ব্ল্যাকমার্কেটিং এর ফাঁদ। যা কিছুতে ওর লোভ সে সব কিছুর ফাঁদ—।"

লাতুরী তাকিয়ে রইলো শ্যামলের দিকে। মনে হোলো কি যেন ভাবছে।

"মানুষ যখন জ্যান্ত বাঘ ধরতে চায়, কি করে বলো তো? তার পেছু ধাওয়া করে তাকে ধরে? সে ভাবে হয় না লাতুরী। জ্যান্ত বাঘ ধরতে হলে বাচ্চা ছাগলের টোপ দিয়ে ফাঁদ পাততে হয়।"

লাতুরীর সরু ঠোঁট আস্তে আস্তে বেঁকে গেল একটুখানি হাসিতে।

(চার)

তক্তপোষের উপর বসে মহাভারত পড়ছিলেন বুড়ো গোপাল সেন। কিন্তু মন পড়ে ছিলো বাইরের দিকে। একবার দেওয়াল ঘড়ির দিকে তাকালেন।

সাতটা প্রায় বাজে। বাইরে অন্ধকার হয়ে এসেছে।

তক্তপোষ থেকে নেমে পায়চারী করতে সুরু করলেন।

পায়চারী করতে করতে থেমে পড়লেন হঠাৎ। শুনলেন কান পেতে।

দীর্ঘ উঠান পেরিয়ে বাড়ির দিকে এগিয়ে আসছে দু'জোড়া পায়ের আওয়াজ।

তাড়াতাড়ি উঠে পড়লেন তক্তপোষের উপর। মহাভারতটি খুলে আবার পড়তে সুরু করলেন।

পায়ের আওয়াজ ঠাকুর ঘরের সামনে এসে থামলো।

কানে এলো একটি মৃদু গলায় প্রশ্ন, "এই আমাদের সাবেক বাড়ি?"

হঠাৎ একটু কেঁপে উঠলেন গোপাল সেন। প্রিয়গোপাল?

না।

চিনতে পারলেন। হাসি খবর পাঠিয়েছিলো আগেই।

ব্যাটাচ্ছেলে ঠিক বাপের গলা পেয়েছে, ভাবলেন মনে মনে।

"এত জঙ্গল কেন?"

মেয়েলি গলায় উত্তর এলো, "বেশ সুন্দর বাগান ছিলো এককালে।

ছেলেবেলায় ফুল তুলতে আসতাম এখানে। এখন আর কেউ যত্ন নেয় না। বাড়ির লোকজনের সংখ্যাও কমে গেছে। কারো তেমন কিছু মায়া নেই বাড়ির উপর।"

পায়ের আওয়াজ বাড়ির ভিতর উঠে এলো।

হঠাৎ ঝাপসা হয়ে এলো বুড়োর চোখ দুটো। মহাভারত থেকে চোখ তুলতে পারলেন না এক মুহূর্ত। তারপর সামলে নিয়ে চশমা খুলে জিজ্ঞেস করলেন, "কে ?"

"আমি," লাতুরী হাসি মুখে বল্ল, "কাকে নিয়ে এসেছি দেখুন।"

শ্যামল এসে প্রণাম করলো। বল্ল, "আমি শ্যামল।"

প্রথমটা গোপাল সেনের গলা ঠেলে কোনো কথা বেরুতে চাইলো না। কে যেন ছিপি এঁটে দিয়েছে গলায়। তারপর কথা যখন বেরুলো বেশ সহজ ভাবেই বেরুলো।

"হতভাগা, এদ্দিনে বুড়ো দাদুকে মনে পড়লো ? আয়, এখানে এসে বোস। না, না, এদিকে, হ্যাঁ, আলোর দিকে মুখ ফিরিয়ে বোস। তোর মুখটা দেখি।—ওরে লাতুরী দি, ভেতরে গিয়ে বড় বৌকে বলগে যা তার আরেকটি ছেলে এসেছে।"

লাতুরী চলে গেল বাড়ির ভিতর।

"তোর মা কি রকম আছে ?"

"ভালো।"

"আমি মেজবৌমার চিঠি পেয়েছি আজ সকালে। তুই তো গতবার এম-এ পাশ করেছিস, না ?"

"হ্যাঁ।"

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

"তোর মায়ের শরীর তাহলে ভালোই আছে !"

"হ্যাঁ।"

"তোর মাকে নিয়ে এলি না কেন?"

"মা আর কলকাতার বাড়ি ছেড়ে কোথাও যেতে চান না।"

"ও।"

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ।

"তোর মা তা'হলে ভালোই আছে।"

"হ্যাঁ।"

"তুই?"

"ভালো।"

আবার চুপচাপ কিছুক্ষণ। একটা প্রশ্ন গলা ঠেলে বেরুতে চাইলো না কিছুতেই। তাকালেন দেওয়ালের দিকে। সেখানে একটি বহু পুরোনো, ক্যাকাশে ছবি। ছবিটি সেকালের নিকারবোকার পরা একটি বাচ্চা ছেলের।

শ্যামলও তাকালো সেদিকে। জানলো না সেটি তার বাবার ছবি।

একটু ঘাড় চুলকোলেন গোপাল সেন।

"তোর মা—ও হ্যাঁ, তুই তো বলেছিস। চল এবার, বাড়ির ভিতর যাই।"

শ্যামল একটু অসোয়াস্তি বোধ করলো। মনে মনে কিরকম যেন একটা প্রত্যাশা ছিলো সে আসতেই বাড়ি জুড়ে সোরগোল সুরু হবে, লোকজন ছুটে আসবে তাকে দেখতে। কিন্তু কোথায় লোকজন? ফাঁকা বাড়ি থমথম করছে।

চলল বুড়ো গোপাল সেনের পেছন পেছন। নীচু দরজা পেরিয়ে সরু বারান্দা অতিক্রম করে ঢুকলো এসে আরেকটি প্রশস্ত কক্ষে। খাট আর আলমারীতে ঠাসাঠাসি। ছোটা ছোটো জানালা দুটোর ওপারে দূর বাঁশবনে জোনাকি ঝিলমিল করছে।

"ইনি তোর জ্যাঠাইমা।"

একটি রূপোর থালায় ধান দূর্বা, গিনি আর টাকা ইত্যাদি দিয়ে শ্যামলের মুখ দেখলেন জ্যাঠাইমা। ওপাশের দরজার আড়ালে হুলুধ্বনি শোনা গেল। চোখ ফিরিয়ে শ্যামল দেখলো। সাড়ি আর ঘোমটার আভাস আধ ময়লা পর্দার আড়ালে। চোখ ফিরিয়ে নিলো সে। আশেপাশের বাড়ি থেকে ডেকে আনা জ্ঞাতি খুড়ি পিসী হবে হয়তো। আমায় দেখে এত লজ্জা কিসের? আমার সামনে না বেরুনোর কি আছে, শ্যামল অবাক হয়ে ভাবলো।

"এদ্দিনে এলে বাবা? কত বছর ধরে দিন গুণছি—তোমরা সবাই আসবে। তোমরা বড়লোক। আমাদের কথা তোমাদের মনেও পড়ে না," টেনে টেনে বল্লেন শ্যামলের জ্যাঠাইমা। শ্যামলের ভালো লাগলো না এঁর কথা বলার ঢং। একটু বিব্রত বোধ করলো। তার উত্তরের অপেক্ষা না করেই জ্যাঠাইমা হাঁক ছাড়লেন পর্দার ওধারের কোনো অবগুণ্ঠনবতীর উদ্দেশে, "ওরে, ও পোতলী, শুনে যা। আয় না, এর সামনে আসতে লজ্জা কিসের, তোর ভাইপো হয়রে সম্পর্কে। এই টাকাটা আর গিনিটা নিয়ে শম্ভুকে দে, বলগে, কাজ হয়ে গেছে, বাক্সে তুলে রাখতে—।"

"গিনিটা দেখি," গোপাল সেনের গম্ভীর কণ্ঠস্বর শ্রুত হোলো।

"কেন," জিজ্ঞেস করলেন তাঁর পুত্রবধূ।

প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে থালা থেকে গিনিটা তুলে নিলেন গোপাল সেন। গুঁজে দিলেন শ্যামলের হাতে, বল্লেন "এটা তোর জন্যেই কিনে রাখা হয়েছিলো। তুই নিয়ে যা।"

কালো হয়ে গেল গোপাল সেনের জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূর মুখ।

শ্যামল বল্ল, "আমি এটি নিয়ে কি করবো। এটা বরং আপনার কাছেই রেখে দিন জ্যাঠাইমা—"

"ওটি অত তুচ্ছ জ্ঞান করলে দরিয়ার জলে ফেলে দিস," গলা কেঁপে গেল গোপাল সেনের, "কিন্তু ফিরিয়ে দিয়ে আমায় অপমান করিসনে।"

"অপমান?" শ্যামল থ' হয়ে গেল।

লাতুরী তাড়াতাড়ি বল্ল, "না, দাদু, ও ফিরিয়ে দিতে যাবে কেন, ও কি বলতে চেয়েছে আপনি বোঝেন নি। ওর কাছে কোনো জিনিষ থাকে না, সবই হারিয়ে যায়, তাই ওঁর কাছে আপাততঃ রেখে দিতে চেয়েছিলো। যাকগে ওসব কথা, ওটা আমায় দিন শ্যামলদা, আমার কাছ থেকে হারাবে না।"

শ্যামলের হাত থেকে গিনিটি নিয়ে আঁচলের খুঁটে বাঁধলো।

বাড়ির বড় বৌ নিজেকে সামলে নিয়েছেন এতক্ষণে। মুখে মিষ্টি হাসি টেনে বল্লেন, "ফিরিয়ে দেবে কেন বাবা, তোমার জিনিষ তো তুমিই নেবে। শুধু ওই গিনি কেন, এ বাড়িটিই তো তোমার বাবা। তোমার আশায় আশায় এদ্দিন আমরা সবাই আগলে রেখেছি। তোমাদের জিনিষ তোমরা বুঝে শুনে নিলে আমরা একটু সোয়াস্তিতে চোখ বুজি। একটু বোসো বাবা, পায়েস করে রেখেছি তোমার জন্যে, নিয়ে আসি—"

"ওসব পায়েস টায়েস আবার করতে গেলেন কেন জ্যাঠাইমা—"

"ও। এ বাড়ির জল তুমি খাবে না বুঝি," তিনি ফিরে দাঁড়িয়ে বল্লেন।

অপ্রস্তুত হয়ে গেল শ্যামল। "না, না, সে কথাতো বলিনি—"

"উনি আজ ভাত খেয়েছেন অনেক বেলায়," লাতুরী বল্ল, "তাই হয়তো এখন কিছু খেতে চাইছেন না—।"

"ও। তা, একটুখানি খেলে কিছু হবে না," জ্যাঠাইমা বল্লেন। তারপর লাতুরীর দিকে তাকিয়ে তাঁর মধুরতম ধারালো হাসিটি হেসে

বল্লেন, "শ্যামলের সঙ্গে তোর অনেক আগে থেকেই জানাশোনা আছে বুঝি ?"

লাতুরীর মতো মেয়ের মুখও একটু লাল হোলো। "না, আজই প্রথম দেখলাম এঁকে।"

"ও।" তারপর শ্যামলের দিকে ফিরে বল্লেন, "কি বলবো বাবা, এটা তোমার বাড়ি, কোথায় তুমি এখানে এসে ঘর আলো করে বসবে, তোমায় নিজের হাতে রেঁধে বেড়ে দুটো খাওয়াবো, তা'নয় ভর সন্ধ্যেবেলা তুমি এলে কুটুমবাড়ির অতিথির মতো, আমি তোমায় পায়েস খেতে বলছি ভয়ে ভয়ে, আর তুমি লৌকিকতা করছো আমার সঙ্গে। তোমায়তো অন্ততঃ মাছের ঝোল ভাত দুটো না খাইয়ে ছাড়বার কথা নয়, কিন্তু শুনেছি তোমরা এবাড়ির অন্ন গ্রহণ করবে না—"

"বৌ মা!" গোপাল সেনের কণ্ঠস্বর গম্ভীরতর হোলো।

"কি বলছেন জ্যাঠাইমা। আপনাকে কে বল্লে এসব কথা ? কবে খেতে আসবো বলুন—" শ্যামল বল্ল।

জ্যাঠাইমা লাতুরীর দিকে ফিরে বল্লেন, "ও কবে খাবে এখানে এসে, তার একটা দিন ঠিক করে দে—"

"আমায় কেন বলছেন মাসীমা," লাতুরী গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞেস করলো।

"আমি তো একা রেঁধে বেড়ে পেরে উঠবো না মা, তোমায় এসে একটু সাহায্য করতে হবে," বলে একটু হাসলেন বড় বৌ।

লাতুরীর মুখে কোনো কথা এলো না।

"তোরা বোস, আমি আসছি এক্ষুনি। চা খাবি তো—"

খাবো না বলার সাহস হোলো না শ্যামলের।

গোপাল সেন জানালার কাছে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

"গিনিটা—"চাপা গলায় শ্যামল বলতে সুরু করলো।

"আপাতত: একটু চুপ করে থাকুন তো," লাতুরী বল্ল। "বেশী কথার মধ্যে যাবেন না। এ সব পারিবারিক রাজনীতি বুঝতে আপনার একটু সময় নেবে।"

বড় বৌ বেরিয়ে গিয়ে সিঁড়ি দিয়ে তরতর করে উঠে গেলেন দু'তলায়।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুলে বুরুশ চালাচ্ছিলো একজন। বয়েস শ্যামলের থেকে সামান্য বেশী। নীচু কপাল, ময়লা রঙ, ছোটো চোখের ধারালো দৃষ্টিতে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির ছাপ সুস্পষ্ট।

"আমি আর পারি না। বাবা আমায় সবার সামনে যেভাবে অপমান করলেন—"

"কি হলো আবার," ছেলেটি মুখ না ফিরিয়ে উত্তর দিলো।

"আমাদের একটি গিনি মেজোবাবুর ছেলেকে দিয়ে দিয়েছেন," বল্লেন বড় বৌ।

"তাতে তোমার অপমানের কি আছে মা?"

"আমি ওটা নিয়ে চলে আসছিলাম। বাবা আমার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে ওর হাতে গুঁজে দিলেন।"

"ওর জিনিষ ওকে দিয়েছে, তাতে তোমার রাগ করার কি আছে?"

"কে বল্লে ওর জিনিষ। ওটা বাড়ির জিনিষ—," ফুঁশিয়ে উঠলেন বড় বৌ।

"একই কথা। বাড়িটি আমাদের একলার নয়, ওর ও তো বটে!"

"কেমন ওর বাড়ি একবার মুখ ফুটে বলুক তো। দেখি কি করে বাড়ির দখল নেয়?" দাঁতে দাঁত ঘষলেন বড় বৌ।

ছেলেটি হাসলো। "সে তো পরের কথা। আপাতত: গিনি হাতে

নিয়ে যদি বেশী উচ্চবাক্য না করে তো একটা গিনি না হয় গেলই—।"

"তোকে কে বল্লে ও মুখ বন্ধ করে চলে যাবে। এদ্দিনপর এসেছে, সে কি শুধু আমাদের মুখ না দেখে ওর ঘুম হচ্ছে না বলে? ওর নিশ্চয়ই কোনো উদ্দেশ্য আছে। ও এসেছে সম্পত্তির ভাগ নিতে," বড় বৌ বল্লেন।

"যদি পায় তো নিক—।"

"নেবে কিরকম" ক্ষেপে উঠলেন বড় বৌ।

"তুমি কিচ্ছু বোঝো না মা। আমি তো বলছি যদি পায় তো নিক—"

এতক্ষণে হাসি ফুটলো বড় বৌয়ের মুখে। "হ্যাঁ। তাওতো বটে। যদি পায় তো নিক, মানা করেছে কে—।"

"ওকে অতো কাঁচা ভেবো না মা। ও সবই জানে, সবই বোঝে মেজোকাকা দেমাকী লোক ছিলেন শুনেছি। এও নাকি বাপের দেমাক পেয়েছে। এদ্দিন পর এ যে শুধু সম্পত্তির লোভে এখানে এসেছে সে আমি বিশ্বাস করতে রাজি নই। সবুর করো কয়েকদিন, একটু খোঁজ খবর নিয়ে দেখি কি ব্যাপার। তুমি আর দেরী কোরো না এখানে, ওর সঙ্গে গিয়ে কথাবার্তা বলো গে, আমিও যাচ্ছি, দেখি ভায়া আমার লোকটা কিরকম।"

বড়বৌ উঠে পড়ে বেরিয়ে যেতে যেতে আবার ফিরে এলেন। বল্লেন, "আরেকটা কথা। লাতুরীর সঙ্গে ওর মাখামাখিটা আমার ভালো লাগছে না আজই এসেছে। এরই মধ্যে—"

"মা!"

বড়বৌ থেমে গেলেন।

"লাতুরীকে তো চেনো। ওর মনটা বড্ড সরল। সবার সঙ্গেই ওর ওরকম মাখামাখি।"

"কিন্তু—"

"তোমার মন এত সন্দিগ্ধ কেন মা? লাতুরী আমার ছেলেবেলার বন্ধু। তোমরাই দেখেশুনে আমাদের বিয়ের ঠিক করেছো। জানোই তো সে একটু অন্য ধরণের মেয়ে। তা নইলে বিয়ের ঠিক হওয়ার পর সে কি কখনো এভাবে এ বাড়ি বেড়াতে আসতো, না আমার সামনে বেরুতো? অন্য মেয়ের মাপকাঠিতে ওকে বিচার কোরো না মা।"

"কিন্তু শ্যামলের একটু বেশী টান দেখলাম ওর উপর—।"

"এরই মধ্যে তুমি আবার কি টান দেখলে?"

"ওসব তোরা বুঝবি না বাবা। আমাদের মায়ের চোখ। আমাদের চোখে সবই ধরা পড়ে।"

শঙ্খকুমার হাসলো। মা'কে চিনতো সে। প্রয়োজন হলে তিলকে তাল করার দক্ষতা যে মায়ের ছিলো সে কথা সে খুব ভালো ভাবেই জানতো।

বল্ল, "যাই হোক, কিছু আসে যায় না তা'তে। হয়তো শুনেছে লাতুরী ওর মামার বাড়ির সম্পত্তি পাবে।"

"মামার বাড়ীর কী সম্পত্তি পাবে তা বেশ বোঝা যাচ্ছে। দেখবার লোকের অভাবে ছারখার হয়ে যাচ্ছে সব। কতো বলি একটা দিন ঠিক করে তাড়াতাড়ি বিয়েটা সেরে নে, তা' নয়—"

ক্ষণিক চিন্তার ভারে আধবোজা হয়ে এলো শঙ্খকুমারের চোখ দুটো। তারপর বল্ল, "আচ্ছা, হাসিদি বলছিলো না বাড়িতে কাজ করবার জন্যে একটা ঝি চাই। লাতুরীকে বলো যে কানাই পুতুর মেয়ে কাজ খুঁজছে—।"

"লক্ষী?" বিস্ফারিত হোলো বড় বৌয়ের চোখ, "আমার কাজ চলবে কি করে?"

"আমি আরেকটি জোগাড় করে দেবো'খন। লাতুরীকে বলো যে আমরা লক্ষ্মীকে রাখছি না, আমরা একটি ছোকরা চাকর রাখবো হাসি-দি যদি চায় তো লক্ষ্মীকে রাখতে পারে। তুমি একবার লক্ষ্মীকে এখানে পাঠিয়ে দিয়ো।"

একটু পরে লক্ষ্মী এসে বল্ল, "আমায় ডাকছেন, বড়দা ?"

গোলাম বাড়ির কানাই পুতুর মেয়ে লক্ষ্মী। সোমত্ত বয়েস, কালো রঙের উপর আঁটসাঁট গড়ন।

পানের রসে রাঙা দাঁতগুলো বার করে হাসলো সে।

শঙ্খকুমার ফিরে তাকিয়ে ফিরিয়ে দিলো তার হাসি, বল্ল, "অন্য বাড়ি গিয়ে কাজ করতে হবে কিছুদিন। যা' যা' বলে দেবো, ঠিকমতো করতে পারবি তো ?"

লক্ষ্মী একটা বিলোল কটাক্ষ হানলো।

* * * * *

পায়েসের বাটি শেষ করে সবে মাত্র চায়ে চুমুক দিয়েছে শ্যামল।

শঙ্খকুমার ঘরে এসে ঢুকলো। বেশ হাসি হাসি মুখ।

"এই বুঝি শ্যামল ?"

গোপাল সেন বল্লেন, "শ্যামল, এটি তোমার বড়ো জ্যাঠামশায়ের ছেলে,—"

শ্যামল উঠে দাড়াতেই শঙ্খ বল্ল, "থাক, থাক, আর প্রণাম করতে হবে না। বয়েসে তুমি আমার সামান্য ছোটো, পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করার কোনো মানে হয় না। স্নান সেরে এসে সন্ধ্যা করছিলাম এতক্ষণ, তাই নামতে দেরী হয়ে গেল। মা তোমায় পায়েস খাইয়েছেন তো ? তুমি আসবে বলে সেই সারা দুপুর বসে তৈরী করেছেন।"

"আপনি—," শ্যামল আরম্ভ করলো।

বাধা দিয়ে শঙ্খ বল্ল, "আপনি নয় ভাই, তুমি। তোমার আমার মধ্যে বয়েসের তফাতটা এত কম যে এর মধ্যে আপনি সম্বোধন মোটেই খাপ খায় না।"

শ্যামল হাসলো। বল্ল, "তোমার কথা হাসি দি'র কাছে শুনেছি।"

"কিন্তু তোমার কথা আমি কারো কাছে বিশেষ কিছু শুনিনি," শঙ্খ বল্ল, "সুতরাং তোমার কথা তুমিই বলো।"

গোপাল সেন বল্লেন, "চল লাতুরী, আমরা উপরে গিয়ে বসি। এরা এখানে বসে গল্প করুক।"

লাতুরী উঠে পড়লো।

"আমার কথা কি বলবো বলো—," শ্যামল বল্ল।

"হঠাৎ কি করে পথ ভুলে দেশে এলে, সে কথা দিয়ে সুরু করো।"

দরজার কাছে গিয়ে লাতুরী থমকে দাঁড়ালো শঙ্খের কথার ভঙ্গী শুনে। তারপর গোপাল সেনকে বল্ল, "ওপরে যেতে আর ভালো লাগছে না দাদু। এসো এখানেই বসে গল্প করি সবাই। একটু পরেই তো উঠে পড়বো।"

"আচ্ছা, তোরা বোস তা'হলে। আমি একবার উপর থেকে ঘুরে আসি", বলে বেরিয়ে গেলেন গোপাল সেন।

শঙ্খ একবার লাতুরীর দিকে তাকালো। তারপর চোখ ফিরিয়ে শ্যামলকে জিজ্ঞেস করলো, "তারপর, বলো, হঠাৎ কি করে পথ ভুলে দেশে এলে।"

"পথ ভুলে আসবে কেন শঙ্খদা," লাতুরী বল্ল, "ঠিক পথ চিনেই এসেছে।"

"পথ চিনে কি রকম?" শঙ্খ জিজ্ঞেস করলো।

"দেশের ছেলে দেশে আসবে না তো কি চিরকাল বাইরে বাইরেই কাটাবে নাকি ?"

শঙ্খ একটু হেসে বল্ল, "এতো তোমার কৈফিয়ত। শ্যামলের কাছ থেকে কারণটা শোনা যাক।"

"কানুনগোপাড়া কলেজে একটা প্রফেসারি পেয়েছি", শ্যামল বল্ল।

"প্রফেসারি ? আচ্ছা ! কিন্তু প্রফেসারিতে যোগ দেওয়ার সময় তো সেই জুলাই মাস।"

"আমার যোগ দেওয়ার দিন পরশু," শ্যামল বল্ল।

"গরমের ছুটির মুখেই ? আশ্চর্য তো। কোনো কলেজ গরমের ছুটির পথে নতুন প্রফেসার নেয় একথাতো শুনিনি কখনো।"

"হয়তো একজন অধ্যাপকের খুব জরুরী দরকার কানুনগোপাড়া কলেজে," লাতুরী বল্ল।

শঙ্খ হাসলো। বল্ল, "ছুটির মুখে শুধু ফার্ষ্ট ইয়ার বা থার্ড ইয়ারের জন্যে তেমন কিছু জরুরী দরকার হাওয়াটা অস্বাভাবিক।"

শ্যামল বল্ল, "তুমি ঠিকই বলেছো। ব্যাপারটা কি হোলো জানো ? কলেজ কর্তৃপক্ষের একজন বাবার খুব বন্ধু। ডেকে জানতে চাইলেন, প্রফেসারি করবো কিনা। বেকার হয়ে বসেছিলাম, ভাবলাম করা যাক কয়েকদিন। উনি বল্লেন, বেশ, জুলাই মাসে গিয়ে চাকরীতে যোগ দিও। আমি লেটার অফ এপইণ্টমেণ্ট দিয়ে দিচ্ছি। আমি বল্লাম, এখনই গিয়ে হাজির হলে আপত্তি কি। তিনি বল্লেন, সামনে ছুটি—। আমি বল্লাম, ঠিক আছে, আমি অফিশিয়ালি যোগ দেবো জুলাই মাসে। এখন এমনি গিয়ে একটু দেখে শুনে নি। ছুটিটা ও দেশে কাটানো যাবে। দেশতো দেখিনি কখনো। যদি জায়গাটা ভালো লাগে আর থাকবার কোনো অসুবিধে না হয়, তা'হলে থেকে যাবো, তা নইলে

ফিরে যাবো। তিনি রাজি হলেন। আমি চলে এলাম। এই আর কি।"

"হুঁ," আস্তে আস্তে ঘাড় নাড়লো শঙ্খ। তারপর বল্ল, "কিন্তু আমি ভাবছি, তোমরা সহুরে ছেলে, একটি পাড়াগাঁয়ের কলেজে চাকরী করতে তো অসুবিধেই হবে। তোমার কি আর ভালো লাগবে গাঁয়ে বসে থাকতে ?"

"কেন, বেশ তো লাগছে।"

"একদিনেই ?" জিজ্ঞেস করলো শঙ্খ। "প্রথম দিনটা মন্দ লাগবে না। তারপর দেখবে একঘেয়ে লাগছে।"

"আমার ভালোই লাগছে।"

ঘাড় নাড়লো শঙ্খ। বল্ল, "এখানে বেশীদিন তোমার ভালো লাগবে না। অত্যন্ত অসুবিধে বোধ করবে।"

"কেন ?" লাতুরী জিজ্ঞেস করলো। "ওঁর তো থাকবার কোনো অসুবিধে হবে না।"

"তোমাদের ওখানেই থাকবে বুঝি ?"

"হাসি বৌদির তো তাই ইচ্ছে।"

একটু চুপ করে ভাবলো শঙ্খকুমার। তারপর বল্ল, "ওখানে থাকাটা তোমার ঠিক হবে না। আমাদের এখানে তুমি থাকবে না জানি। সুতরাং তোমার পক্ষে থাকবার সব চেয়ে ভালো জায়গা হোলো কলেজের হষ্টেল।"

শ্যামল একটু হেসে চুপ করে রইলো।

"সে তুমি থাকতে চাইবে না জানি," শঙ্খ বলে চল্ল, "হাসিদির আদর যত্ন ছেড়ে কি আর কলেজের হষ্টেলে থাকা যায় ? কিন্তু দেখ, শ্রীপুর থেকে কানুনগোপাড়া অনেকটা পথ, প্রত্যেকদিন হেঁটে যাওয়া আসা

করাটা তোমার পক্ষে সম্ভব হবে না। বিশেষ করে বর্ষাকালে অত্যন্ত অসুবিধে হবে।"

শ্যামল কোনো উত্তর দিলো না।

"তাছাড়া আরেকটা কথা ভেবে দেখ। হাসি দি'র বাড়িতে দু'দুটো বড়ো বড়ো মেয়ে রয়েছে। লাতুরীর কথা না হয় বাদ দিচ্ছি। কিন্তু দাতুর কথা ভাবতে হবে তো। বেশীদিন যদি ওখানে থাকো, তাহলে দেখা যাবে দাতুর বিয়ে দিতে কুন্তলা মাসীকে অত্যন্ত বেগ পেতে হচ্ছে। এমনিতেই মা পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করেছিলো বলে মেয়ের বিয়ে দেওয়ার সময় দু'চার কথা উঠবে—"

"শঙ্খ দা!" অত্যন্ত তীব্র প্রতিবাদ এলো লাতুরীর কাছে থেকে।

শ্যামল অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে তাকালো শঙ্খের দিকে।

শঙ্খ তাড়াতাড়ি সহজ করে দিতে চাইলো কথাবার্তার বিষয়বস্তু!

"অবশ্যি তুমি যদি কনে খুঁজতে এসে থাকো তো বলো একটা দেখে শুনে দিই আমরা সবাই মিলে। তা'হলে আর কোনো কথাই উঠবে না," বলে টেনে টেনে হাসতে লাগলো শঙ্খ।

শ্যামল আস্তে আস্তে বল্ল, "আপনি যদি কিছুক্ষণ আগে এ রসিকতা করতেন তো আমরা উপভোগ করবার চেষ্টা করতাম। কিন্তু এখন কথাটা অত্যন্ত নোংরা মনে হচ্ছে।"

হাসি বন্ধ হয়ে গেল শঙ্খের। তাকালো শ্যামলের দিকে, তারপর লাতুরীর দিকে। দেখলো লাতুরী মুখ টিপে হাসছে।

গম্ভীর গলায় বল্ল, "কদ্দিন আছো এখানে?"

শ্যামল সহজভাবে বল্ল, "যদি ভালো না লাগে তো দিন দশ পোনেরো। ভালো লাগলে চাকরী করবো বছর খানেক, তারপর যেদিন কোনো ভালো কলেজে চাকরী পাবো সেদিন চলে যাবো।"

"মফস্বল কলেজে চাকরী করতে চাইলে কি কলকাতার ধারে কাছে কোথাও জুটতো না ?"

যে কথাটি শ্যামলের মনে ছটফট করছিলো কিন্তু ভদ্রতার পাঁচিল পেরিয়ে মুখ ঠেলে বেরুতে পারছিলো না কিছুতেই, সে কথা ফশ করে বেরিয়ে গেল লাতুরীর মুখ থেকে।

"তোমার এত মাথাব্যথা কিসের শঙ্খদা ?"

শঙ্খকুমারের মুখ একটু লাল হোলো। কিন্তু সহজ ভাবেই বল্ল, "কিছু না। আমি শুধু বলতে চাইছিলাম যে চাকরী বাকরী করবার জন্যে এই অজ পাড়াগাঁয়ে এসে বসার কোনো মানে হয় না। যুদ্ধের বাজারে চাকরীর অভাব কি। চারদিকে সবাই যখন এত পয়সা কামাচ্ছে তখন সামান্য মাইনের একটা প্রফেসারি করার কোনো মানে হয় ? আমি সাধারণ এল-এম-এফ ডাক্তার। কিন্তু শুধু ইনজেকৃশানটি নেড়ে চেড়েই আমি একজন প্রফেসারের মাইনে পাঁচ ছয় দিনে কামাই।"

শ্যামল তাকিয়ে দেখলো শঙ্খকে। কিছু বল্ল না। কিন্তু ভাবলো, গাঁয়ে বসে আর কতো টাকাই বা কামায় এ লোকটি। অবশ্যি কর্ণফুলীর দক্ষিণের অঞ্চলটাতে বেশ অবস্থাপন্ন মধ্যবিত্ত জমিদার শ্রেণীর বসবাস। তা'হলেও প্রচুর-টাকা-কামানো মেজাজের উত্তাপ এর মধ্যে এলো কোত্থেকে ?

লাতুরী বল্ল, "প্রফেসারি কেউ পয়সার জন্যে করে না শঙ্খদা। শুধু পয়সা কামানোই সবার জীবনের একমাত্র মহৎ উদ্দেশ্য নয়।"

লাতুরীর কথা গায়ে মাখলো না শঙ্খকুমার। বলে চল্ল, "কে যেন বলছিলো, তুমি কবিতা লেখো, না ? লেফ্‌টিষ্ট কবিতা বোধ হয় ? হ্যাঁ, ওসব লেখাই খুব সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে আজকাল। গাঁয়ে বসে অবশ্যি তুমি কিছু কবিতার খোরাক পেতে পারো। তোমাদের লেফ্‌টিষ্ট

কবিতা বেশ লাগে আমার। কমরেড, আকাশের চাঁদের কাস্তেটা পেড়ে আনো, কার পাকা ধানে আজ মই দিতে হবে সে কি জানো,—হেঃ হেঃ হেঃ, কি রকম বানিয়ে ফেল্লাম মুখে মুখে," নিজের রসিকতায় নিজেই হাসতে লাগলো শঙ্খকুমার।

"চলুন, শ্যামলদা, এবার বাড়ী ফেরা যাক," লাতুরী বল্ল।

শ্যামল উঠে দাঁড়ালো।

"সে কি হে, এরই মধ্যে উঠে পড়ছো কেন, বোসো আরেকটু," শঙ্খ বল্ল শ্যামলকে, লাতুরীর দিকে না তাকিয়ে।

"না, শ্যামলদা বড্ড ক্লান্ত হয়ে পড়েছে দেখছো না," লাতুরী বল্ল।

"তাই নাকি হে," শঙ্খ জিজ্ঞেস করলো শ্যামলকে।

শ্যামল কোনো উত্তর দেওয়ার আগেই লাতুরী বল্ল, "মুখ দেখে বুঝছো না। কাল ট্রেণে সারারাত জেগেছে। দুপুরে ঘুমোয় নি।"

শঙ্খ পর্যবেক্ষণ করলো শ্যামলের মুখ।

গোপাল সেন এসে ঢুকলেন ঘরের ভিতর। "সে কি, তোরা চলে যাচ্ছিস এরই মধ্যে। একটু পরে যাস। তোর বাবার ঘরের চাবিটা আনতে পাঠিয়েছিলাম। ওটা একটু দেখে যাবি না?"

"বাবার ঘর?"

"হ্যাঁ, যেদিন সে চলে গেল, তারপর থেকে ঘরটা অমনই পড়ে আছে। কেউ ব্যবহার করেনি ঘরটা। ওর বই খাতা পত্তর টেবিল, চেয়ার, খাট, আলনা ঠিক তেমনি সাজানো আছে আজো—।" গোপাল সেনের গলাটা একটু কেঁপে ক্ষীণ হয়ে এলো।

শ্যামল লাতুরীর দিকে তাকালো। বল্ল, "বোসো তাহলে একটু। আমি দাদুর সঙ্গে গিয়ে দেখে আসি।"

লাতুরী ঘাড় নাড়লো।

শঙ্খ বল্ল, "ও ঘরটা তো এখন তোমারই। তবে তুমি যদি ব্যবহার না করো তো আমায় ছেড়ে দেবে? আমি ওখানে পাড়ার মেয়েদের জন্যে একটি গানের ক্লাস খুলবো ভাবছি। আমাদের এক গাইয়ে ভাইপো বেকার বসে আছে—।"

শ্যামল উত্তর দেওয়ার আগেই বুড়ো উত্তর দিলো।

"আমি যদ্দিন বেঁচে আছি তদ্দিন নয় দাদু। আমায় চিতেয় তুলে ফিরে এসে তোরা যা খুসি করিস্—।"

ওরা বেরিয়ে যেতে লাতুরী জিজ্ঞেস করলো, "এসব হচ্ছে কি শঙ্খদা। শ্যামলদা'র সঙ্গে এভাবে কথা বলছো কেন?"

শঙ্খ হেসে বল্ল, "তুমি তো জানোই লাতুরী, সবাইকে ঠাট্টা করা, সবার পা' মোচড়ানো আমার অভ্যেস।"

লাতুরী বল্লে, "এটা ঠিক পা' মোচড়ানো হচ্ছে না শঙ্খদা। এটা গায়ে পড়ে অপমান করা। কেন করছো এরকম। ওতো তোমার কোনো ক্ষতি করেনি। নিজের বাড়ী এসে প্রথম দিনই যদি এরকম ব্যবহার পায় তো সে কি ভাববে বলো তো?"

শঙ্খ বল্ল, "আমি তো ওকে চটিয়ে দিতে চাইছি।"

"কেন?"

"কারণ আছে নিশ্চয়ই। আচ্ছা, তুমি কি বিশ্বাস করো ও সত্যি সত্যিই প্রফেসারি করতে এসেছে এখানে?"

"বিশ্বাস না করবার কি আছে?"

"আমি ঠিক বিশ্বাস করতে পারছি না। সেটা একটা ছুতো। ওর নিশ্চয়ই অন্য কোনো মতলব আছে। প্রফেসারি করতে সে কোনোদিন কলকাতা থেকে কাঁচড়াপাড়া আসতো না। কলকাতায় বা কলকাতার আসে-পাশে প্রফেসারি পাওয়া এমন কিছু শক্ত নয় রেজাল্ট

মোটামুটি ভালো থাকলে। ও তো সেকেণ্ড ক্লাস ফার্স্ট হয়েছে, না ?"

"কি জানি, আমায় বলে নি ওসব কিছু," লাতুরী বল্ল।

"বলেনি ? আশ্চর্য !"

"কেন ?"

"তুমি এতক্ষণ যেরকম ওর হয়ে প্রত্যেক কথার উত্তর দিচ্ছিলে, তা'তে তো মনে হোলো তুমি ওর সম্বন্ধে যতো জানো, ততোটা আর কেউ জানে না," শঙ্খ বল্ল।

লাতুরী একটু চুপ করে রইলো। তারপর বল্ল, "তুমি আমায় যা খুশি বলতে পারো শঙ্খদা, কিন্তু ওকে কিছু বোলো না। মনে রেখো যে ও আমার বাড়িতে অতিথি।"

"তোমার প্রাণে লাগে বুঝি ?"

"আমার আত্মসম্মানে লাগে।"

চুপ করে কি একটু ভাবলো শঙ্খকুমার। তারপর সহজভাবে বল্ল, "যাক ওসব কথা। আর কি যেন বলবো ভাবছিলাম ? হ্যাঁ। মা বলছিলেন. মায়ের বয়েস হয়ে যাচ্ছে, শরীর ভালো যাচ্ছে না। তুমি যদি বলো তো মাকে বলি একটা দিন দেখতে।"

লাতুরী কোনো উত্তর দিলো না।

শঙ্খ বল্লে, "লাতুরী, শ্যামল ত্ব'দিনের জন্যে এসেছে, ত্ব'দিন পর চলে যাবে। ওর জন্যে কি তোমার আমার মধ্যে একটা মনোমালিন্য হওয়া ভালো হবে ?"

লাতুরী একটু হেসে বল্ল, "তুমিই ভেবে দেখনা সে কথা। আমি তো তোমায় কিছু বলিনি।"

শঙ্খ চুপ করে তাকিয়ে রইলো। তারপর বল্ল, "আচ্ছা, শ্যামলকে "আমি আর কিছু বলবো না।"

*   *   *   *   *   *

ফেরার সময় গাঁয়ের ভিতরের পথটি না ধরে ফাঁকা ধানক্ষেতের মাঝখান দিয়ে আল বেয়ে চলতে লাগলো লাতুরী আর শ্যামল।

আকাশে তখন এক ফালি চাঁদ উঠেছে।

লাতুরী চলছিলো সহজ ভাবেই। লাতুরীর পেছন পেছন শ্যামল দু'একবার পা হড়কে পড়তে পড়তে সামলে নিলো।

জিজ্ঞেস করলো, "এটা শর্টকাট বুঝি ?"

"না," লাতুরী হেসে বল্ল, "একটু ঘুরে যাচ্ছি।"

"কেন," শ্যামল অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো।

"এমনি," লাতুরী উত্তর দিলো। তারপর বল্ল, "মনটা ভালো নেই। এক্ষুনি বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে করছে না। ফাঁকা মাঠের উপর দিয়ে হাঁটতে বেশ লাগছে।"

খানিকক্ষণ পথ চল্ল চুপচাপ।

দূরের অন্ধকার থেকে শেয়ালের ডাক ভেসে এলো।

লাতুরী বল্ল, "কথা বলছেন না কেন শ্যামলদা ?"

"তুমি চুপ করে আছো বলেই—।"

"আমি ? আমি ভাবছিলাম কয়েকটি কথা। যাক গে, ওসব পরে ভাবা যাবে। দাদুকে কি রকম লাগলো বলুন।"

"আমায় দেখে বুড়োর মন খারাপ হয়ে গেছে," বল্ল শ্যামল।

"হ্যাঁ, নিশ্চয়ই পুরোনো কথাগুলো মনে পড়ছে। কুন্তলা পিসী বলছিলেন আপনি নাকি ঠিক আপনার বাবার মতো দেখতে। আপনার জ্যাঠাইমাকে কি রকম লাগলো ?"

শ্যামল হাসলো। কোনো উত্তর দিলো না।

"খুব সাংসারিক লোক উনি," লাতুরী বল্ল, বিষয়বুদ্ধি খুব পাকা।"

"আমারও তাই মনে হোলো।"

"শঙ্খদাকে কি রকম লাগলো ?"

শ্যামল একটু চুপ করে থেকে বল্ল, "আমায় দেখে শঙ্খদা খুব খুশি হয়েছে বলে মনে হোলো না।"

লাতুরী বল্ল, "শঙ্খদা খুব সহজ সাদাসিধে লোক ছিলো এককালে। সম্প্রতি বড্ড বৈষয়িক হয়ে পড়েছে। সব ওঁর মায়ের জন্যে। আমি ওঁকে তুচোখে দেখতে পারি না।"

শ্যামল হেসে বল্ল, হয়তো বিয়ে করলে ঠিক হয়ে যাবে।

লাতুরী একটু লজ্জা পেয়ে হেসে ফেল্ল। বল্ল, "আপনি শুনেছেন বুঝি ?"

"হ্যাঁ।"

"কে বল্লে আপনাকে ?"

"হাসি দি।"

"আজ বাড়ি গিয়ে ভীষণ ঝগড়া করবো হাসি বৌদির সঙ্গে।"

"শঙ্খদাকে তো তুমি খুব ছেলেবেলা থেকেই চেনো, না ?"

"হ্যাঁ, যতো সব দস্যিপণা। ডানপিটেমিতে সেই তো আমার মাষ্টার-মশাই। কতো তুপুর বাড়ি থেকে পালিয়ে পরের বাড়ির আম কলা পেয়ারা চুরি করেছি, পরের পুকুরে ছিপ দিয়ে মাছ ধরেছি। আমতলায় লুকিয়ে কাঁচা আম নুন মেখে খেতে গিয়ে ধরা পড়ে আমরা তু'জন কম মার খেয়েছি হাসিবৌদির কাছে ?"

শ্যামল হাসলো।

লাতুরী বল্ল, "একদিন আমার ভীষণ সখ হোলো কোকিল পুষবো। শঙ্খদাকে বল্লাম আমায় একটি কোকিল ছানা এনে দাও। এখন

কোকিল ছানা কোথায় পাবে সে। আমি বুদ্ধি বাতলে দিলাম। কোকিল ডিম পেড়ে যায় কাকের বাসায়। সেখান থেকে ডিম পেড়ে আনুক সে। সেই ডিম থেকে কোকিল ছানা বেরুলে সেটিকে খাঁচায় পুরে পোষা যাবে। কিন্তু ডিম থেকে ছানা তো আর আপনা আপনি বেরুবে না। ঠিক করা হোলো সেই ডিম হাসের ডিমের মধ্যে মিশিয়ে রেখে দেওয়া হবে। বাড়ির হাস তাতে তা দিয়ে ডিম ফোটাবে। আমার প্ল্যান শুনে শঙ্খদা খুব খুশি। তক্ষুনি তর তর করে উঠে গেল একটি মস্তো বড়ো আমগাছে। ডিম নিয়ে নেমে আসছে এমন সময় পড়ে গেল পা ফসকে। ঠ্যাং ভাঙলো শঙ্খদার। হাসি বৌদির কাছে মার খেয়ে আমারও ঠ্যাং দুটো প্রায় ভাঙে আরকি। দাদু এসে আমায় কোলে তুলে ওঁদের বাড়ি নিয়ে গেলেন। শঙ্খদা তো আমার সঙ্গে কথা বলবে না কিছুতেই। ডাক্তার বলেছে তাকে মাস দুয়েক বিছানায় শুয়ে থাকতে হবে। আমার জন্যে তার গরমের ছুটি নষ্ট হোলো। ভীষণ রাগ আমার উপর। খুব সাধ্যসাধনা করলাম। কিছুতেই কথা বলবো না। কি করলে কথা বলবি, জিজ্ঞেস করলাম তাকে। এমন বজ্জাত ছেলে! বলে কিনা, তুই আমায় বিয়ে করলে তবে কথা বলবো। আমি বল্লাম, তোর মতো ঠ্যাং-ভাঙাকে আমি বিয়ে করি না। বলে বেরিয়ে গেলাম। বেরিয়েই সোজা গেলাম বকুল তলায়। একরাশ ফুল কুড়িয়ে আর দুই তিনটা কাঁচা আম আর নুন জোগাড় করে ফিরে এলাম। দেখলাম শঙ্খদা বেশ খুশি হয়েছে, কাঁচা আম দেখে তার জিভে জল এসে গেছে। তারপর সেই ফুল দিয়ে মালা গেঁথে, বিছানায় ঠ্যাং ভেঙে পড়ে থাকা সেই বদমাইশটির গলায় পরিয়ে বল্লাম, এই তোকে বিয়ে করলাম শঙ্খদা, এবার কথা বলবি তো? এমন স্বার্থপর শঙ্খদা বল্লে কিনা! আগে আম খাওয়া, তারপর। আমি কাঁচা আম কেটে, তাতে নুন মাখিয়ে এগিয়ে দিলাম।

শঙ্খদা তার মালাটি আমার গলায় পরিয়ে দিয়ে বল্লে, তুই রাগ করেছিস, তোর সঙ্গে কথা না বলে পারি? তারপর কি ফুর্তি করে কাঁচা আম নুন খাওয়া! এমন সময় মাসীমার, অর্থাৎ শঙ্খদার মায়ের প্রবেশ। তারপর আবার প্রহার। কিন্তু সে মার গায়ে লাগেনি।"

একটু চুপ করে থেকে বল্ল, "দাদু আর হাসি বৌদি আমাদের বিয়ের ঠিক করার বহু আগেই আমাদের বিয়ে হয়ে গেছে, শ্যামল দা। ওঁরা নিজের থেকে আমাদের বিয়ের কথা না তুল্লে হয়তো আমরাই কথাটি তুলতাম ওঁদের কাছে। খুব অবাক হচ্ছেন, না? আপনার সঙ্গে একদিনের আলাপ, কি করে এত কথা আপনাকে বলে ফেলেছি এরই মধ্যে, তাই ভাবছেন হয়তো। জানেন, আপনি শঙ্খদার, হাসি বৌদির ভাই। আপনাকে তো পর ভাবতে পারি না। আপনি সম্পর্কে আমার দেওর যে। যেদিন সামাজিক বিয়েটা হবে তারপর কি আর আপনাকে আপনি করে বলবো ভেবেছেন?" বলে হাসলো লাতুরী।

শ্যামল বল্ল "আপনিটা এখন থেকেই বাদ দিতে পারো।"

"পারি?" লাতুরী খুব খুশি হোলো যেন, তারপর বল্ল, "জানো শ্যামলদা, তোমায় এতখানি আপন ভাবি যে আজ যখন দেখলাম ওবাড়িতে তোমায় কেউ সহজ ভাবে নিলো না, তখন আমারই মনে লাগলো সব চেয়ে বেশী। তবে আমি যেদিন ওবাড়ির বৌ হবো সেদিন দেখে নিও ওবাড়িতে তোমার কোনো অনাদর হবে না।"

"আচ্ছা, তুমি যে পার্টির কাজ করো, এতে ওঁরা আপত্তি করেন না," শ্যামল জিজ্ঞেস করলো।

"শঙ্খদার মা খুব পছন্দ করেন না এসব", লাতুরী বল্ল, "দাদু আর শঙ্খদা এতে কিছু মনে করেন না বলেই কিছু বলতে পারেন না। তা ছাড়া আরেকটা কারণ আছে যে জন্যে আমার সঙ্গে তার ছেলের

বিয়ে দিতে খুব তাঁর খুব আগ্রহ। আমি কিছু মামার বাড়ির সম্পত্তি পাবো," বলে লাতুরী হাসলো। তারপর বল্ল, "শঙ্খদাও এককালে পার্টির কাজ নিয়ে পড়ে থাকতো। ও পার্টির সভ্য না হলেও খুব সমর্থক ছিলো এক সময়। তাই ডাক্তারী পাশ করে সহরে না বসে গাঁয়ে এসে চ্যারিটেবল ডিসপেনসারিটা নিয়ে পড়লো। কিন্তু গত কয়েক মাস ধরে একটু ভাবান্তর লক্ষ্য করছি ওর মধ্যে। আজকাল পার্টির কাজে কোনো উৎসাহ নেই। আগে বিনে পয়সায় চিকিৎসা করতো। এখন বাইরে থেকে ডাক এলে ভিজিট নেয়। বলে, কিছু পয়সা কামানো দরকার। পয়সা না হলে চলবে কি করে। ওকে খুব একটা দোষ দিই না। দেশে ডাক্তার নেই। বেশীর ভাগ ডাক্তারই মিলিটারীতে গেছে। আর চারদিকে যে যেমনি পারে পয়সা করছে। ও যদি দুপয়সা করবার চেষ্টা করে, কার কি বলার আছে। লোকে ব্ল্যাকমার্কেটিং করে, মুনাফাবাজি করে পয়সা করবার চেষ্টা করছে। শঙ্খদা যে ওসবের মধ্যে যায় নি, শুধু ডাক্তারী করে পয়সা আয় করবার চেষ্টা করছে, সেটুকুই আমার সান্ত্বনা। তবে আমার কি খারাপ লাগে জানো? সাধারণ লোকের জন্যে আগে ওর যেটুকু দরদ ছিলো, সেটা আর নেই। আগে চাষা ভুষোদের বাড়ি যেতো, পয়সা নিতোনা, এখন আর যায় না, ওদের চিকিৎসা করিয়ে নিতে হয় ডিসপেনসারিতে এসে। এখন শুধু বাধিত করবার চেষ্টা করে, তাদেরই, যাদের খুশি করলে ভবিষ্যতে ইলেকশানে দাঁড়ানোর সুবিধে হবে। আমার এসব ভালো লাগে না। এসব হয়েছে ওর মায়ের প্রভাবে। তবে সেজন্যে আমি ভাবি না। আমি জানি ওকে আমি ঠিক করে নিতে পারবো।"

তারপর অনেকক্ষণ কেউ কোনো কথা বল্ল না। বাড়ির কাছাকাছি

এসে লাতুরী হঠাৎ বল্ল, "আচ্ছা, শ্যামলদা, তুমি কল্যাণদার সম্বন্ধে কিছু জানো ?"

শ্যামল একটু থমকে দাঁড়ালো। তারপর বল্ল, "কি বিষয়ে ?"

লাতুরী বল্ল, "কল্যাণদা বাইরের কোনো রাজনৈতিক দলের সংশ্রবে ছিলো বলে জানতাম না। আজ হঠাৎ জানলাম ও ফরওয়ার্ড ব্লকের লোক।"

"তাই নাকি," শ্যামল বল্ল।

লাতুরী বলে চল্ল, "চাটগাঁয় ওদের প্রভাব এত কম যে এখানে আগষ্ট আন্দোলন হতে পারে নি। কিন্তু সম্প্রতি ওদের কর্মীরা চাটগাঁয় আসতে সুরু করেছে। শুনছি আগষ্ট আন্দোলনের একজন নামকরা আণ্ডারগ্রাউণ্ড কর্মী অরুণ গুপ্ত চাটগাঁয় এসে গা ঢাকা দিয়ে আছে এবং চারদিকে নানারকম যোগাযোগ করবার চেষ্টা করছে। ব্যাপার কি বুঝতে পারছি না। জোর গুজব এবার বর্ষার আগে নাকি ওদিকে আসাম এদিকে দোহাজারি দিয়ে প্রবল আক্রমণ সুরু হবে ভারতের উপর।"

শ্যামল কোনো উত্তর দিলো না।

"আমাদের এখানকার কাজগুলো থেকে কল্যাণদাকে বাদ দিতে হোলো," লাতুরী বল্ল।

"কেন ?"

"আমাদের কর্মীরা সবাই এ্যান্টিফাসিস্ত। এসবের মধ্যে কল্যাণদার থাকাটা ওরা বাঞ্ছনীয় মনে করবে না," লাতুরী বল্ল। "এবার তোমাকেই একটু খাটাবো শ্যামলদা। তোমার আপত্তি নেই তো ?"

শ্যামল একটু হেসে বল্ল, "না, আপত্তি হবে কেন ? কাজ করবার জন্যেই তো এসেছি।"

বাড়ি ফিরে এসে পুকুরে হাত মুখ ধুতে গিয়ে কল্যাণের সঙ্গে দেখা হোলো।

কল্যাণ বল্ল, "তোমার জন্যে এতক্ষণ অপেক্ষা করেছিলাম। আমি এক্ষুনি চলে যাচ্ছি।"

"এক্ষুনি?" শ্যামল জিজ্ঞেস করলো।

"হ্যাঁ। নোয়াপাড়া ঘুরে কাল সকালে একবার শহরে যাবো।"

"তোমার সঙ্গে আমার আবার দেখা হচ্ছে কখন," শ্যামল জিজ্ঞেস করলো।

"শহর থেকে নোয়াপাড়ায় ফিরে এসে খবর দোবো। তখন এসো।"

"আমাকেই নোয়াপাড়ায় যেতে হবে তোমার সঙ্গে দেখা করতে?"

"সে কি কথা? তুমি দেশে এসে একবারও মামার বাড়ি যাবে না, সে কি হয়?"

"কিন্তু মামারা তো কেউ নেই।"

"আমি এক মামাতো ভাই তো আছি।"

"বেশ, যাবো," শ্যামল বল্ল। "আর শোনো, লাতুরী বলছিলো তুমি ফরওয়ার্ড ব্লকের লোক।"

"হ্যাঁ, ও জেনে গেছে।"

"আমায় বলছে ওদের সঙ্গে কাজ করতে।"

"তাই নাকি," কল্যাণ হাসলো। "বেশ তো, করো না।"

শ্যামলও হাসলো।

কল্যাণ চলে গেল।

* * * * *

বাড়ির ভিতর ঢুকতেই হাসি দি'র ডাক এলো রান্নাঘর থেকে।

পেছনের উঠোন পেরিয়ে রান্নাঘরে ঢুকতেই হাসি দি বল্ল, "এত রাত করলি কেন?"

"কোথায় রাত করলাম," শ্যামল বল্ল, "এখন মোটে ন'টা।"

"ন'টা?" হাসি দি বল্ল, "ন'টা যে অনেক রাত রে। খেয়ে নে তাড়াতাড়ি। দাতু তোর জন্যে ভাত বেড়ে বসে আছে।"

"জামাইবাবু খাবেন না?"

"উনি আর কল্যাণ খেয়ে নিয়েছে অনেকক্ষণ। কল্যাণ বল্ল সে তাড়াতাড়ি চলে যাবে। তাই ওদের দু'জনকে একসঙ্গে দিয়ে দিলাম।"

"তোমার?"

"আমি, লাতুরী আর দাতু পরে খাবো।"

শ্যামল খেতে বসলো। দাতুই পরিবেশন করতে লাগলো। পাশে বসে তালপাতার পাখা নেড়ে হাওয়া করতে লাগলো হাসি দি।

খাওয়া দাওয়া সেরে পেছনের পুকুর থেকে আঁচিয়ে এসে উপরে উঠে এসে দেখে দাতু এসে তার বিছানা করে দিচ্ছে।

শ্যামলকে দেখে বল্ল, "শুয়ে পড়ুন এবার। আমি মশারিটা গুঁজে দিয়ে যাই।"

শ্যামল উঠে বসলো খাটের উপর। তাকালো দাতুর দিকে। জানালা দিয়ে ক্ষীণ চাঁদের ম্লান আলো এসে পড়েছে দাতুর মুখে। রজনীগন্ধার গন্ধ ভেসে আসছে ঠাকুর দালানের ওপাশ থেকে।

জিজ্ঞেস করলো, "আমি আসাতে তোমার খুব খাটুনি বেড়েছে, না দাতু?"

"না তো," ঘাড় নাড়লো দাতু।

"সারাদিন সবার সঙ্গে গল্প করলাম," শ্যামল বল্ল, "শুধু তোমার সঙ্গেই গল্প করা হোলো না।"

"কাল করবেন, এখন শুয়ে পড়ুন," দাতু বল্ল।

"তোমার পোষাকী নামটা কি," শ্যামল জিজ্ঞেস করলো।

"পোষাকী নাম?" দাতু আয়ত চোখ মেলে জিজ্ঞেস করলো।

"হ্যাঁ, ভালো নাম—,"

"ও, ভালো নাম, আমার ভালো নাম—যান্, আপনাকে বলবো না," বলে দাতু চলে গেল।

অনেক রাতে শ্যামলের চোখে যখন ঘুম নামলো তখন পাপিয়ার গানে আর আমের বউলের গন্ধে দক্ষিণের হাওয়া উদ্বেল হয়ে উঠেছে।

(পাঁচ)

তারপর কয়েকটি স্নিগ্ধ দিন কেটে গেল হাসি দির সঙ্গে, লাতুরীর সঙ্গে। দিনের বেলা লাতুরীর সঙ্গে আর তাদের দলের অন্যান্য কর্মীদের সঙ্গে আশে পাশের গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে বেড়ানো, আর সন্ধ্যের পর রান্নাঘরে বসে হাসি দিদের সঙ্গে চায়ের আসর জমিয়ে গল্প করা। মাঝে মাঝে বুড়ো গোপাল সেনও এসে যোগ দিতেন সেই চায়ের আসরে, আর যেদিনই আসতেন সঙ্গে একটি চাকর আসতো বাড়ির ফল বা তরিতরকারী কিছু না কিছু নিয়ে।

কানুনগোপাড়া কলেজে ক্লাস নিতে হোলো সপ্তাহে শুধু দু'দিন। জুলাই মাস থেকে তার কাজে যোগ দেওয়ার কথা, তা সত্ত্বেও সে যে আগেই এসে উপস্থিত হয়েছে, তা'তে অত্যন্ত খুশি হলেন কলেজের অধ্যক্ষ। ঠিক মতো অধ্যাপক পাওয়া যায় না এখানে পড়ানোর জন্যে, পেলেও বেশীদিন ধরে রাখা যায় না। শ্যামলের সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষের একটা বিশেষ নির্দেশ ছিলো। সুতরাং তখনকার মতো খুব বেশী কাজের চাপ দেওয়া হোলো না শ্যামলের উপর।

হাতে অফুরন্ত সময়। পাঁচ ছয় দিনে একবার তাকে শহরে যেতে হোতো নিজের কাজে। কী সে কাজ তাকে হাসি দিরা জিজ্ঞেস করে নি, সেও বলে নি, কেউ উৎসুক হয় নি তার অনুপস্থিতিতে। ইতিমধ্যে বার দুই তিন নোয়াপাড়ায় মামার বাড়িও বেরিয়ে এলো।

মামার বাড়িতে লোকজন ছিলো না। মামারা সব বাঙলার

বাইরে। সেখানে থাকতো শুধু কল্যাণ রায় আর তার দু' একজন বন্ধু।

লাতুরী একদিন বল্ল, "কল্যাণদার সঙ্গে বেশী ঘোরাফেরা কোরো না শ্যামলদা। ওর উপর পুলিশের নজর আছে। ওর সঙ্গে বেশী মাখামাখি করতে দেখলে পুলিশ আবার তোমাকেও বিরক্ত করবে।"

হাসি দি বল্ল, "পুলিশের নজর আছে বলে কি নিজের মামাতো ভায়ের সঙ্গে মেলামেশা বন্ধ করতে হবে নাকি?"

শ্যামল বল্ল, "লাতুরী ঠিক সে কথা বলতে চায় নি হাসি দি। কল্যাণদা ফরওয়ার্ড ব্লকের ছেলে। লোকে জানে আমি ফ্যাসিবিরোধী কবিতা লিখি। সুতরাং আমাদের রাজনৈতিক মতবাদের অমিল অনেক। মতবিরোধী দলের কর্মীদের মধ্যে একটা অন্তরঙ্গ সামাজিক যোগাযোগ বজায় রাখার অসুবিধে আজকের দিনে অনেক। সুতরাং পুলিশ যদি আমাকেও হঠাৎ কল্যাণদা'দের দলের লোক মনে করে বিরক্ত করতে সুরু করে তাহলে আমার ফ্যাসিবিরোধী সুনাম যেটা আছে বলে ধরে নেওয়া হচ্ছে সেটা ক্ষুণ্ণ হতে পারে বলে লাতুরী ভয় পাচ্ছে।"

"আমি অতো ভেবে বলিনি শ্যামলদা," লাতুরী বল্ল, "তুমি সাদাসিধে নির্ঝঞ্ঝাট লোক। তুমি কোনোরকম পুলিশের হাঙ্গামায় পড়ো এটা আমি চাই না। আপনজন বলেই বলছি, তা নইলে আমার কি।"

"তুমিও কি লাতুরীর মতো ফরওয়ার্ড ব্লকবিরোধী নাকি," হাসি দি জিজ্ঞেস করলো শ্যামলকে।

শ্যামল হেসে প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল। লাতুরীকে জিজ্ঞেস করলো,

"প্রসাদ চৌধুরীর উপর পুলিশ নজর দেয় না কেন? ভেজালওষুধ আর ওষুধ চুরীর ব্যাপার পুলিশকে জানাওনি তোমরা?"

"জানিয়েছি সবই," লাতুরী বল্ল, "কিন্তু কারো বিরুদ্ধে তো কোনো প্রমাণ নেই। তা ছাড়া পুলিশ এ নিয়ে তদন্ত করার ব্যাপারে কোনো উৎসাহ দেখাচ্ছে না। আর প্রসাদ চৌধুরী চালের ব্ল্যাক-মার্কেট করুক বা মুনাফাবাজি করুক ওকে কেউ কিছু বলবে না। ও ওয়ারফাণ্ডে রেডক্রসে বহু টাকা দিয়েছে। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ওর বন্ধু। তাই ওকে কেউ ঘাঁটাতে চায় না।"

লাতুরীরা সম্প্রতি আবার চেষ্টা করেছিলো প্রসাদ চৌধুরী আর দলের লোকদের চ্যারিটেব্‌ল ডিসপেনসারির ম্যানেজিং কমিটি থেকে সরিয়ে দিতে। কিন্তু সে উদ্যম ব্যর্থ হয়েছিলো অন্যান্য বারের মতো।

"হাতে নাতে ধরতে না পারলে কিছু করা যাবে না," লাতুরী বল্ল।

"আমি একবার চেষ্টা করে দেখবো," শ্যামল জিজ্ঞেস করলো।

"তুমি আবার কি করবে?

"দেখি কি করতে পারি।"

"যদি কিছু করতে পারোতো দেশের উপকার হয় অনেক," হাসি দি বল্ল, "লাতুরীরা একটা প্রসূতিসদন করবার চেষ্টায় আছে, কিন্তু ব্যাপারস্যাপার দেখে কেউ ভরসা করে টাকা দিতে পারছে না।"

শ্যামল সহর থেকে ঘুরে এলো আরেকবার।

লাতুরী একটু উৎসুক হোলো।

শ্যামল কোনো উত্তর দিলো না তার প্রশ্নের। শুধু বল্ল, "বলবো'খন সময়মতো। এখন কিছু জানতে চেও না, কাউকে কিছু বোলোও না।"

* * * * *

কেটে গেল আরো কয়েকটা দিন। কানুনগোপাড়া কলেজে

দু'দিন গিয়ে পড়িয়ে আসা ছাড়া আর কোনো কাজ নেই। তাই সে নিজের অবসরের মুহূর্তগুলি ছড়িয়ে দিলো লাতুরীদের দৈনন্দিন কর্মসূচীর মধ্যে। তাদের তখন অনেক কাজ। পার্টি নতুন প্রোগ্রাম দিয়েছে বিগত মন্বন্তরের পর। সেই প্রোগ্রাম নিয়ে ঘুরে বেড়াতে হয় গাঁয়ে গাঁয়ে।

শ্যামল প্রত্যেকদিন শ্রীপুর থেকে বেরিয়ে পড়তো লাতুরীর সঙ্গে। কিষাণদের মিটিঙে, ছাত্রদের মিটিঙে, গ্রামবাসীদের মিটিঙে এক কোণে বসে শুনতো লাতুরী আর অন্যান্য কর্মীদের বক্তৃতা। গাঁয়ে গাঁয়ে বাড়ি বাড়ি মেয়েদের মধ্যে মহিলাসংঘের প্রোগ্রাম বোঝাতে যেতো লাতুরী। শ্যামল সঙ্গে যেতো, গিয়ে বসে থাকতো বাইরের দেউড়িঘরের দাওয়ায়। স্কুলে স্কুলে লাতুরী আর অন্যান্য ছেলেমেয়েরা লিফলেট বেচতো, বেচতে না পারলে বিলি করতো। তাদের সঙ্গে লিফলেটের বাণ্ডিল বয়ে বেড়াতো শ্যামল। সকাল বেলার দিকে লাতুরীর স্কুল বসতো। সেখানে গিয়ে ইংরেজী আর ইতিহাসের ক্লাস নিতো শ্যামল। ছুটির দিনে বা অন্যান্যদিনে দুপুরে বেরুতো লাতুরীদের ছেলেমেয়ে মেশানো মস্তোবড়ো দল, কখনো বা বেরুতো সে আর লাতুরী একা। দীর্ঘপথ চলায়, অকুণ্ঠ ঘুরেবেড়ানোয় কোনো ক্লান্তি এলোনা শ্যামলের মনে, তার শহুরে মন পল্লীর শ্যামলিমায় একটি নতুন রসের সন্ধান পেলো। সমস্ত দেশটাকে নিবিড়ভাবে চিনে নিলো কয়েকদিনে, চিনে নিয়ে বুঝে নিলো, বুঝে নিয়ে ভালোবেসে ফেল্ল। শ্রীপুর থেকে দীর্ঘ ধূলিময় পথ অতিক্রম করে কানুনগো-পাড়া, সারোয়াতলি, ধলঘাঠ, পটিয়া, গৈরলা, বরমা, আর শ্রীপুর থেকে কর্ণফুলী পেরিয়ে নদীর ওপারে নোয়াপাড়া, গুজরা, কোয়েপাড়া, রাউজান—এক দীর্ঘপরিক্রমায় কয়েকদিনের মধ্যেই সমস্ত দেশটার হৃদয়স্পন্দন সে অনুভব করে নিলো তার নিজের হৃদয়স্পন্দনে।

মুসলমানে আর হিন্দুতে মেশামিশি এই দেশ, পঞ্চাশের মন্বন্তরে একেবারে নেতিয়ে পড়েছে, কিন্তু নিষ্প্রাণ হয়নি। মধ্যবিত্তের ঘরে পয়সা নেই, চাষার ঘরে ধান নেই, রাজনীতির ধার ধারেনা এরা, কংগ্রেস মুসলিম-লীগকে নিয়ে মাথা ঘামায় না, শুধু চায় সহজ খাওয়াপরার সাদাসিধে সংস্থান নিয়ে একটুখানি শান্তিতে থাকতে। কিন্তু তার উপায় নেই। একদিকে দেশের এখানে ওখানে বিদেশী সৈন্যদের ক্যাম্প, তাদের রসদের সর্বগ্রাসী দাবীদাওয়া, যুদ্ধের নানারকম গুজব, সীমান্তের ওপার থেকে আসন্ন আক্রমণের দুর্ভাবনা, অন্যদিকে খাওয়াপরার জিনিষপত্রের ঘাটতি, কালোবাজার, মুনাফাবাজি, নানারকম ভুঁইফোড় ব্যবসাদারের দুর্বোধ্য কর্মব্যস্ততা। যার হাতে দু'পয়সা আছে তার পয়সা বেড়ে যাচ্ছে দিনের পর দিন, আর যার অর্থাভাব তার দারিদ্র্য আরো বেড়ে যাচ্ছে দেশের সম্পদের অসমবণ্টনের ভারসাম্যহীনতা আরো বেশী বিপর্যস্ত করে।

আর তারই মাঝখানে প্রত্যেক বাড়ির মেয়েরা ঠিক হাসি দির মতো। অভাবের সংসারে, যুদ্ধের দাম বেড়ে যাওয়া আবহাওয়ায় সব কিছু নিঁখে সয়ে নিয়ে সংসার চালিয়ে নিচ্ছে আর সন্ধ্যে বেলা খড় দিয়ে ছাওয়া রান্নাঘরে বসে লটিয়া মাছের সুঁটকি রাঁধতে রাঁধতে শ্যামলের মতো ভায়েদের সঙ্গে, দেওরদের সঙ্গে, ছেলেমেয়েদের সঙ্গে গল্প করে যাচ্ছে হাসি ঠাট্টার বাদলা হাওয়া ছুটিয়ে, যার পেছনে বিপুল দারিদ্র্যের থমথমে আকাশ ঝোড়ো কালবৈশাখীর অপেক্ষায়।

* * * * *

সেদিন পয়লা বৈশাখ।

দরজা জানালায় অপরাজিতা আর কাঠগোলাপের মালা ঝোলানো।

সকাল থেকে পুকুরপাড়ে হৈ চৈ। হাসিদির বর ভূপতিবাবু আর আশে-পাশের বাড়ির ছেলেরা জাল ছুঁড়ে মাছ ধরছে। গোটা ছয়েক ভেলা

বানানো হয়েছে কয়েকটা বাঁশ দড়ি দিয়ে বেঁধে। তারই একটিতে হাঁটুর উপর লুঙ্গি তুলে বাঁ হাতে জড়িয়ে ডান হাতে তাক করে পুকুরের জলে জাল ছুঁড়ছে ভূপতি মজুমদার, তারপর টেনে তুলছে আস্তে আস্তে।

অনেকক্ষণ দেখবার পর শ্যামল বল্ল, "বাঃ, জাল ছোঁড়াটা সহজ হলেও বেশ ইনটারেস্টিং—।"

"সহজ?" ভূপতি মজুমদার ক্ষেপে উঠলো। যারা মাছ ধরতে পারেনা তাদের মানবশ্রেণীর মধ্যে গণ্য করতো না ভূপতি মজুমদার। শ্যামলকে প্রথম দিনই জিজ্ঞেস করেছিলো, মাছ ধরায় উৎসাহ আছে। শ্যামল জীবনে কোনোদিন ছিপ স্পর্শ করেনি শুনে তার সম্বন্ধে কোনো উচ্চ ধারণা পোষণ করবার প্রয়োজন মনে করেনি। বল্ল, "সহজ? এসে একবার চেষ্টা করে দেখ তো।"

ধুতি মালকোচা মেরে হাঁটুর উপর তুলে ভেলার উপর উঠে এলো শ্যামল। জালের দড়িটি বাঁ হাতে জড়িয়ে নিলো। তারপর জালটি ধরে বাঁয়ে থেকে ডাইনে একটি অর্ধবৃত্ত ঘুরপাক খেয়ে জালটি ছুঁড়ে মারলো পুকুরের জলে।

একটা সোরগোল কানে ভেসে এলো।

জলের ঝাপটার ঝাপসা ঘোলাটে ঘোর কাটিয়ে মুখ তুলে দেখে সে নিজেই পুকুরের জলে খাবি খাচ্ছে।

কিছুক্ষণ পর ভেজা জামাকাপড়ে তাকে যখন ভেলায় টেনে তোলা হোলো তখন চারদিকে হাসির ঝড় বইছে।

"আরেকটু হলে তোমাকেও জাল বেয়ে তুলতে হয়েছিলো আর কি," বল্ল ভূপতি মজুমদার।

ভেলা ঠেলে নিয়ে আসা হোলো পুকুরের বাঁধানো ঘাটে।

"এবার বাড়ির ভিতর গিয়ে জামাকাপড় ছাড়োগে'," ভূপতি মজুমদার বল্ল, "আর হ্যাঁ, এ মাছটা নিয়ে যাও। তোমার হাসি দিকে দিও।"

শ্যামলের হাতে একটি কাতলা মাছ তুলে দেওয়া হোলো।

হঠাৎ শ্যামলের হাতটা হাল্কা মনে হোলো। ঝুপ করে কি একটা যেন লাফিয়ে পড়লো পুকুরের জলে।

আবার হাসির রোল পড়ে গেল।

চেয়ে দেখে, ভূপতি মজুমদার মাথায় হাত দিয়ে ঘাটের উপর বসে পড়েছে।

শ্যামলের হাতে মাছ নেই।

"গেল কোথায় মাছটি," শ্যামল হতভম্ব হয়ে জিজ্ঞেস করলো।

"কোথায় আবার যাবে? ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে গেছে," বল্ল ভূপতি মজুমদার, "বোকা ছেলে, ধরতে দিলাম কানকোর দিকটা, ধরলে মাছের ল্যাজ। এও জানো না যে জ্যান্ত মাছ ল্যাজ ধরে নিয়ে যেতে নেই?"

শ্যামল গুটগুট করে উঠোন পেরিয়ে বাড়ির ভিতর গিয়ে ঢুকলো।

খবরটা ততক্ষণে বাড়ির ভিতর পৌঁছে গেছে। হাসি দি, লাতুরী, দাতু, সবাই হেসে খুন।

হাসিদি বল্ল, "যা, উপরে গিয়ে জামা কাপড় ছেড়ে ফেল। আমি শুকনো কাপড় পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

শ্যামল উপরে উঠে গেল। একটু পরে দাতু উঠে এলো শুকনো কাপড় আর তোয়ালে নিয়ে। সে তখনো মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসছে।

এবার একটু রাগ হোলো শ্যামলের। এত হাসির কি আছে। ঝালটা দাতুর উপরেই ঝাড়লো। ওর কাঁধ তুটো ধরে একটা প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে বল্ল, "খুব মজা পেয়েছো, না?"

দাতু বল্ল, "আঃ, ছাড়ুন না, লাগছে। কেউ দেখলে কি ভাববে?" অপ্রস্তুত হয়ে দাতুকে ছেড়ে দিলো শ্যামল।

কিন্তু দাতু চলে গেল না। একটু ইতস্ততঃ করে বল্ল, "দাঁড়ান, আপনাকে একটা প্রণাম করি," বলে টুক করে তার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলো।

শ্যামল অবাক। "এর মানে?"

"বছরের প্রথম দিন। বড়োদের আজ প্রণাম করতে হয়," দাতু বল্ল, "তবে সবার সামনে প্রণাম করতে লজ্জা করছিলো।"

"সবার সামনে প্রণাম করতে লজ্জা করছিলো?" শ্যামল একটু গম্ভীর হয়ে গেল। "কেন? গুরুজনকে আবার লজ্জা কিসের।"

"গুরুজন না হাতী," বলে দাতু ছুটে পালালো।

শ্যামল একটু অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো। তারপর তোয়ালে দিয়ে গা মুছতে সুরু করলো। মুছতে মুছতে থেমে গেল হঠাৎ। সবার সামনে লজ্জা করছিলো?

তাৎপর্যটা হঠাৎ নানারঙে রঙিন হয়ে ঝিলমিল করে উঁকি মারলো মনের কোণে, জানালার ওপারে গাছের ডালাপালার ফাঁকে ফাঁকে একটুখানি ধরা দেওয়া পয়লা বৈশাখের সকাল বেলার সোনালী রোদ্দুরের মতো।

কী সর্বনাশ, বলে শ্যামল ধপ করে বসে পড়লো দরজার চৌকাঠের উপর। আমি এখন কি করি এই ছেলেমানুষ মেয়েটিকে নিয়ে, সে ভাবলো।

* * * * *

খাওয়া দাওয়ার পর দুপুর বেলা টেনে লম্বা ঘুম।

ঘুম যখন ভাঙলো তখন বেলা পড়ে আসছে। মনে হোলো কি যেন একটি মনে-না-পড়া স্বপ্ন একটি মিষ্টি রেশ রেখে গেছে।

বাইরে একটা সোরগোল শুনে শ্যামল বিছানা ছেড়ে উঠে এসে বারান্দায় বেরিয়ে এলো। এসে দেখে নিতাই বহুরূপী তার শেষ দিনের সাজটি নিয়ে এসেছে। গত সাতদিন ধরে নানা রকম বেশ ধরে আসছিলো সে। বছরের প্রথম দিন এলো গাঁয়ের কিষাণ সেজে, সঙ্গে আরেক' জন। একহাতে ঝাঁপি আরেকহাতে ধানের গোছা নিয়ে ধান্যলক্ষ্মী সেজেছে সে। মিনিট পাঁচ সবার উদ্দেশে নানারকম শুভ কামনা করলো নিতাই বহুরূপী। হাসিদি বেরিয়ে এলো সিধে আর দু আনা বখশীষ নিয়ে। নিতাই চলে যেতে উপরের দিকে তাকিয়ে শ্যামলকে দেখে হাসি দি বল্ল, "তোর ঘুম ভেঙেছে? নীচে নেমে আয়। সাইর ঠাকুর বর্ষফল গুণতে এসেছে।"

হাত মুখ ধুয়ে বাইরের ঘরে গিয়ে দেখে এক প্রৌঢ় গৌরকান্তি ব্রাহ্মণকে ঘিরে বসেছে কুন্তলা মাসী, ভূপতিবাবু, হাসি দি, দাতু আর লাতুরী। মাটিতে খড়ি পেতে রাশিচক্র এঁকে একটি তুলোট কাগজ থেকে সুর করে পড়িয়ে শোনাচ্ছে সাইর ঠাকুর :

হাসিয়া কৈলাসনাথে কন হৈমবতী।
বর্ষফল কহ মোরে করি হে মিনতি ॥
বর্ষাধিপ কোন গ্রহ মন্ত্রী কেবা হৈল।
জানিতে অধীর আমি শঙ্করী কহিল ॥
দেবীর আগ্রহ দেখি হরষিত মন।
চন্দ্রচূড় কহে প্রিয়া করহ শ্রবণ ॥
রবি রাজা ভৃগু মন্ত্রী শশাঙ্ক জলেশ।
কুজ শস্যপতি আর আবর্ত মেঘেশ...

শ্যামলকে দেখে হাসি দি বল্ল, "আয়, এখানে এসে বোস। সাইর কাকা, এ হোলো মেজ মামার ছেলে। ইনি সাইর কাকা, এঁকে প্রণাম কর শ্যামল।"

সাইর ঠাকুরেরা বংশানুক্রমে শ্যামলদের বাড়ির পুরোহিত। এঁদের কথা শ্যামল জানতো। সে এসে প্রণাম করলো সাইর ঠাকুরকে।

"তুমি প্রিয়গোপালের ছেলে?" সাইর ঠাকুর বল্ল, "বড় আনন্দ লাভ করলাম বাবা তোমায় দেখে। বোসো। তোমার কথা আমি গোপাল কাকার কাছে শুনেছি। তোমার বাবা আমার বাল্যবন্ধু ছিলেন। আমরা ছেলেবেলায় পাঠশালায় পড়েছি একসঙ্গে। আমি কয়েকদিন ধরে তোমার সঙ্গে দেখা করবো ভাবছি। কিন্তু আমি যখন পূজো করতে এবাড়ি আসি, তখন আর তোমায় পাই না। শুনি তুমি বেরিয়ে গেছ। তোমার মা ভাল আছেন তো বাবা?"

এক এক জন করে প্রত্যেকের রাশি ধরে বর্ষফল বিচার করলো সাইর ঠাকুর। সবারই শুভ, সবারই যশোলাভ, ভাগ্যবৃদ্ধি, সুখবৃদ্ধি।

"তোমার কি রাশি বাবা?" শ্যামলকে জিজ্ঞেস করলো সাইর ঠাকুর।

"তা'তো আমি জানি না," শ্যামল বল্ল।

"বৃষ রাশি," হাসি দি বল্ল।

"তুমি কি করে জানো" শ্যামল জিজ্ঞেস করলো হাসি দিকে।

"মেজোমাসী তোমার কোষ্ঠি পাঠিয়ে দিয়েছেন আমার কাছে।"

"মা পাঠিয়েছেন? কেন?" কারণটা হঠাৎ হৃদয়ঙ্গম করলো শ্যামল। লাফিয়ে উঠলো তড়াক করে, "ওসব হবে টবে না হাসি দি। মাকে এক্ষুনি লিখে দাও—।"

"কী ছেলেমানুষী করছিস শ্যামল। বোস চুপটি করে। বলুন সাইর কাকা," বলে একটি কাগজ এগিয়ে দিলো সাইর ঠাকুরের দিকে। "শ্যামলের কোষ্ঠিটা একবার দেখুন তো।"

"এটা শ্যামলের কোষ্ঠি? বেশ ভালো কোষ্ঠি। বৃশ্চিকলগ্ন, বৃষরাশি, সপ্তমে চাঁদ তুঙ্গি, সপ্তমপতি শুক্র সপ্তমে চন্দ্রযুক্ত, অত্যন্ত শুভ। ভাগ্যবতী

পত্নী লাভ। কর্মস্থান···ম্···শুভ। ভাগ্যস্থান···ম্···শুভ। ভাব, হ্যাঁ, শুভ। সবই শুভ। বাবাজী আমার অত্যন্ত ভাগ্যবান পুরুষ।"

শ্যামল চুপচাপ তাকিয়ে দেখছিলো সাইর ঠাকুরকে। হঠাৎ তার রাগ জল হয়ে গেল। গাঁয়ের প্রত্যেকটি পরিবারের শুভাকাঙ্খী প্রৌঢ় ব্রাহ্মণ, বছরের প্রথমদিন বাড়ি বাড়ি গিয়ে সবাইকে আশ্বাস দিচ্ছে বছরটি ভালোই কাটবে এবার, আর তার নিজের ঘরে হয়তো আগামী কালের চালের সংস্থান নেই। মিশে আছে সবারই জীবনের সুখদুঃখের সঙ্গে আর সাধারণ কিষাণ মজুরের মতো স্বল্পাহারের ছাপ এরও চোখে মুখে, বুকের পাঁজরে। মমতায় মন ভরে গেল সাইর ঠাকুরের জন্যে।

বর্ষফল গণনা শেষ হবার পর সাইর ঠাকুর উঠে পড়লো। কুন্তলা মাসী তাঁর জন্যে নিয়ে এলো পুঁটলি বাঁধা লাড্ডু, মিষ্টি, ফল আর আট আনা দক্ষিণা।

পুঁটলি হাতে নিয়ে সাইর ঠাকুর শ্যামলকে বল্ল, "বাবাজী চলোনা আমার সঙ্গে, তোমার বামুনখুড়িকে দেখে আসবে। উনি তোমার মামারবাড়ির দেশের লোক। তোমায় দেখলে খুব খুসি হবেন। আর সেই সঙ্গে বচ্ছরকার দিনে দুটো লাড্ডু খেয়ে আসবে।"

"যাবো হাসি দি," শ্যামল জিজ্ঞেস করলো হাসি দিকে।

"হ্যাঁ, যাও না," হাসি দি বল্ল, আর ফেরার পথে দাদু ও বড়োমামীকে প্রণাম করে এসো।"

* * * * *

সাইর ঠাকুরের বাড়ি ভটচায পাড়ার একপ্রান্তে। একটি ছোটো মাটির কুটির, খড়ে ছাওয়া। ভটচায পাড়ায় অনেকগুলো বড়ো কোঠা উঠে গেছে। অবস্থা অনেকেরই ভালো, যজমানী করা ছেড়ে দিয়ে লেখাপড়া শিখে চাকরী বাকরী ব্যবসাপত্র করছে, জমিদারীও করেছে

দু'এ[illegible]ঘর।" অন্ন দু'একজন এখনো যজমানী করেই খায়। তাদের মধ্যে একজন সাইর ঠাকুর এবং তার অবস্থা সবচেয়ে খারাপ। তবু তার বাড়ি ঘর দোর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

সাইর ঠাকুরের পেছন পেছন শ্যামল তার ঘরে গিয়ে উঠলো। ঘরে উঠেই সাইর ঠাকুর হাঁক ছাড়লো, "বলি ও ছুটকি কোথায় গেলে তুমি? এসে দেখে যাও কে এসেছে," বলে শ্যামলের দিকে ফিরে একগাল হেসে বল্ল, "আমার বৌকে আমি আদর করে ছুটকি ডাকি। বৌটি দ্বিতীয় পক্ষ, বুঝলে বাবাজী, তাই বড়ো ইয়ে করে আমাকে। হেঃ হেঃ, তোমায় কি বলবো বাবাজী, তুমি এখনো ছেলেমানুষ। তুমি একটু বোসো এখানে, দেখে আসি কোথায় গেল, একটু চোখের আড়াল করলাম তো পাড়া চরতে বেরিয়ে গেল।"

সাইর ঠাকুর বলে যেতে শ্যামল ঘরের চারদিক তাকিয়ে দেখলো।

এক কোনে একটি তক্তপোষ, তার উপর একটি জীর্ণ পাটি বিছানো। দেওয়ালে একটি ছোটো শেল্‌ফ্ ঝোলানো। সেখানে খান কয়েক পুঁথি একটি কৃত্তিবাসী রামায়ণ আর একটি মলাট ছেঁড়া পুরোহিত-দর্পণ। দেখবার যা কিছু চার পাশের দেওয়ালে, কার্পেটে কাজ করা কুকুর বেড়াল, শিবলিঙ্গ, কালী, ফুলপাতা, আর কিছু নানারঙের ফুলপাতার বর্ডার দেওয়া নীতিবাক্য। কোনোটায় লেখা—ঈশ্বর তোমার ঠাঁই আমার মিনতি। পতির চরণে যেন থাকে সদামতি। কোনোটিতে লেখা—পতি পরম গুরু। আরেকটিতে—সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে।

"তোমার বামুন খুড়ির হাতের কাজগুলো দেখছো বুঝি?" পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে সাইর ঠাকুর বল্ল। "সারাদিন ওই নিয়ে আছে। আমি বুড়ো মানুষ, সারাদিন ঘুরে ঘুরে দু'বেলার চাল ডাল জোগাড় করে আনছি. আমার একটু যত্ন আত্তি করুক, তা' নয়,

সারাদিন কার্পেট বোনা সেলাই করা নিয়েই আছে। [illegible] [illegible] [illegible]রে লিখে বাঁধিয়ে রাখা হয়েছে "পতির চরণে যেন থাকে সদা মতি।" আমাকে পরম গুরু বলে মানলে আমার ভাবনা ছিলো না। ওর মুখের বাক্যবানে জর্জরিত হয়ে ওকেই গুরু মানতে হয়েছে আমায়। সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে! ওরেব্বাপরে বাপ। তা হলে তো কথাই ছিলো না। কী সুখের সংসার আমার—। কই হে এদিকে এসো। আরে এসোই না। প্রিয়গোপালের ছেলেকে আবার লজ্জা কিসের। এসো—।"

আধময়লা রাঙাপাড় শাড়ির ঘোমটা টেনে একটি ছোটো খাটো কুড়ি একুশ বছরের শ্যামলা-বৌ দরজার পাশে এসে দাঁড়ালো।

"আরে, আবার অতোবড়ো একটা ঘোমটা টানলে কেন? খোলো, ঘোমটাটি খোলো", বল্ল সাইর ঠাকুর।

কোনো সাড়া এলো না অন্য তরফ থেকে।

শ্যামল একটু হাসলো। বল্ল, "এক গ্লাস জল খাওয়ান কাকীমা, বড্ড তেষ্টা পেয়েছে।" তারপর নিজের মনেই বল্ল, "এই মাত্র চা খেয়ে এলাম, তবু মেয়ের বাড়ি আসতে না আসতেই জল তেষ্টা পেয়ে গেল।"

সাইর ঠাকুরের বৌ সরে গেল দরজার আড়াল থেকে।

"মেয়ের বাড়ি?" সাইর ঠাকুর একটু অবাক হয়ে তাকালো শ্যামলের দিকে। "ও। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তা' তো বটেই।" বলে হাসলো।

একগ্লাস জল নিয়ে যখন ফিরে এলো সাইর ঠাকুরের বৌ তখন তার ঘোমটা কপাল অবধি উঠে এসেছে। শ্যামল তাকিয়ে দেখলো। দেখতে ভালো নয়, কিন্তু ভারী ছেলেমানুষ দেখতে, চোখ দুটি বাড়ির পেছনের ছায়াঘেরা তালপুকুরের মতো।

"শুধু জল দিলে," সাইর ঠাকুর বল্ল।

"খাবার নিয়ে আসছি একটু পরে। বড্ড তেষ্টা পেয়েছে বলছেন, তাই জল এনে দিলাম," খুব নম্র নরম প্রায় চুপিসাড় কণ্ঠে বৌটি বল্ল।

"না, না, অতো কষ্ট করবেন না। আমি আর কিছু খাবো না," বল্ল শ্যামল।

"মেয়ের বাড়ি এলে দুটো মিষ্টি খেয়ে যেতে হয় বাবা," মুচকি হেসে বল্লে সাইর ঠাকুরের বৌ।

কোনো কথা জোগালো না শ্যামলের মুখে। সাইর ঠাকুর হেসে ফেল্ল। বল্ল, "তোমার বামুনখুড়ির সঙ্গে কথায় পেরে উঠবে না বাবাজী। সে চেষ্টা কোরো না। যা' দেয়, বিষ হলেও চুপচাপ খেয়ে নাও। ওর কথার মধুতে নিমপাতার তেতোস্বাদও জিভে লাগে না। তা নইলে আমার মতো লোক দ্বিতীয়বার—"

কথার মাঝখানেই বৌটি বল্ল, "ছেলের সামনে ওসব কি কথা?" বল্ল খুব আস্তে নরম গলায়। কিন্তু সাইর ঠাকুরের মুখ বন্ধ হয়ে গেল। সাইর ঠাকুরের মতো বুদ্ধিমান লোককেও অত্যন্ত বোকা বোকা দেখালো।

বৌটি ছাতুর লাড়ু আর নারকোলের চিঁড়ে এনে দিলো আর দিলো একবাটি চা।

তারপর বল্ল, "আপনি ওঁর সঙ্গে বসুন। আমি এবার রান্না করিগে। আজতো আপনার সঙ্গে কোনো কথা হোলো না। একদিন দুপুর বেলা আসুন। হাসি পিসীকেও নিয়ে আসবেন। উনিতো আসেন নি অনেক দিন। আমি যাই তাহলে—।"

চলে গেল সাইর ঠাকুরের বৌ।

সাইর ঠাকুর তাকিয়ে রইলো তার যাওয়ার পথের দিকে, তারপর বল্ল, "ওর লজ্জা দু'মিনিটের, তারপর আপন করে নেয় সবাইকে। পাড়ার

অন্য বৌ ছেলেরা মাধুবৌদির জন্যে পাগল।" একটু চুপ করে থেকে বল্ল, "জানো বাবাজী, তোমাকে বলতে লজ্জা নেই, তোমার বামুনখুড়িই আমায় খাইয়ে পরিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে। নইলে কবে উপোষ করে মরতাম। লেখাপড়া বেশী কিছু করিনি, অন্য কোনো কাজ করবার সামর্থ্য নেই, যজমানী করে খাই। এক সময় তাতেই মোটা ভাত মোটা কাপড় জুটে যেতো। কিন্তু যুদ্ধ বাধবার পর কী যে হয়েছে। লোকের বাড়ি যে সকাল সন্ধ্যে পূজো করে আসি, কেউ আর আজকাল পাওনা ভোগের চালটা দেয় না, দেয় দুটি করে পয়সা। তাতে কি আর চলে বাবাজী? তোমার বামুনখুড়ি বড়ো ভালো সেলাই করে। লোকের বাড়ি সেলাই বেচে, ডালের বড়ি বেচেইতো সে গতবার দুর্ভিক্ষের সময় কোনো রকমে চালিয়েছে। আমি পুরুষমানুষ, আমি কিছু করতে পারি নি। দুদিনে লোকের খাওয়া জোটে না, পূজোপার্বণে কে পয়সা নষ্ট করতে পারে বলো। সম্প্রতি লাতুরী ওকে নিয়ে ওর স্কুলে সেলাইয়ের মাষ্টার করেছে। তা'তে মাস গেলে পোনেরোটা টাকা ঘরে আসে। ওই তো সম্বল বাবাজী। অথচ ওকে যখন বিয়ে করেছিলাম, তখন এই ভেবেই করেছিলাম যে দীনদরিদ্র বামুনের মেয়ে, তার বিয়ে দিতে পারছেনা বুড়ি মা, সেই বুড়ি যখন মরলো, কেবা ওর বিয়ে দেবে, কে ওকে দেখবে, কার হাতে গিয়ে পড়বে, তাই না হয় আমার ঘরেই আনলাম। দু'মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে, আর কেউ নেই বাড়িতে। প্রথম পক্ষ তো অনেকদিন আগেই গেছে। তিনটে মেয়ে থাকলে আমায় পুষতে হোতো না? না হয় সে জায়গায় এমেয়েটিকে পুষলাম। তখন বাড়ির অবস্থাও মোটামুটি স্বচ্ছল ছিলো, ধান ছিলো, গোরু ছিলো, পুকুর ছিলো। এখন সবই গেছে। কোথায় এক নিরাশ্রয় মেয়েকে পুষবো বলে করুণা করে বিয়ে করে বাড়ি আনলাম, এখন আমার মতো

অভাগাকে এমেয়েটিই পুষছে। একেই বলে ভাগ্যের পরিহাস, কি বলো বাবাজি !"

শ্যামল চুপ করে শুনলো। তারপর জিজ্ঞেস করলো, "আমাদের বাড়ি আপনার দিন এক সের চাল বরাদ্দ আছে না?"

একটা শুকনো হাসি হাসলো সাইর ঠাকুর। বল্ল, "ছিলো তো। কিন্তু যেদিন তোমার জ্যাঠতুতো ভাই শঙ্খকুমারের হাতে বাড়ির সব ব্যাপারের ভার গেছে সেদিন থেকে চাল দেওয়া বন্ধ হয়েছে। তার বদলে আমাকে দেওয়া হয় দিন এক আনা দক্ষিণা। কাকে আর কি বলবো বাবা। বুড়োকর্তার কথার জোর থাকলে আমার ওই পাওনা চাল কেউ আটকাতে পারতো না। কিন্তু ওঁর কথাতো কেউ শোনে না।"

"আমরা তো বোধ হয় এখনো কিছু ধান পাই," শ্যামল বল্ল।

"কিছু ধান? কি বলছো হে? তোমরা এখনো প্রচুর ধান পাও। আর কেউ না জানুক, আমি তো জানি। প্রত্যেক বছর কম করে তিন চার হাজার আড়ি ধান ওঠে তোমার বাড়ির গোলায়। অথচ আমার দিন এক সের চালের ব্যবস্থা হয় না। আচ্ছা, একসের না দিক আধ সের দিক। কোনো কথা কানেই তোলে না শঙ্খবাবাজী। কিছু বল্লে চড়া চড়া কথা বলে। আর বেশী বলতে লজ্জা করে বাবাজী, ওকে সেই এতটুকু থেকে দেখছি—"

"এত ধান যায় কোথায়?" শ্যামল জিজ্ঞেস করলো।

"কি জানি বাবা কোথায় যায়," সাইর ঠাকুর বল্ল, "শঙ্খই জানে আর গরীবের ভগবানই জানেন। যুদ্ধের বাজারে চাল কোথায় যায় কেউ জানে না। শুধু জানে যে চাল আমাদের মতো গরীবের পেটে যায় না।" একটু চুপ করে থেকে বল্ল, "তুমি আসায় একটু ভরসা পেয়েছিলাম বাবা, কিন্তু এখন তো শুনছি ওবাড়িতে তুমি আমাদের চেয়েও পর।"

"হ্যাঁ, সাইর কাকা, আমার কোনো হাত নেই ওবাড়ীর ব্যাপারে," শ্যামল বল্ল।

"তোমায় একটা কথা বলি বাবা, কেউ জানে না একথা। কাউকে বোলো না যে আমি বলেছি তোমায়। আমি পূজো করতে যাই দুবেলা, তাই বহু বাড়ির কথাই আমার কানে আসে। আগে বুড়ো গোপাল সেন প্রায়ই ভূপতির বাড়ি যেতেন না তোমার সঙ্গে দেখা করতে? এখন যান না কেন জানো?"

"শরীর খারাপ শুনছি—।"

"ওসব কিছু না। আগে যাওয়ার সময় বাড়ির আম নয় কাঁঠাল নয় কলা বা তরিতরকারী একটা না একটা কিছু সঙ্গে নিয়ে যেতেন তো। একদিন বড় বৌ বল্লে, ছেলেটা এবাড়ি থাকে না, থাকে অন্য জায়গায়, আমাদের আপনজন মনে করে না, ওর কি অধিকার আছে বাড়ির জিনিষ ভোগ করবার। এবাড়ির কোনো ফল বা তরকারী ওকে দেওয়া হবে না। বড়বৌএর কথার উপর কথা বলার কেউ নেই। সেদিন থেকে বুড়ো আর বাড়ি থেকে বেরোয় না। বুড়ো গোপাল সেন কি করে খালি হাতে নাতির কাছে যায় বলো?"

"এই ব্যাপার?"

"হ্যাঁ," বল্ল সাইর ঠাকুর, "আর আমি জানি বড় বৌকে এবুদ্ধি দিয়েছে শম্ভুবাবাজী।"

শ্যামল কোনো উত্তর দিলো না।

সাইর ঠাকুর বল্ল, "তুমি চুপ করে সব সয়ে থাকবে কেন বাবা, বাড়ি তো তোমারও বটে। গোপাল সেনের নগদ টাকাপয়সা আর শহরের ব্যবসা সবই এখন ট্রাষ্ট, কিন্তু বাড়িটি আর খাস ধানজমি যা কিছু আছে সবতো তোমাদের যৌথ সম্পত্তি। তুমি

এসে তোমার ভাগ দাবী করো বাবাজী, তা'হলে আমাদেরও হিল্লে হয়।"

শ্যামল হাসলো। বল্ল, "দেখুন, দাদুর বর্তমানে বাবা মারা গেছেন। সুতরাং দাদু নিজের থেকে না দিলে আমার পাওয়ার কোনো অধিকার নেই। আর আমি চাইবো না। দিলেও নেবো না। কিন্তু আপনাদেরও তো একটা ব্যবস্থা করতে হয়। লাতুরীকে বলুন না, ও শঙ্খদাকে বলে কয়ে যদি কোনো ব্যবস্থা করতে পারে।"

"ও চেষ্টা করেছে, কোনো ফল হয়নি। শঙ্খ বুঝিয়েছে যে ধান খুব কমই ওঠে, এবং গতবছর অনেক ধান চুরি হয়ে গেছে। শুধু বলেছে দিন ফিরলে চালের বরাদ্দ আবার করে দেবে। তবে আমি জানি ওসব বাজে কথা।"

"লাতুরী ওর কথা বিশ্বাস করেছে?"

"হয়তো করেনি, কিন্তু কি করবার আছে। তাইতো লাতুরী তোমার বামুন খুড়িকে স্কুলে নিয়ে চাকরী দিয়েছে। আর বলেছে, কিছুদিন যাক। তারপর একটা কিছু ব্যবস্থা করে দেবো। আমি জানি সে কি ভাবছে। সে ভাবছে, আগে বিয়েটা হয়ে যাক শঙ্খর সঙ্গে, তারপর সংসারের ভার নিজের হাতে এলে সংসারের সুখের দিনগুলো আবার ফিরিয়ে আনবে। কিন্তু বোকা মেয়েটা শঙ্খকেও চেনে না, শঙ্খর মাকেও চেনে না।"

"বোকা মেয়ে?"

"বোকা না তো কি? ওরকমভাবে কোনোদিন মানুষকে ভালো-বাসতে আছে? অতো ভালোবাসলে মানুষ বোকা হয়ে যায়। এই আমাকে দেখ না, কিরকম বোকা বনে বসে আছি দ্বিতীয়পক্ষটিকে ঘরে আনবার পর।"

শ্যামলের ঠোঁটের কোণে চাপা হাসির বিদ্যুৎ খেলে গেল।

"জানো, শঙ্খকুমার লোকটি ভালো নয়," সাইর ঠাকুর বলে চল্ল। "তোমায় আজ আমি এখানে ডেকে এনেছি অনেক কথা বলবো বলে যেগুলো তোমার জানা প্রয়োজন। শঙ্খ এককালে বেশ ভালো ছেলে ছিলো। কিন্তু ও নষ্ট হয়ে গেছে দুটি লোকের জন্যে, একজন হোলো ওর মা আর আরেকজন জমিদার প্রসাদ চৌধুরী। প্রসাদবাবু ওর মায়ের দূর সম্পর্কের ভাই হয়, আর হ্যাঁ, দাদুর কাকা। হয় সে আপন কাকা দেখতো বাবা, দাদুর কাকার এত পয়সা আর দাদু মামার বাড়িতে আশ্রিত হয়ে পড়ে আছে। শঙ্খকুমার বিশেষভাবে নষ্ট হোলো যুদ্ধ বাধবার পর। আগে ওর মধ্যে যেটুকু মনুষ্যত্ব ছিলো, এখন তাও গেছে।"

"কি রকম ?"

"নষ্ট হওয়ার কি আর রকমফের আছে বাবাজী ? তোমাদের বাড়ির এত ধান সব দেখাশোনার ভার শঙ্খকুমারের হাতে। আর কোথায় যায় সে ধান কেউ জানে না। দাতব্য চিকিৎসালয় দেখাশোনা করে শঙ্খকুমার। তার যতো সব দামী ওষুধপত্তর কোথায় যাচ্ছে হিসেব নিকেশ নেই। রোগীদের জোটে শুধু সস্তা মিক্সচার, দেখে মনে হয় রঙগোলা জল।"

"আপনার কি ধারণা এসব ব্যাপারে শঙ্খদার হাত আছে ?" শ্যামল জিজ্ঞেস করলো।

সাইর ঠাকুর হাসলো। বল্ল, "সেইতো ডিসপেনসারি কমিটির সেক্রেটারী। সব কিছু তার অজান্তে হচ্ছে একথা কি করে বিশ্বাস করি বাবাজী।"

"কিন্তু লাতুরী বলছিলো—"

"লাতুরী অনেক কিছুই জানেনা। ওর ধারণা জাল ওষুধের কারবারের পেছনে আছে প্রসাদ চৌধুরী আর তোমাদের বাড়ির ধান

চোরাবাজারে পাচার করবার ব্যাপারে শঙ্খর মা। প্রসাদ চৌধুরীকে সন্দেহ করলেও শঙ্খকুমার কিছু বলতে পারে না চক্ষু লজ্জার খাতিরে, কারণ উনি সম্পর্কে ওর মামা। আর মা'কে কিছু বলতে পারে না কারণ মা খুব কড়া মেজাজের লোক, ছেলে ওঁর হাতের মুঠোর মধ্যে। শঙ্খের এ' ধরণের দুর্বলতা লাতুরী অবশ্যি পছন্দ করে না, কিন্তু সে এ আশায় বসে আছে যে একবার বিয়েটা হয়ে গেলে শঙ্খকে ওদের প্রভাব থেকে বার করে আনা যাবে। বুঝলে বাবাজী, শঙ্খ খুব বুদ্ধিমান ছেলে। সে জানে যে লাতুরী ওকে খুব ভালোবাসে। সে এর সুযোগ নেয় ষোলো আনা।"

"কিন্তু শঙ্খদা শুনেছি এককালে বেশ ভালোমানুষ ছিলো—।"

"দেখ বাবাজী, যে ছেলে অল্প বয়েস থেকে ফুটবল টিমের ক্যাপ্টেন হওয়ার চেষ্টা করে, পাড়ার ক্লাবের সেক্রেটারী হওয়ার চেষ্টা করে নিজের বাড়ির আভিজাত্যের সুযোগ নিয়ে, যে পল্লী অঞ্চলে এসে লোক দেখানো বিনে পয়সার চিকিৎসা করে লোকের উপকার করবার জন্যে নয়, জিলা বোর্ডে এবং ভবিষ্যতে এসেমব্লিতে দাঁড়াবার জন্যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে, যার রাজনীতি করবার ইচ্ছে দেশের সাধারণ লোকের ভালো করবার জন্যে নয়, শুধু নিজের উচ্চাভিলাষ আর ক্ষমতাপ্রিয়তা চরিতার্থ করবার জন্যে, তাকে কি করে ভালো মানুষ বলি বলো? হ্যাঁ, কথায়বার্তায়, আচার ব্যবহারে তার বেশ একটা ভালোমানুষি আছে। কিন্তু এ না হলে কি চলে? পেশাদারী রাজনীতিতে এই তো মূলধন বাবা। ভালোমানুষ হলে কি সে আমার মতো এক গরীব বামুনের পুজোর চালের বরাদ্দটা বন্ধ করতো কখনো? কিন্তু তার বাইরের ব্যবহারে লোক গলে যায়, তার বিনে পয়সার ডাক্তারীতে লোক ধন্যধন্য করে, তার পল্লীমঙ্গল সমিতি, স্কুল

আর দাতব্য চিকিৎসালয় নিয়ে পড়ে থাকায় লোকে মুগ্ধ হয়, তাকে ভালো মানুষ মনে করে। এককালে তো সে তরুণ কর্মীদের সঙ্গে খুব মাখামাখি করেছিলো, কিন্তু তাদের ভাবগতিক তার সুবিধে লাগেনি বলে আস্তে আস্তে সরে গেছে। লাতুরী তাকে ভালোবাসে, সে চেনে ছেলেবেলার শঙ্খকে, শঙ্খ তার চোখে কোনো দিনই বড়ো হয়না, তার পরিবর্তন সে স্পষ্ট বোঝে না, ধরতেও পারে না।"

লাতুরীর কথাগুলো শ্যামলের মনে পড়লো। কিছু বল্ল না।

"শঙ্খ আগে যা করছিলো শুধু ওসব নিয়েই যদি পড়ে থাকতো," সাইর ঠাকুর বলে বল্ল, "তাতে উপস্থিত কারো কিছু আসতো যেতো না, কারণ কে জিলা বোর্ডে গেল না গেল, এসেমব্লিতে নির্বাচিত হোলো না হোলো তাতে গাঁয়ের চাষাভুষোদের মাথাব্যথা নেই, কারণ ওদের ভোট নেই। কিন্তু উপস্থিত সে যা সুরু করেছে এতে আমাদের মতো গরীব লোকদের দুর্ভাবনা যথেষ্ট। কারণ ওষুধপত্র আর ধানচালের সমস্যা আমাদের বাঁচামরার সমস্যা। শঙ্খকে এ পথে এনেছে প্রসাদ চৌধুরী আর ওর মা।"

শ্যামল সাইর ঠাকুরের কাছ থেকে শুনলো সে ইতিহাস।

প্রসাদ চৌধুরীর অবস্থা আগে ভালো ছিলো না। সহরে একটি ছোটো ব্যাঙ্কে চাকরী করতো। তার বরাত খুলে গেল উনিশশো তিরিশে, বিপ্লবী আন্দোলনের সময়। বিপ্লবী নেতা বিলাস চৌধুরীর তখন সবে মাত্র ফাঁসি হয়েছে। তার স্ত্রী কুন্তলা দাতুকে নিয়ে শ্বশুর বাড়ি ফিরে এলো। প্রসাদ চৌধুরী এবং তার স্ত্রী ভূতি খুব খুশি হোলো না কুন্তলাকে দেখে, কিন্তু তাকে তখন কোনো কথা বলার সাহস নেই, দেশের লোক বিলাস চৌধুরীর নামে চোখের জল ফেলে, কুন্তলাকে কেউ কিছু বল্লে ঠেঙিয়ে ঠাণ্ডা করে দেবে।

কুন্তলার কাছে বিপ্লবী ছেলেরা খুব যাওয়া আসা করতো। এটা পছন্দ করতো না প্রসাদ চৌধুরী। কবে তাকে নিয়ে পুলিশ টানাটানি স্বরু করে, "এই ভয়। কিন্তু একদিন ভূতির কাছে একটি খবর শুনে প্রসাদ চৌধুরীর মাথায় একটি মতলব খেলে গেল। ভূতিকে শিখিয়ে পড়িয়ে দিলো সে।

ভূতি গিয়ে কুন্তলাকে একদিন চুপি চুপি বল্ল, "উনি বলছেন শিগ্‌গিরই নাকি পুলিস এসে খানাতল্লাস করবে এ বাড়ি, তোমার সিন্দুকে পুটলি বাঁধা ওসব যা আছে ওঁকে রাখতে দাও।"

কুন্তলার মুখ দেখে বোঝা গেল যে বেশ ভয় পেয়েছে সে, তবু পুটলি বাঁধা জিনিষের অস্তিত্ব সে স্বীকার করতে চায়নি প্রথমটা। তাকে আরো কিছুক্ষণ বোঝানোর পর সে সিন্দুক খুলে পুটলিটা তুলে দিলো ভূতির হাতে। ভূতি সেটি নিয়ে গেল তার স্বামীর কাছে।

প্রসাদ চৌধুরী পুটলিটা খুলতে ভূতির চক্ষুস্থির। পুটলির ভিতর একরাশ সোণার গয়না।

বিপ্লবীদলের ফেরারী ছেলেরা মা ডাকতো কুন্তলাকে। নিজেদের দরকারে টাকাকড়ি সোণাদানা যা' কিছু সংগ্রহ করতো অনেক সময় রেখে যেতো কুন্তলার কাছে।

দিন তিন চার পর কুন্তলা এসে ভূতির কাছে পুটলিটি চাইলো। বল্ল, "একটি ছেলে এসেছে। তাকে ওসব দিয়ে দিতে হবে।"

ভূতি এসে প্রসাদ চৌধুরীকে বল্ল, "দিদি যে ওসব ফেরত চাইছে।"

"বেশ তো, দিয়ে এসো," প্রসাদ চৌধুরী বল্ল।

কিন্তু প্রাণে ধরে সেসব ফেরত দিতে চাইলো না ভূতি। বল্ল "থাকগে, দিয়ে কাজ নেই।"

"সর্বনাশ, ওকাজটি করতে যেও না," বল্ল প্রসাদ চৌধুরী, "ছেলেরা খুন করে ফেলবে।"

"কেন, আমরা বলবো আমরা কি জানি," ভূতি বল্ল, "আমাদের কেউ কিছু রাখতে দেয় নি। প্রমাণ তো নেই কিছু।"

"না, দিয়ে এসো গো।"

নিরুপায় ভূতি পুটলিটি ফেরতে দিয়ে এলো কুন্তলাকে। অন্ধকারে ছায়ার মতো যে ছেলেটি এসেছিলো, নিঃসাড় ছায়ার মতো সে বেরিয়ে চলে গেল পেছনের পুকুরের ওপারের বাঁশবনের আড়াল দিয়ে।

নিজের ঘরে ফিরে এসে গাল ফুলিয়ে বসে রইলো ভূতি। প্রসাদ চৌধুরী তখন এক গাল হেসে পকেট থেকে একটি সোনার বালা বার করে দেখালো।

"কোথায় পেলে?"

প্রসাদ চৌধুরী হেসে বল্ল পুটলিটি কুন্তলার কাছে ফেরত যাওয়ার সময় কিছু ওজন কমিয়ে গেছে।

"এবার বুঝলে, কেন ফেরত দিতে বল্লাম? ফেরত না দিলে কুন্তলা কিছু বলতে পারতো না হয় তো, কিন্তু বিশ্বাস করে আর কোনো দিন কিছু রাখতে দিতো না।"

"ওরা যদি খুলে দেখে গয়না কম আছে?"

"এসব ডাকাতির মাল, বা চাঁদা তুলে পাওয়া, অতো হিসেব রাখেনা কেউ," প্রসাদ চৌধুরী বল্ল।

তারপর থেকে প্রায়ই গয়না বা তাড়া তাড়া নগদ টাকা গচ্ছিত থাকতো প্রসাদ চৌধুরীর কাছে। তার হাত থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় ওজন কমিয়ে যেতো খানিকটা। ওদিকে কেউ সন্দেহ করলো না। এদিকে প্রসাদ চৌধুরীর ব্যাঙ্কের হিসেব ফুলতে সুরু করলো।

মাস ছয় সাত পর সোনার ডিম পাড়তো যে হাঁস, তাকে খতম করলো প্রসাদ চৌধুরীর বৌ ভূতিই।

সেদিন মাল ছিলো একটি ছোটো সুটকেস ভর্তি জড়োয়া গয়না। প্রসাদ চৌধুরী সুটকেসটি বার করে ভূতির হাতে দিতে ভূতির কিছুতেই ইচ্ছে হোলো না সেটি ফিরিয়ে দিতে। সুটকেসটি ভাঁড়ার ঘরে চালের জালার মধ্যে লুকিয়ে রান্নাঘরে গিয়ে চুপচাপ মাছ ভাজতে লাগলো সে।

একটু পরে কুন্তলা এসে বল্ল, "কই দিদি, ওটি এনে দিলে না?"

আকাশ থেকে পড়ার ভান করলো ভূতি। বল্ল, "কি বলছো তুমি। কি দিলাম না?"

"সে কি? সেই সুটকেসটি।"

"কোন সুটকেস?"

"তোমায় যেটি দিলাম সেদিন?"

"তুমি তো আমায় কোনো সুটকেস দাও নি।"

"কি বলছো দিদি?"

"তুমি আমায় কোনোদিন কোনো সুটকেস দাও নি।"

নিরুপায় কুন্তলা ফিরে এলো নিজের একতলার ঘরে। এসেই কেঁদে ফেল্ল।

"কাঁদছেন কেন মা?" যে ছেলেটি সুটকেস নিতে এসেছিলো সে জিজ্ঞেস করলো।

বল্ল কুন্তলা।

ছেলেটি একটু চুপ করে রইলো। তারপর বল্ল, "আচ্ছা, দেখি কি করা যায়।" বলে চলে গেল।

ফিরে এলো তারপর দিন অনেক রাত্তিরে। সঙ্গে আরো একজন। এসে বল্ল, "মা, আপনার জা'কে একবার ডাকুন তো।"

ভূতি আসতেই দুজনকে নিয়ে পাশাপাশি দাঁড় করালো দেয়ালের কাছে। ভূতি দেখলো একজনের হাতে একটি চকচকে পিস্তল। অন্য-জনের হাতে গোল কালো মতো কি একটা যন্ত্র।

সে বল্ল, "দেখুন, আমরা স্থটকেস এর কাছে দিয়ে গেছি। ইনি বলছেন ইনি সেটি রাখতে দিয়েছিলেন আপনাকে, আপনি বলছেন সেটি আপনাকে দেওয়া হয়নি। কে সত্যি বলছেন আর কে মিথ্যে বলছেন জানিনা, তবে আপনাদের মধ্যে একজন কেউ নিশ্চয়ই মিছে কথা বলছেন। যাই হোক, ঠিক তিন মিনিট সময় দিচ্ছি, স্থটকেস যাঁর কাছেই থাক, বার করে এনে দিন, তা নইলে, হাতে এটা কি দেখছেন তো? এই বোমা মেরে আপনাদের দুজনকেই শেষ করে ফেলবো।"

কুন্তলা শুনে একটু ম্লান হাসি হাসলো।

কিন্তু ভূতির মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে ততক্ষণে। কাঁপতে কাঁপতে গিয়ে চালের জালার ভিতর থেকে স্থটকেসটি বার করে আনলো।

যাওয়ার সময় কুন্তলাকে প্রণাম করে চলে গেল ছেলেদুটি।

ভূতির মুখে ব্যাপারটি শুনে ভূতির চোদ্দপুরুষ তুলে গাল দিয়ে সহরে পালালো প্রসাদ চৌধুরী। বছর খানেকের মধ্যে আর গাঁ মুখো হোলো না।

দাতুকে নিয়ে কুন্তলা ও বাপের বাড়ি ফিরে এলো।

বছর খানেক পর প্রসাদ চৌধুরী যখন দেশে ফিরলো তখন তার অবস্থা ফিরে গেছে। লোকে জানলো ব্যবসা করে বরাত ফিরিয়ে ফেলেছে সে। ব্যাঙ্কের কর্মচারী আর নেই। সে তখন ব্যাঙ্কের একজন ডিরেক্টার। দেশে এসে প্রসাদ চৌধুরী জমিদারী করলো, নতুন করে বাড়ি তুললো।

তারপর একদিন যুদ্ধ বাধলো। দিনের পর দিন আরো বেড়ে উঠলো প্রসাদ চৌধুরীর টাকা।

প্রসাদ চৌধুরী অকৃতজ্ঞ এ অপবাদ দিতে পারবে না কেউ। কুন্তলাকে এসে বল্ল, "আমার যা কিছু সবই তোমার আশীর্বাদে বৌদি। তুমি কেন বাপের বাড়ি পড়ে থাকবে দীনদরিদ্র অনাথের মতো? তুমি তোমার বাড়ি ফিরে এসে সংসারের ভার নাও।"

কিন্তু কুন্তলা এলো না। কোনো কথাই বল্ল না প্রসাদ চৌধুরীর সঙ্গে।

* * * * *

অত্যন্ত বিপদে পড়ে একদিন এ হেন লোক প্রসাদ চৌধুরীর শরণাপন্ন হতে হোলো শঙ্খকুমারের মা'কে।

বিপদটা শঙ্খকুমারকে উপলক্ষ্য করে।

শঙ্খকুমারের ছাত্রজীবন খুব বেশীদিন আগেকার কথা নয়। তখন সে পড়তো চাটগাঁ শহরের মেডিকেল স্কুলে। সে সময় লাতুরীর সঙ্গে তার যোগাযোগ অতো নিবিড় নয় ছেলেবেলার মতো। সদর হাসপাতালে মেট্রন ছিলো পতেঙ্গার এক তামাটে-গায়ের-রঙ মাঝবয়েসী ফিরিঙ্গী মেয়েছেলে। শঙ্খকে নিজের ছেলের মতো ভালোবাসতো সে। প্রায়ই বাড়ি নিয়ে গিয়ে চা খাওয়াতো। সেখানে আলাপ হোলো মেট্রনের মেয়ে আমেলিয়ার সঙ্গে। সেই আলাপে অন্তরঙ্গতার রঙ ধরলো কিছুদিনের মধ্যেই।

কিন্তু ফিরিঙ্গী মেয়ের জন্যে সমাজ, সংসার, নানারকম স্বপ্নে আশায় কামনায় রঙ ঝলমলো ভবিষ্যত, এসব পরিত্যাগ করে চলে আসবার ছেলে শঙ্খকুমার নয়। আমেলিয়ার সঙ্গে যে অন্তরঙ্গতা, তাকে সে ছাত্র-জীবনের সাময়িক ছেলেখেলার মতোই নিয়েছিলো। তাই পাশ করে

গাঁয়ে ফিরে এসে নানারকম কাজকর্মের মধ্যে যখন আবার লাতুরীর সঙ্গে তার যোগাযোগ নিবিড়তর হোলো, তখন আমেলিয়ার নেশা কাটিয়ে ওঠা তার পক্ষে শক্ত হোলো না মোটেও। লাতুরীকে বিয়ে করলে তার সামাজিক সুবিধে অনেক। তা'ছাড়া লাতুরীর জন্যে তার একটা সহজ ভালোবাসাও ছিলো।

একদিন সে লাতুরীকে জিজ্ঞেস করলো, "আমায় বিয়ে করবে লাতুরী ?"

লাতুরী বল্ল, "তোমার সঙ্গে আমার বিয়েতো কবে হয়ে গেছে শঙ্খদা—।"

শুনে প্রথমটা আকাশ থেকে পড়লো শঙ্খকুমার। তারপর মনে পড়লো আস্তে আস্তে।

তখন সে স্থির করলো, আর আমেলিয়ার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখবেনা সে। আমেলিয়ার সঙ্গে কোনোরকম যোগাযোগ রাখাই লাতুরীর উপর অবিচার করা হবে।

কিন্তু পরের বার যখন শহরে গেল, এ সঙ্কল্প অটুট রইলো না। আমেলিয়ার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে উসখুস করতে লাগলো তার মন। ভাবলো, নাঃ, যাই দেখা করে আসি। ওকে বলে আসি যে তার সঙ্গে জীবনে আর দেখা হবে না।

তার সঙ্গে দেখা হতে সেকথা ভুলে গেল, মনে পড়লো উঠে আসবার সময়। ভাবলো, এবার থাক, পরের বার এলে বলবো'খন।

মাসখানেক পর শহরে আসতে আরেকবার দেখা হোলো আমেলিয়ার সঙ্গে, তারপর আরেকবার, তারপর আরো কয়েকবার। বলি বলি করে বলা হয়ে উঠলো না।

তারপর একদিন বল্ল।

বল্ল, "আমার বিয়ের সময় তোমায় নেমন্তন্ন করলে তুমি যাবে আমাদের গাঁয়ের বাড়িতে ?"

আমেলিয়া প্রথমটা ভাবলো শঙ্খ ঠাট্টা করছে। তারপর বুঝলো।

বল্ল, "কাকে বিয়ে করছো ?"

"আমাদের গাঁয়ের একটি মেয়ে," শঙ্খকুমার বল্ল, "একেবারে গ্রাম্য নয়। শহরে থেকে পড়াশুনো করেছে। আই-এ পাশ। আলাপ হলে তোমার খুব ভালো লাগবে তাকে। বিয়েটা হোক, তারপর তোমার সঙ্গে ভাব করিয়ে দেবো।"

আমেলিয়া মুখ ফিরিয়ে বসেছিলো। শঙ্খের কথা শেষ হতে বল্ল, "আমায় আগে বলোনি কেন ?"

শঙ্খ দেখলো আমেলিয়ার চোখ জলে টলমল করছে।

শঙ্খ বল্ল, "আমি ভাবতে পারিনি তুমি আমাদের সহজ বন্ধুত্বকে অন্য কোনো চোখে দেখবে।"

"সহজ বন্ধুত্ব !" আমেলিয়ার মুখে চোখের জলে ভেজা বাঁকা হাসি ফুটে উঠলো।

শঙ্খ বল্ল, "আমেলিয়া, ভুল মানুষ মাত্রেই করে, তুমিও করেছো, আমিও করেছি। মনের দুর্বলতার ক্ষণিক ভুলগুলো ভুলে যাওয়াই ভালো।"

আমেলিয়া চুপ করে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর বল্ল, "তুমি চলে যাও, আর এসো না এখানে।"

মনটা খুব হাল্কা হয়ে গেলো শঙ্খকুমারের। ব্যাপারটার এত সহজ নিষ্পত্তি হবে সে ভাবতে পারে নি। দুপুর বেলা সিনেমা প্যালেসে সিনেমা দেখে, সন্ধ্যেবেলা এক বন্ধুর বাড়ী আড্ডা দিয়ে ফিরে এলো তার শহরের বাড়িতে। জোয়ার আসবে শেষ রাত্তিরে। খুব ভোরে

ভোরে উঠে চাকতাই যেতে হবে, সেখান থেকে নৌকো করে শ্রীপুর। ভাবলো, খাওয়া দাওয়া সেরে নিয়ে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়তে হবে। তা নইলে ওঠা যাবে না অতো ভোরে। তা ছাড়া মনে তখনো কি একটা যেন বিঁধছে। সে অনুভূতি কাটানোর জন্যে একটা দীর্ঘ নিদ্রা অত্যন্ত প্রয়োজন, তার ডাক্তারী বুদ্ধি বল্ল।

বাড়ি এসে দেখে আমেলিয়ার বাপ বসে আছে।

তাকে দেখেই চমকে উঠলো শঙ্খকুমার। এ লোকটার সঙ্গে তার খুব অন্তরঙ্গতা ছিলো না। লোকটা অত্যন্ত গুণ্ডা প্রকৃতির, একটা মদের দোকান চালাতো ফিরিঙ্গী বাজারে, আর অত্যন্ত মামলাবাজ।

আমেলিয়ার বাপের সঙ্গে আলোচনা কোন খাতে বইবে বুঝতে দেরী হোলো না শঙ্খকুমারের। সে একটু শঙ্কিত হয়ে উঠলো। তবু রক্ষে যে শহরের বাড়ীতে দু'চারজন চাকর বাকর ছাড়া অন্য লোকজন কেউ থাকে না। তা নইলে কেলেঙ্কারী হোতো। হঠাৎ মনে পড়লো যে সাইর ঠাকুর কি একটা কাজের উপলক্ষে শহরে এসে এবাড়িতে উঠেছে। খোঁজ নিয়ে জানলো যে সে শুয়ে আছে দু'তলার বারান্দায়।

শঙ্খ আমেলিয়ার বাপের সঙ্গে কথা আরম্ভ করলো ইংরেজীতে। কিন্তু আমেলিয়ার বাপ ইংরেজীর ধার দিয়ে গেল না। বাঙলা জানতো, সে ভাষাও মুখে আনলো না। আলাপ সুরু করলো একেবারে চাটগাঁর আঞ্চলিক ভাষায়, যে ভাষায় এদেশে বহু পুরুষ ধরে বসবাস করা গায়ের রঙ-কালো ফিরিঙ্গীদের দক্ষতা অন্য কারো চেয়ে কম নয়।

শঙ্খ থামতে সুরু করলো।

"আমি জানতে এসেছি তুমি আমার মেয়েকে বিয়ে করছো কবে।"

"দেখুন, আপনি আমায় ভুল বুঝবেন না। আমার অন্তত্র—"

"আমি জানতে চাই তুমি আমার মেয়েকে বিয়ে করবে কি করবে না।"

"আমার যে অন্য জায়গায় বিয়ের—"

"তুমি—আমার—মেয়েকে—বিয়ে—করবে—কি—করবে—না?"

"সে কি করে সম্ভব বলুন—"

"সম্ভব নয় মানে? আমেলিয়া তোমার ছেলে মা হতে চলেছে, আর তুমি বিয়ে করবে অন্য কাউকে? আমি সেটা হতে দেবো ভেবেছো?"

শঙ্খের মাথায় বজ্রাঘাত হোলো। হতভম্ব হয়ে বসে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর বল্ল, "দেখুন, আমি ডাক্তার মানুষ, আমেলিয়ার ইজ্জত বাঁচানোর অন্য উপায় করা আমার পক্ষে শক্ত নয়—।"

"বটে! ঘুষি মেরে প্রত্যেকটা দাঁত ফেলে দেবো। তুমি ওকে বিয়ে করবে, না আমাকে আদালতের সাহায্য নিতে হবে, কোনটা তুমি চাও বলো।"

শঙ্খের প্রচুর কাকুতি মিনতি আমেলিয়ার বাপর হৃদয় একটুও টলাতে পারলো না।

শেষ পর্যন্ত একটা আপোষের সর্ত পাড়লো আমেলিয়ার বাপ। তার টাকা চাই পাঁচ হাজার। দু'দিনের মধ্যে।

পাঁচ হাজার? কোথায় পাওয়া যাবে এত টাকা দু'দিনের মধ্যে?

"সে আমি জানি না," আমেলিয়ার বাপ বল্লে। আমি পরশু এখানে আসছি সন্ধ্যের পর। যদি টাকা পাই তো ভালো, তা নইলে সোজা উকিলের বাড়ি। তোমার আমেলিয়াকে লেখা চিঠিগুলো সবই আমার কাছে আছে, আর তা ছাড়া অন্যান্য প্রমাণও আছে। আমি চারদিক না গুছিয়ে কোনো কাজে হাত দিইনা সে তো তুমি জানো।

আমেলিয়ার বাপ চলে গেল। মাথায় হাত দিয়ে বসে রইলো শঙ্খকুমার। আদালতে কিছু প্রমাণ করা যাক বা না যাক সে জন্তে অতো দুর্ভাবনা ছিলো না শঙ্খকুমারের, যতোটা দুর্ভাবনা এ নিয়ে যে হৈ চৈ পড়ে যাবে সে সম্বন্ধে। একথা কানে উঠলে লাতুরী কোনোদিনই তাকে বিয়ে করবে না, আর দেশের সমাজে কোনো রকম প্রতিষ্ঠা পাওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠবে তার পক্ষে।

একটি বিনিদ্র রজনী বিছানায় ছটফট করে যাপন করলো শঙ্খকুমার। তারপরদিন ভোরে উঠে সোজা শ্রীপুর। পথে নৌকোয় বসে প্ল্যান ফাঁদলো শঙ্খ। টাকাটা মায়ের কাছ থেকেই আদায় করতে হবে।

দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর মায়ের কাছে আস্তে আস্তে কথাটা পাড়লো।

"মা, তুমি রাগ কোরো না আমার উপর। আমি একটি ফিরিঙ্গী মেয়ে বিয়ে করছি। বেশ ভালো মেয়ে। তোমার খুব পছন্দ হবে।"

শঙ্খকুমারের মা বিচলিত হয়ে উঠলো। "ওমা, সে কি কথারে? ফিরিঙ্গী মেয়ে বিয়ে করতে যাবি কোন দুঃখে। এরকম মতিভ্রম হোলো কেন তোর? সেনেদের বাড়ির ছেলে শেষ কালে বিয়ে করবে ফিরিঙ্গী মেয়ে? লোকে যে—"

"বিয়ে না করে উপায় নেই মা—।"

"উপায় নেই! কেন?"

শঙ্খ বল্ল। শুনে নিস্পন্দ হয়ে গেল শঙ্খকুমারের মা।

তারপর আস্তে আস্তে বল্ল, "তা হোক গে। বিয়ে করে কাজ নেই। টাকা দিয়ে যদি মিটমাট করা যায় তো তাই কর।"

"কিন্তু কোথায় পাবো অতো টাকা?"

"আমার গয়না কিছু বেচলে—"

"পাগল না মাথা খারাপ। তোমার গয়না নিয়ে বেচবার চেষ্টা করলে লোক জানাজানি হয়ে যাবে যে—।"

"তাহলে নগদ টাকা কোথায় পাবো ?"

অনেকক্ষণ ভেবে বল্ল, "আচ্ছা দেখা যাক কি করা যায়। তুই খাওয়া দাওয়া করে তো ঘুমো। আমি যা'হোক একটা ব্যবস্থা করছি।"

দুপুরটা ঘুমিয়ে বিকেলটা পাড়ায় এবাড়ি ওবাড়ি ঘুরে সন্ধ্যের পর বাড়ি ফিরে দেখে তার মায়ের ঘরে প্রসাদ চৌধুরী বসে আছে।

"আরে, প্রসাদ মামা, আপনি হঠাৎ কোত্থেকে ?"

"তোমার মা খবর পাঠিয়ে ডেকে আনলো। তারপর বাবাজি, তোমার কাছ থেকে এতো আমি আশা করিনি—।"

পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বলে গেল শঙ্খকুমারের। মা শেষ পর্যন্ত টাকা চাইতে গেছে প্রসাদ চৌধুরীর কাছে, আর টাকা চাইতে গিয়ে ব্যাপারটা বলে ফেলেছে ? যাক, উপস্থিত চুপ করে থাকতে হোলো, কারণ মা কেন প্রসাদ চৌধুরীর শরণাপন্ন হয়েছে বুঝতে পারলো। প্রসাদ চৌধুরী ছাড়া এ তল্লাটে আর কেউ নেই যে এসময়ে রাতারাতি নগদ পাঁচ হাজার টাকা বার করে দিতে পারে।

প্রসাদ চৌধুরী বল্ল, "তুমি আমার ভাগ্নে, তুমি বিপদে পড়েছো, তোমাকে বাঁচানো আমার কর্তব্য। টাকা আমি দিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু টাকাটা শোধ করবার একটা ব্যবস্থা করতে হবে তো—।"

"সামনের অঘ্রাণে যে ধান উঠবে—"

"তদ্দিন অপেক্ষা করবার সময় আমার নেই বাবাজী।"

"তা'হলে—?"

"উপায় একটা আছে। কিন্তু তুমি কি রাজি হবে ?"

শঙ্খর তখন যা' অবস্থা, সে যে কোনো কিছুতেই রাজি।

আস্তে আস্তে প্রস্তাবটা পেশ করলো প্রসাদ চৌধুরী। ডিসপেন্সারিতে হাজার তিনেক টাকার ওষুধ এসেছে, আর এসেছে নানারকম সার্জিক্যাল ড্রেসিং, এটা ওটা সেটা। এসেছে সোজা ম্যানুফ্যাকচারারের কাছ থেকে। বাইরের বাজারে পাওয়া যাচ্ছে না এসব জিনিষ। যাওবা পাওয়া যাচ্ছে, তার প্রচুর দাম—।

"বুঝলে বাবাজী, তা হলে এসব মাল চলে যাক বাইরের বাজারে, আর আমি ধীরে সুস্থে কিছু সস্তা মাল দিয়ে ষ্টকটা মিলিয়ে দি আস্তে ধীরে। কেউ কিছু জানতে পারবে না, আর আমাদের হাতেও দু'পয়সা আসবে—"

শঙ্খকুমার একটু শিউরে উঠলো।

"তোমায় কিছু করতে হবে না বাবা, তুমি শুধু মালঘরের চাবিটি আমায় দিয়ে দাও, আমি তার একটি নকল করিয়ে তোমায় সেটি আবার ফিরিয়ে দিচ্ছি। তুমি শুধু রোজকার হিসেব পত্তর কাগজে কলমে ঠিক রেখো।"

শঙ্খকুমার অনেকক্ষণ ভাবলো। তারপর মাকে জিজ্ঞেস করলো, "তুমি কি বলো মা ?"

"অন্য উপায় যখন নেই—।"

"বেশ। তবে একটা কথা। একাজ আমি এই একবারের মতোই করবো। ভবিষ্যতে আর কোনোদিন একাজ করতে বোলোনা আমায়।"

প্রসাদ চৌধুরী তাকিয়ে দেখলো শঙ্খকে। তারপর একটু হেসে বল্ল, "বেশ, তুমি যদি না চাও তো এই একবারই হবে, আর হবে না।"

তারপর টাকা নিয়ে শহরে চলে গেল শঙ্খকুমার। আমেলিয়ার বাপ এলো সন্ধ্যের পর। টাকাটা গুণে নিয়ে চলে গেল।

রাতটি কাটলো অত্যন্ত অস্বোয়াস্তিতে। এত কষ্ট করে জোগাড়

করা ওষুধগুলো চলে যাচ্ছে বাইরের কালোবাজারে, আর বদলে আসবে সস্তাদরের জিনিষ, অর্থাৎ ভেজাল। শঙ্খকুমারের মনে নানারকম দুশ্চিন্তার হুল ফুটতে লাগলো। অনেক ভেবে স্থির করলো যে আগামীবার যে ধান উঠবে, সে ধান বেচে যা টাকা পাওয়া যাবে তা' দিয়ে আবার খাঁটি ওষুধ কিনে ডিসপেনসারির ষ্টক মিলিয়ে দেবে সে, আর নষ্ট করে ফেলবে সমস্ত ভেজাল ওষুধ। গাঁয়ের গরীব চাষী মজুরদের সে ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছে, তাদের সে ভেজাল ওষুধ খাওয়াবে কোন মুখে।

ঘুম না হওয়া রাত কেটে গিয়ে সকাল হোলো। অনেক বেলায় বিছানা ছেড়ে উঠে মুখ ধুয়ে বাইরে এসে দেখে একটি অল্প বয়েসী ফিরিঙ্গী ছেলে বসে আছে। একটি চিঠি নিয়ে এসেছে শঙ্খের কাছে। চিঠি আমেলিয়ার মায়ের। শঙ্খকে ডেকে পাঠিয়েছেন।

শঙ্খ একবার ভাবলো, যাবো কি যাবো না। তারপর বেরিয়ে পড়লো ছেলেটির সঙ্গে।

আমেলিয়ার বাড়ি এসে দেখলো নিথর, চুপচাপ সবাই। আমেলিয়ার বাপ আর আরো দু'একজন চুপচাপ বসে আছে বাইরের ঘরে। শঙ্খকে দেখে চোখ ফিরিয়ে নিলো, কেউ কিছু বল্ল না। ছেলেটি শঙ্খকে নিয়ে এসে বসালো ভেতরের বারান্দায়।

আমেলিয়ার মা এলো। তাঁকে দেখে চমকে উঠলো শঙ্খকুমার। একি চেহারা হয়েছে আমেলিয়ার মায়ের! ফ্যাকাশে, পাংশু মুখ, এক ফোটা রক্ত নেই।

শঙ্খ উঠে দাঁড়ালো। কি বলবে ভেবে পেলো না।

আমেলিয়ার মা একটি নোটের তাড়া বার করে দিলো শঙ্খকে। আস্তে আস্তে বল্ল, "টাকাটা ফিরিয়ে দেওয়ার জন্যেই ডেকে পাঠিয়েছি তোমায়।" একটু চুপ করে থেকে বল্ল "উনি যে তোমার কাছে টাকা

চেয়েছেন সে কথা আমায় এসে বলো নি কেন? উনি কি ধরণের লোক তুমি তো জানো। কেন ওঁর কথা বিশ্বাস করলে? তুমি আমার ছেলের মতো। তুমি যাই করো না কেন, তোমায় কি আমি কোনোদিন বিপদে পড়তে দিতে পারি?"

শঙ্খের মুখে কোনো কথা এলো না।

চুপ করে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো আমেলিয়ার মা। তারপর খুব মৃদু গলায় বল্ল, "আমি ভিতরে যাই এবার। শরীর ভালো নেই।"

শঙ্খ আস্তে আস্তে এগুলো সিঁড়ির দিকে। মনে তার ঝড় উঠেছে তখন। সিঁড়ির কাছে গিয়ে থমকে দাঁড়ালো। ঝড় থেমে গেল হঠাৎ। মন স্থির করে নিলো শঙ্খকুমার। ফিরে দাঁড়ালো। দেখলো। আমেলিয়ার মা তখনো টেবিল ধরে দাঁড়িয়ে। তাকিয়ে আছেন তার দিকে। শঙ্খ ফিরে এলো।

বল্ল, "আমি একবার আমেলিয়ার সঙ্গে দেখা করতে চাই।"

"কেন?" অস্ফুট প্রশ্ন এলো আমেলিয়ার মায়ের কাছ থেকে।

"আমেলিয়াকে বলতে চাই যে আমি আর বাড়ি ফিরবো না", শঙ্খ আস্তে আস্তে বল্ল, "আর জিজ্ঞেস করতে চাই সে আমার বিয়ে করবে কিনা— ।"

উত্তর দিতে গিয়ে ঠোঁট দুটো কেঁপে গেল আমেলিয়ার মায়ের। কোনো রকমে বল্ল, "ও কাল আর্সেনিক খেয়েছে।"

তারপর কান্নায় ভেঙে পড়লো।

* * * * * *

ও বাড়ি থেকে শঙ্খ যখন বেরুলো তখন তার ডাইনে বাঁয়ে সামনে পেছনে ঘর বাড়ি পথ ঘাট সব দুলছে। সারা মন ফাঁকা, নিঝুম হয়ে গেছে।

কিছুক্ষণ এলোমেলো এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ালো।

তারপর একবার পকেটে হাত দিতেই টাকার নোট হাতে ঠেকলো।

টাকাটা? চট করে মনে পড়লো। থমকে দাঁড়িয়ে গেল। এখনো সময় আছে হয়তো। প্রসাদ চৌধুরীকে টাকাটা ফিরিয়ে দিলে ডিসপেনসারির ওষুধগুলো বাঁচানো যাবে।

আর দাঁড়ালো না সে। শহরের বাড়িতে আর ফিরলো না। সোজা চলে গেল চাকতাই। সেখান থেকে সাম্পান ভাড়া করে শ্রীপুর। খেয়াঘাট থেকে সোজা বাড়ি। বাড়ি ঢুকেই সোজা মায়ের ঘরে।

দেখলো প্রসাদ চৌধুরী বসে আছে।

তাকে দেখে প্রসাদ চৌধুরী হাসলো। বল্ল, "কী রে, তোর এরকম চেহারা হয়েছে কেন? সারারাত ঘুমোস নি না কি?"

শঙ্খ পকেট থেকে নোটের তাড়াটি বার করে গুঁজে দিলো প্রসাদ চৌধুরীর হাতে। বল্ল, "মালঘরের চাবিটা দিন।"

প্রসাদ চৌধুরী তাকালো শঙ্খের মায়ের দিকে। শঙ্খের মা তাকালো প্রসাদ চৌধুরীর দিকে।

প্রসাদ চৌধুরী বল্ল, "একটা ভালো খবর আছে বাবাজী। ও মাল কাল রাতারাতি চালিয়ে দিয়েছি। পরিষ্কার পাঁচ হাজার টাকা লাভ।"

"ওসব আমি শুনতে চাই না," শঙ্খ বল্ল, "আমার ডিসপেনসারির মাল আপনি যেখান থেকে হোক এনে দিন। ওসব জোচ্চুরীর মধ্যে আমি নেই।"

প্রসাদ চৌধুরী একটু গম্ভীর হয়ে গেল। তারপর বল্ল, "ফিরিঙ্গী মেয়েছেলেটার ব্যাপার আপোষে মিটে গেছে বুঝি? তাই এত মেজাজ। কিন্তু বাবাজী, কাল তোমার এই সাধুতা কোথায় ছিলো?"

শঙ্খের মুখে উত্তর এলো না।

প্রসাদ চৌধুরী বলে চল্ল "ওষুধ বেচে টাকা যা পাওয়া গেছে আমার দেওয়া টাকাটা কেটে নিয়ে বাদবাকি যা সব তোমার মাকেই দিয়েছি। আমি নিজের জন্যে তো এসব করিনি বাবাজী। পাঁচ দশ হাজার টাকা আমার কাছে কিছুই নয়। কিন্তু তুমি যে এখানে সেখানে গণ্ডগোল বাধাবে, তারপর সামান্য দু'চার হাজার টাকার জন্যে মাথা খুঁড়ে মরবে, সে তো আমি মামা হয়ে সইতে পারবো না। তাই তোমার একটা ব্যবস্থা করবার চেষ্টা করলাম। এ যদি তোমার ভালো না লাগে, তাহলে যা খুশি করো, আমি কোনো কিছুতে নেই, ডিসপেনসারির মাল কোথায় গেল, কি ভাবে গেল, সে সব যাকে বোঝাতে পারো বোঝাও, তুমি যে কিছুই জানো না, তাও যদি বোঝাতে পারো বোঝাও, আমি তোমায় বাধা দেবো না। কিন্তু ওষুধ তোমার হেপাজতে ছিলো। আমি যদি বলি সে সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না, কে তোমার কথা বিশ্বাস করবে বলো?"

শঙ্খ কিছু বলতে পারলো না।

শঙ্খের মা প্রসাদ চৌধুরীর হাত থেকে শঙ্খের দেওয়া টাকাটা নিয়ে নিলো। তারপর শঙ্খকে বল্ল, "অনেক বেলা হয়েছে, এখন স্নান করে এসে দুটো খেয়ে নে।"

শঙ্খ গামছা কাঁধে ফেলে স্নান করতে চলে গেল।

"সেই যে চোরা কারবারের মধ্যে শঙ্খ জড়িয়ে পড়লো," সাইর ঠাকুর বল্ল, "আর বেরুতে পারলো না তার নাগপাশ ছাড়িয়ে। এখন তাকে আমরা আর আমাদের আপনজন বলে ভাবতে পারি না কারণ তার পয়সা আমাদের মতো গরীবকে ভাতে মেরে, প্রাণে মেরে।

বলো তো বাবাজী, এরকম একটি ছেলের সঙ্গে লাতুরীর বিয়ে হবে সেটা আমরা কি করে সহ্য করি ?"

"লাতুরীকে বল্লেই পারেন," শঙ্খ বল্ল।

"তোমাকে দিয়েই বলাতে চাই শ্যামল, সেজন্যেই তোমায় ডেকে এনে এত কথা বল্লাম।"

"আমাকে দিয়ে বলাতে চান ?" শ্যামল একটু অবাক হোলো। "কেন ? আপনারা এসব ব্যাপারে ওয়াকিবহাল। আপনারা বল্লেই তো কথাটা বিশ্বাসযোগ্য হয় অনেক বেশী।"

সাইর ঠাকুর মাথা নাড়লো। বল্ল, "এর সঙ্গে আরো একটা ব্যাপার জড়িয়ে আছে। লাতুরীর মন থেকে শঙ্খকে সরিয়ে তার স্থান নিতে পারে এমন একজন কাউকে দরকার ছিলো।"

শ্যামল দু'তিন সেকেণ্ড তাকিয়ে রইলো সাইর ঠাকুরের দিকে। তারপর একটু হাসলো। বল্ল, "আপনি যা ভাবছেন সে হয় না সাইর কাকা।" একটু চুপ করে থেকে জিজ্ঞেস করলো, "এ ভুল ধারণা আপনার কি করে হোলো ?"

"ভুল কি নির্ভুল জানিনা," বল্ল সাইর ঠাকুর, "শঙ্খের সঙ্গে লাতুরীর বিয়ের কথা প্রথম যখন ওঠে তখন হাসি, ভূপতি, কুন্তলা এরা খুব খুশি হয়ে রাজি হয়েছিলো। কিন্তু সম্প্রতি শঙ্খের ব্যাপার-স্যাপার খানিকটা আঁচ করতে পেরে হাসি আর কুন্তলার মত বদলেছে। কিন্তু মুখে কিছু বলবার উপায় নেই, কারণ ভূপতি ব্যাপারটা দেখছে অভিভাবকের চোখ দিয়ে। শঙ্খের টাকা আছে। সুতরাং তার ধারণা শঙ্খই একমাত্র বাঞ্ছনীয় ছেলে। আরেকটি কারণ হোলো, ওরা লাতুরীর মনের খবরটি জানে। তাই তুমি আসতে হাসি, কুন্তলা এরা মনে একটু আশা পেলো। দিন দুয়েক আগে

আমায় ডেকে বল্ল তোমার সঙ্গে কথা বলে নিতে। আমার কাজ আমি করলাম। এর বেশী আর কিছু আমি জানিনা বাবাজী।"

শুনে চুপ করে রইলো শ্যামল। তারপর বল্ল, "আচ্ছা, আমি হাসি দি'র সঙ্গে কথা বলে নেবো।"

বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখলো সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। মনে পড়লো বাড়ি ফেরার আগে দাদুর সঙ্গে দেখা করে আসতে বলে দিয়েছে হাসি দি।

শ্যামল উঠে পড়লো।

* * * * * *

শ্যামল যখন বাড়ি ফিরলো তখন আটটা প্রায় বাজে। বাড়ির কাছাকাছি আসতে কানে এলো ঢাকের আওয়াজ আর গানের সুর। এসে দেখে উঠোনে ভীড় জমেছে আসেপাশের বাড়ির ছেলেবুড়োদের। দু'তলার বারান্দায় চিক খাটানো হয়েছে, তার আড়ালে মেয়েদের ভীড়, কেউ দাঁড়িয়ে, কেউবা বসে। পেয়ারা গাছের ডাল থেকে ঝুলছে পেট্রোমাক্স ল্যাম্প। উঠোনের একপাশে বসে ঢাক বাজাচ্ছে দুটি লোক, আর ঢাকের তালে তালে নেচে নেচে গান গাইছে আর দু'জন। একজন মুখে পাউডার মেখে, মাথায় পরচুলা এঁটে, খাটো শাড়ি আঁট করে পরে মেয়ে সেজেছে. অন্যজনের খালি গা, কালো কুচকুচে, ঘামে চিক চিক করছে, কাঁধে গামছা, হাতে কাস্তে। গানের প্রত্যেক কলির শেষে ধুয়ো ধরছে ঢাকী দু'জন।

"আয় পেঁচনীর বাপ,
নে জমিনের মাপ—
ডাইনে বাঁয়ে দিলেম মাপ,
সামনে আর পেছন আর
একোণ ওকোণ দিলেম মাপ—

হায়রে কপাল,

একটুখানি জমি,

বৃষ্টি নেই, ফসল নেই

শুকনো মরুভূমি।

চল পেঁচনীর বাপ—

জমিদারের চরণ ধরে

খাজনা করাই মাপ······”

অভ্যাগতদের দেখাশোনা করছিল হাসি দির বর ভূপতি মজুমদার। শ্যামলকে দেখে বল্ল,“আরে, তুমি এতক্ষণে এলে? এত দেরী হোলো কেন?”

“দাদুর ওখানে গিয়েছিলাম,” শ্যামল বল্ল, “এসব কি ব্যাপার?”

“এদেশে একে বলে ঢাকীর কাণ্ড। ওপাশে অনেক জায়গা আছে। ওখানে গিয়ে বসে পড়ো। এসব তো তোমার কাছে নতুন। গ্রাম্য হলেও মন্দ লাগবে না।”

“লাতুরী কোথায়?”

“আছে ওধারে কোথাও। এই তো দেখেছিলাম কিছুক্ষণ আগে।”

ভূপতি চলে গেল।

শ্যামল বসলো না। সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই শুনতে লাগলো।

“চল পেঁচনীর বাপ,

জমিদারের চরণ ধরে

খাজনা করাই মাপ—

জমিদারকে চিনিসনা তুই

ও পেঁচনীর মা,

পাওনা তার কক্ষনো সে

মাপ করবে না······”

চারদিকে তাকিয়ে দেখলো শ্যামল। লাতুরীকে দেখা গেলনা কোথাও। উপরে বারান্দার দিকে তাকালো। দেখলো একজোড়া চোখ দুটো চিকের মাঝখানটা ফাঁক করে তার দিকে তাকিয়ে আছে। মুখ তুলতেই চোখ দুটো সরে গেল।

"হায় পেঁচনীর বাপ তা'হলে
কি করি ভাই বল,
উপোস করে মরার আগে
দেশ ছেড়ে যাই চল......"

একবার পেছন ফিরে তাকাতেই চোখে পড়লো লাতুরী বসে আছে সবার দৃষ্টির আড়ালে ঠাকুর ঘরের ওপাশের দাওয়ায়। তার পাশে বসে গল্প করছে আরেকজন। শঙ্খকুমার। ওরা দেখতে পায়নি শ্যামলকে। শ্যামল চোখ ফিরিয়ে নিলো। একবার ভাবলো ওদিকে যাবে কিনা তারপর ভাবলো, না, এখন থাক।

"সে হবে না, সে হবে না,
ও পেঁচনীর মা,
এদেশ আমার, জমিন আমার
কিচ্ছু ছাড়বো না......"

আরেকবার পেছন ফিরে তাকালো শ্যামল। দেখলো শঙ্খ উঠে বাড়ির ভিতর চলে যাচ্ছে। লাতুরী একা বসে আছে।

শ্যামল এগিয়ে গেল সেদিকে।

"তুমি কখন ফিরলে," লাতুরী জিজ্ঞেস করলো।

"এই মিনিট দশ পনেরো—"

"ঢাকীর কাণ্ড কিরকম লাগছে?"

"মন্দ নয়, আমার কাছে এসব তো নতুন জিনিস। আগে কখনো দেখিনি।"

"দাদু কি বল্ল ?"

"বিশেষ কিছু নয়, এই আমরা সব কে কি রকম আছি, এটা, ওটা, সেটা। শোনো, তোমাকেই খুঁজছিলাম এতক্ষণ—"

"আমিও তোমায় খুঁজছিলাম—," লাতুরী মুখ টিপে হেসে বল্ল।

"কেন ?"

"আঁচ করোতো ?"

শ্যামল ভাবলো। কি হতে পারে ?

"তোমার বিয়ের সম্বন্ধ এসেছে ?"

"আমার ?" শ্যামল আকাশ থেকে পড়লো। "বিয়ের ? সেকি ? কোথায় ?"

"এবাড়িতে।"

"মানে ?"

"মানে, দাতুর সঙ্গে তোমার বিয়ের—"

"দাতুর সঙ্গে ?" শ্যামল গুম হয়ে গেল একটুখানি।

"কেন, দাতুকে তোমার পছন্দ হয় না," লাতুরী জিজ্ঞেস করলো। শ্যামল কোনো উত্তর দিলো না।

"এখনো সোজাসুজি কোনো কথা ওঠে নি," লাতুরী বল্ল, "দাদু, শঙ্খদা'র মা, এঁদের ইচ্ছে তোমার সঙ্গে দাতুর বিয়ে হোক। তাই শঙ্খদা আমায় জিজ্ঞেস করতে এসেছে, হাসি দি, কুন্তলা পিসী এদের কাছে কথাটা পাড়লে এঁরা রাজি হবেন কিনা। আমি তো শুনে খুব খুশি। আমি শঙ্খদাকে বল্লাম, তুমি হাসিদির কাছে কথাটা পেড়ে দেখ, ওঁরা নিশ্চয়ই রাজি হয়ে যাবেন, আর শ্যামলদার জন্যে ভাবতে হবে না, আমি শ্যামল-

দাকে রাজি করাতে পারবো। শঙ্খদা তাই হাসিদির কাছে গেল। ওঁরা যদি রাজি হন তা'হলে দাদু তোমার মায়ের কাছে লিখবেন আর শঙ্খদার মা কুন্তলা পিসীর কাছে এসে কথাটা পাড়বেন—"

শ্যামল ঘাড় নাড়লো।

"মানে?"

"বিয়ে টিয়ে ওসব এখন হবে না," শ্যামল বল্ল।

"দাতুকে তোমার পছন্দ হয় না?"

"দাতুকে পছন্দ অপছন্দের কথা হচ্ছে না, আসল কথা হোলো ওসব ব্যাপারের মধ্যে আমি এখন মাথা গলাতে পারবো না।"

"ও।" লাতুরীর মুখ ম্লান হয়ে গেল।

একটু চুপ করে থেকে শ্যামল বল্ল, "দাদু তো আমায় এসব কিছু বলেন নি। বল্লে সোজাসুজি ওঁকেই মানা করে দিতাম।"

লাতুরী কোনো উত্তর দিলো না।

শ্যামল বল্ল, "যাকগে। এখন আমি তোমায় যেজন্যে খুঁজছিলাম সেটা শোনো। তোমায় একটা কাজ করতে হবে।"

"কি কাজ।"

"শঙ্খদাকে একটা খবর দিতে হবে। কলকাতার এশিয়া কেমিক্যাল্‌স এ্যাণ্ড ফার্মাসিউটীক্যালস্‌এর নাম শুনছো? ওদের ম্যানেজিং ডিরেক্টরের ছেলে আমার বন্ধু। তাদের কাছ থেকে আমি কিছু ওষুধ আনাচ্ছি ডিসপেন্সারির জন্যে—"

"কি ওষুধ?"

"সামান্য কিছু ইনজেকশান,—ইনসুলিন, কোরামিন, এমেটিন, কুইনিন, মিল্ক আর ভিটামিন ইনজেকশান এবং কিছু কুইনিন পিল ও পাউডার আর ভিটামিন ট্যাবলেট। আজকাল তো

এসব পাওয়া যায় না সহজে। বন্ধুর সাহায্যে কিছু জোগাড় করা গেল—।"

"সত্যি ?" লাতুরীর ম্লান মুখ হঠাৎ খুশিতে ঝলমল করে উঠলো।

"তোমায় এখন শঙ্খদাকে জিজ্ঞেস করতে হবে যে ডিসপেন্সারিতে এসব আমি দান করলে কর্তৃপক্ষ সেটা গ্রহণ করবে কিনা—"

"করবে না কিরকম ? নিশ্চয়ই করবে—।"

"যাই হোক, শঙ্খদাকে তুমি একবার জিজ্ঞেস করে নিও! আমার উপর ওর যেরকম মনোভাব, তাতে আমার কাছ থেকে কিছু নিতে ওর আত্মসম্মানে না বাধলে হয়—।"

"তার জন্যে তুমি ভেবোনা। আমিও তো একজন কমিটি মেম্বার—"

"তবু তুমি শঙ্খদাকে একবার বোলো। হ্যাঁ, আরেকটা কথা, ওকে বলে দিয়ো, উপস্থিত খবরটা যেন কাউকে না দেয়। যেরকম ওষুধ চুরির হিড়িক পড়েছে তোমাদের ডিসপেন্সারিতে, আমি চাইনা যে এগুলোও তেমনি ভাবে বেহাত হয়ে যাক। কথাটা আপাততঃ যেন তুমি, আমি ও শঙ্খ ছাড়া আর কেউ জানতে না পারে—।"

লাতুরী ঘাড় নাড়লো।

"আরেকটি কাজ করতে হবে তোমায়। ভেতরে গিয়ে হাসি দিকে ডেকে বলে দাও আমার বিয়ের জন্যে যেন কেউ মাথা না ঘামায়।"

"তুমি গিয়ে বলো না—।"

"আমায় তো সোজাসুজি কেউ কিছু বলে নি—।"

এমন সময় গোলাম বাড়ির কানাই পুতুর মেয়ে লক্ষ্মী এলো সেখানে। শ্যামলকে বল্ল, "মা আপনাকে একবার ডাকছেন—।"

শ্যামল বাড়ির ভিতর এলো। লাতুরীও এলো সঙ্গে।

একতলার পেছন দিকের একটি ঘরে চৌকির উপর বসেছিলো শঙ্খ। একপাশে কুন্তলা। জানালার কাছে দাঁড়িয়ে ছিলো হাসি দি।

শঙ্খ বল্লে, "এই যে শ্যামল, এসো। তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে। মা বলছিলেন— ।"

"তুমি থামো, আমি বলছি," হাসিদি বল্ল, "আয় শ্যামল, এখানে এসে বোস,—"

"দেখ হাসিদি," শ্যামল বলতে সুরু করলো।

"শোন না আমি কি বলি," বল্ল হাসি দি, "বড়ো মামীমা শঙ্খকে পাঠিয়েছেন-আমায় বলতে যে উনি কুন্তলা পিসীর কাছে তোর সঙ্গে দাতুর বিয়ের কথা পাড়তে চান, আমার কি মতামত এ সম্বন্ধে। আমি বলেছি, আমার মত নেই এ বিয়েতে। কারণ তুই শহরের ছেলে, দু'দিনের জন্যে গাঁয়ে বেড়াতে এসেছিস, কিছুদিন না হয় এখানে কাঙ্গনগোপাড়ায় প্রফেসারি করবি, কিন্তু চিরকাল তো এখানে থাকবি না, দু'চার মাস পর কলকাতায় ফিরে যাবি। দাতু গাঁয়ের মেয়ে, তোদের সংসারে ঠিক খাপ খাওয়াতে পারবে না নিজেকে। যে ধরণের মেয়ে তোদের মতো ছেলের পছন্দ, দাতু ঠিক সে ধরণের মেয়ে নয়। তবে তুই যদি নিজের ইচ্ছায় বিয়ে করিস তো আমাদের কারো কোনো আপত্তি নেই। কুন্তলা পিসীরও এই মত। তুই কি বলিস ?"

শ্যামল কোনো উত্তর দিলো না।

"রাজি হয়ে যাও, শ্যামল দা," লাতুরী বল্ল, "দাতু মেয়েটি খুব ভালো, ওকে বিয়ে করে তুমি সুখী হবে।"

"আরেকটা কথা," শঙ্খ বল্ল, "তুমি যদি দাতুকে বিয়ে কর, তা'হলে, যদিও দাদু মেজো কাকাকে একরকম ত্যাজ্যপুত্র করেছেন, তবু আমাদের

সামান্য যা কিছু আছে তার কিছু যদি তোমায় দিতে চান, আমি বা মা, আমরা কোনো আপত্তি করবো না, বরং খুশি হয়ে রাজি হবো।"

শ্যামল তাকালো শঙ্খের দিকে। আস্তে আস্তে বল্ল, "আমি যদি দাতুকে বিয়ে করি, তা'তে তোমার স্বার্থটা কি?"

শঙ্খ চট করে কোনো উত্তর দিতে পারলো না। তারপর বল্ল, "না, স্বার্থ নেই কিছু, তবে তুমি আমার ভাই, তোমার একটা ভালো বিয়ে দেওয়া আমার কর্তব্য—"

হাসি দি হাসলো একটু। শ্যামলের মুখেও একটা বাঁকা হাসি ফুটে উঠলো। দাতুরী একবার শঙ্খের মুখের দিকে, একবার হাসি দির মুখের দিকে, একবার শ্যামলের মুখের দিকে তাকাতে লাগলো।

"ওসব বিয়ে টিয়ে আমি এখন করতে পারবো না," শ্যামল বল্ল।

শঙ্খের মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। হাসি দির মুখ খুব খুশি খুশি। কুন্তলার প্রশান্ত মুখে কোনো ভাবান্তর দেখা গেল না। দাতুরী একটু ক্ষুণ্ণ হোলো, বল্ল, "তুমি একটা বোকামি করলে, শ্যামলদা।"

শঙ্খও আস্তে আস্তে বল্ল, "আমিও তাই বলতে যাচ্ছিলাম, তুমি বড্ড বোকামি করলে শ্যামল। কে জানে হয়তো তোমায় একদিন আক্ষেপ করতে হবে এই ভুলের জন্যে।"

শ্যামল কোনো উত্তর না দিয়ে উঠে পড়লো, উঠে পড়ে বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। এসেই থমকে দাঁড়ালো। দেখলো, দাতু দাঁড়িয়ে ছিলো দরজার আড়ালে, তাকে বেরুতে দেখে তাড়াতাড়ি সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে যাচ্ছে।

শ্যামল আস্তে আস্তে বাইরে বেরিয়ে এসে ঠাকুর ঘরের দাওয়ায় এসে বসলো।

কিছুক্ষণ ঢাকীদের গান শুনলো চুপচাপ।

একটুকু ময়নার গুড়িগুড়ি ঠ্যাং
কি করে সে ময়না গেল রেঙ্গুন
বিদেশী মেয়ের সাথে শুধু ড্যাং ড্যাং
তার খুকী বৌটির মুখ খানি চুন।
এ গাঁয়ে দু'বিঘত ছিলো জমি তার
খাজনার দায়ে তাও নিলো জমিদার
বর্মায় গেল তাই দিয়ে তিন তুড়ি
বংশালে নিয়ে নিলো দিন মজুরি।
তার কথা ভেবে কাঁদে কর্ণফুলী
বৌটির পান্তায় জোটে না যে নুন
একটুকু ময়নার গুড়গুড়ি ঠ্যাং
কি করে সে ময়না গেল রেঙ্গুন।

লাতুরী আর শঙ্খ বেরিয়ে এলো।

"আমি বাড়ি চল্লাম, শ্যামল। তুমি এসো একদিন। কবে আসবে বলো," শঙ্খ বল্ল, "ও হ্যাঁ, লাতুরী, একটা জরুরী কথা আছে, তোমায় বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। অরুণ গুপ্তের নাম শুনেছো?"

"ফরওয়ার্ড ব্লকের আণ্ডার গ্রাউণ্ড নেতা?"

"হ্যাঁ। কাল সহরে হেমন্ত দারোগার মুখে শুনলাম ও নাকি চাটগাঁয় আছে।"

"হ্যাঁ, লোকেতো তাই বলছে—।"

"শুনছি অরুণ গুপ্তের অনেক সহকর্মী চাটগাঁয় কাজ করছে," বল্ল শঙ্খকুমার, "আমাদের এদিকেও নাকি এসেছে দু' একজন। পুলিশ তাদের খোঁজ পেয়েছে। হেমন্ত দারোগা আমায় জিজ্ঞেস করছিলো দু'একজনের কথা। তোমারও যদি কাউকে সন্দেহ হয় তো বোলো।"

শ্যামল চুপচাপ শুনে গেল।

"আমি বলতে যাবো কেন," লাতুরী জিজ্ঞেস করলো।

"তুমিও তো একজন এ্যান্টিফ্যাসিস্ত।"

লাতুরী বল্ল, "এ্যান্টিফ্যাসিস্তেরা ইংরেজ সরকারের পিটুনী পুলিশের ইনফরমার নয় শঙ্খদা। যার সঙ্গে আমার মতে মেলে না, তা'র সঙ্গে আমার সামনা সামনি লড়াই। পেছন থেকে ছুরি মারা আমার কাজ নয়।"

শ্যামল হাসলো একটুখানি।

শঙ্খ আর কিছু বল্ল না। শ্যামলের দিকে তাকালো একবার। তারপর চলে গেল।

"শঙ্খকে যে কথা বলতে বলেছিলাম, বলেছো?" শ্যামল জিজ্ঞেস করলো।

"ও। একেবারে ভুলে গেছি," লাতুরী বল্ল। "কাল কমিটির মিটিং আছে। তখন দেখা হ'লে বলবো।"

"আর কেউ যেন জানতে না পারে—।"

ঘাড় নাড়লো লাতুরী।

ঢাকীদের গান তখনো পুরোদমে চলছে। এরা দুজন কেউ কোনো কথা বল্ল না কিছুক্ষণ। একটু যেন আনমনা মনে হোলো শ্যামলকে।

"শ্যামল দা—।"

শ্যামল ফিরে তাকালো।

"তুমি লাতুকে বিয়ে করতে রাজি হলে না কেন?"

শ্যামল একটু হেসে বল্ল, "এখনো আমার বিয়ে করবার সময় হয়নি।"

লাতুরী হেসে ফেল্ল। বল্ল, "তা না হয় নাই বা হোলো, কিন্তু বিয়ের ঠিক হয়ে থাকতো না হয় আগে থেকেই।"

শ্যামল কোনো উত্তর দিলো না।

"দাতুর মতো ভালো ছেলে জোগাড় করা প্রায় অসম্ভব হবে পিসীর পক্ষে," লাতুরী বল্ল, "পিসী বড্ড গরীব।"

শ্যামল কোনো উত্তর দিলো না।

"দাতু বড্ডো ভালো মেয়ে। কার না কার হাতে পড়ে, তাই ওকে নিজের বাড়িতে ধরে রাখতে চেয়েছিলাম।"

"নিজের বাড়ি?"

"তোমার বাড়িতো দু'দিন পরে আমারই বাড়ি হবে।"

হাসতে গিয়ে হঠাৎ গলায় কি যেন আটকে গেল শ্যামলের।

"চুপ করে আছো কেন। বলো না শ্যামলদা—।"

"কি বলবো।"

"দাতুকে তোমার পছন্দ হয় নি বুঝি।"

"না, তা' নয়—"

"তা' হলে?"

একটু চুপ করে থেকে শ্যামল বল্ল, "আমায় বিয়ে করে দাতু সুখী হবে না লাতুরী।" বলে উঠে চলে গেল সেখান থেকে।"

* * * * *

ঢাকীদের গান শেষ হোলো অনেক রাতে। লোকজন যারা এসেছিলো তারা সবাই চলে যেতে আম গাছের আড়াল থেকে চাঁদ উঠলো যখন, তখন বারোটা প্রায় বাজে। খাওয়া দাওয়া সেরে শ্যামল এসে শুয়ে পড়লো। দূর বেতবনের অন্ধকার থেকে শেয়ালের ডাক ভেসে এলো। শ্যামলের ঘুম এলো না কিছুতেই।

তারপর শুনলো নরম পায়ের আওয়াজ। বারান্দা পেরিয়ে তার ঘরে এসে ঢুকছে।

"কে ?"

"আমি। তুই ঘুমোস নি বুঝি এখনো," বল্ল হাসি দি। বিছানার উপর শ্যামলের পাশে এসে বসলো।

"দেখতে এলাম তুই ঘুমিয়েছিস কিনা।"

"কিছুতেই ঘুম পাচ্ছে না," শ্যামল বল্ল। তারপর মনে হোলো কেন ঘুম পাচ্ছে না তার একটা কৈফিয়তও দেওয়া দরকার। বল্ল, "বড্ড গরম।"

হাসলো হাসিদি। একটি হাতপাখা তুলে নিয়ে পাখার হাওয়া করতে লাগলো তাকে।

তারপর আস্তে আস্তে বল্ল, "শঙ্খ খুব চটে গেছে আমাদের উপর।"

"কেন ?" শ্যামল জিজ্ঞেস করলো।

"দাতুর সঙ্গে তোর বিয়ের প্রস্তাবে আমরা কেউ যে রাজি হলাম না।"

"ভালোই করেছো," শ্যামল বল্ল, "আমার এখনো বিয়ে করবার সময় হয় নি।"

হাসিদি হাসলো আবার। তারপর বল্ল, "এ বিয়ের মতলবটা শঙ্খের মাথা থেকেই বেরিয়েছে।"

"ওর অতো মাথা ব্যথা কেন আমার জন্যে," শ্যামল জিজ্ঞেস করলো।

"এসব ওর আরেকটা প্যাঁচ।"

"প্যাঁচ ? কিসের প্যাঁচ ?"

"ও খুব হিংসে করে তোকে।"

"হিংসে ? কেন ?"

"বোকা ছেলে! তাও বুঝিস না," হাসিদি বল্ল, "লাতুরীর সঙ্গে তোর যে এত ভাব, সেটি ওর ভালো লাগছে না।"

একটু চুপ করে রইলো শ্যামল। তারপর বল্ল, "ওর তা'তে অতো ভাবনা কিসের। বিয়ে করুক না লাতুরীকে। আটকাচ্ছে কে ?"

"আমরা।"

"সে কি? তোমরাই তো ওদের বিয়ের ঠিক করেছিলে।"

"যখন করেছিলাম তখন শঙ্খের সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানতাম না। এখন দেখছি জেনে শুনে ওর মতো ছেলের হাতে মেয়ে দেওয়া যায় না।"

"ব্যাপারটা যতো সহজ ভাবছো, অতো সহজ নয়," শ্যামল বল্ল, "ওর উপর লাতুরীর কতোখানি টান জানো?"

"জানি। কিন্তু যে ছেলে লাতুরীকে বিয়ে করতে চায় তাকে ভালোবেসে নয়, সে যে তার মামার প্রচুর ধান জমি সমেত একটা মোটা টাকার সম্পত্তি পেয়েছে, বিয়ে করতে চায় শুধু তারই জন্যে, সে ছেলের উপর লাতুরীর যতো টানই থাক, আমি প্রাণে ধরে লাতুরীকে তার হাতে তুলে দিতে পারবো না। লাতুরীকে আমি কোলে পিঠে করে মানুষ করেছি। ও কোনোদিন অসুখী হলে আমি ক্ষমা করতে পারবো না নিজেকে।"

"বেশ তো। ওকে বলে ফেল সব কিছু।"

"হ্যাঁ, বলবো এবার, বলার সময় এসেছে। কিন্তু তার আগে ভাববার আছে একটা কথা—যে শঙ্খকে সে সারা জীবন ধরে চেয়েছে, তার স্বরূপ জানতে পেলে সে তার দিকে ফিরেও তাকাবে না সত্যি, কিন্তু তার মনে খুব লাগবে। সে যদি এভাবে অসুখী হয়, সে আমি কি করে সইবো বল? তাই ভাবছি, যদি এমন কারো সঙ্গে তার বিয়ে দেওয়া যায় যে তাকে সুখী করতে পারবে, যার ভালোবাসা তাকে এতদিনকার সব স্বপ্ন ভেঙে যাওয়ার দুঃখ ভুলিয়ে দেবে।"

"লাতুরী যে আর কাউকে বিয়ে করতে রাজি হবে সে আমার মনে হয় না," শ্যামল বল্ল।

একটু চুপ করে থেকে হাসিদি বল্ল, "তুই লাতুরীকে বিয়ে করবি?"

শ্যামল চট করে উঠে বসলো। "সে কি করে হয় হাসিদি ?"
"কেন হবে না ভাই, তুই যে তাকে খুব ভালোবাসিস।"
"কে বল্লে ?"
"কাউকে কি বলতে হয়রে পাগল, তোর দিদির কি চোখ নেই। প্রথম দেখাতেই তোর মন বিকিয়ে গেল তার কাছে, কিন্তু যখন শুনলি যে তার সঙ্গে আরেকজনের বিয়ের ঠিক হয়ে গেছে, তখন একেবারে চেপে গেলি নিজেকে। কাউকে বুঝতে দিতে চাইলি নে, কিন্তু যতোই চাপতে গেলি নিজেকে, ততোই ধরা পড়ে গেলি আমার কাছে। লাতুরীর দিকে তোর তাকানোর মধ্যে যেই চাপা ব্যথা ফুটে ওঠে, অথচ লাতুরী তোর কাছে এলে যেরকম খুসিতে ঝলমল করে উঠিস তুই, সে সব কি তোর দিদির চোখে ধরা পড়েনি রে বোকা !"
শ্যামলের চুলের ভিতর দিয়ে আঙুল চালাতে চালাতে হাসিদি বল্ল, "কুন্তলা পিসীও জানেন তোর মনের খবর, তাইতো রাজি হননি লাতুর সঙ্গে তোর বিয়ে দিতে। তা নইলে তোর মতো ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ের কথা উঠলে কি উনি ফিরিয়ে দিতেন কোনোদিন ? লাতুরীর মন যদি শঙ্খের উপর পড়ে না থাকতো, তাহলে তারও জানতে দেরী হোতো না কিছুই।"
শ্যামল আস্তে আস্তে বল্ল, "আজ সাইর ঠাকুরের মুখে যখন শুনলাম তখনই ভয় হোলো তুমি হয়তো জেনে গেছ কোনো রকমে। কি করে তোমার কাছে মুখ দেখাবো ভেবে পাচ্ছিলাম না।"
তারপর বল্ল, "সে যাই হোক, আমার দুঃখ আমার একলারই থাক হাসিদি। লাতুরীকে আমি চিনি, ওকে তুমি কিছু বলতে যেও না।"
"সে আমি হতে দেবো কেন শ্যামল। শঙ্খকে লাতুরী যে ভালোবাসে তার ভিত যে একেবারে কাঁচা, সে একদিনে ধ্বসে পড়বে।"

"ভিতটা কাঁচা হাসিদি, কিন্তু ওর ভালোবাসাটা খাঁটি।"

"তুই কি চাস শঙ্খের মতো অপদার্থের সঙ্গে তার বিয়ে হোক?"

"লাতুরী যদি তাকে পেয়ে সুখী হয়, আমরা বাধা দেওয়ার কে?"

"তুই কি বিশ্বাস করিস লাতুরী তাকে পেয়ে শেষ পর্যন্ত সুখী হবে? তার ভালোবাসা টিকে থাকবে?"

কোনো উত্তর দিলো না শ্যামল।

"চুপ করে আছিস কেন? বল।"

"মস্তো সমস্যা হাসিদি। শঙ্খকে বিয়ে করলে সে একদিন না একদিন সব কিছু জানতে পারবে, আর তার সুখের ঘর ভেঙে যাবে সেদিনই। কিন্তু শঙ্খকে বিয়ে না করলেও সে খুব অসুখী হবে। এর মধ্যে কোনটা বেছে নেওয়া যায় বলো?"

"প্রথমটা বেছে নিলে জীবনে সুখী হওয়ার সমস্ত আশা ছেড়ে দিতে হয়," হাসিদি বল্ল, "পরেরটা বেছে নিলে কিছু আশা থাকে। তাই বলছি, তুই কি চাস লাতুরীর সঙ্গে শঙ্খের বিয়ে হোক।"

শ্যামল ভাবলো কিছুক্ষণ। তারপর বল্ল, "হাসিদি, আমি আমার কথা কোনোদিনই জানতে দেবো না লাতুরীকে, তবে একটা কথা দিচ্ছি তোমায়, শঙ্খের মুখোস আমি খুলে দেবো লাতুরীর কাছে।"

● ● ● ●

হাসিদি চলে গেছে অনেকক্ষণ।

ঢং ঢং করে দুটো বাজলো একতলার বৈঠকখানার ঘড়িতে।

চাঁদ উঠে এলো আকাশের মাঝখানে। পাপিয়ার গানে তন্দ্রার আমেজ লেগেছে। হাস্নেহানার গন্ধে নেতিয়ে পড়েছে দক্ষিণের হাওয়া।

তবু শ্যামলের ঘুম এলো না।

আস্তে আস্তে উঠে এলো, বেরিয়ে এলো বাইরের বারান্দায়। এসে দাঁড়ালো বারান্দার ধারে। সামনের উঠোনে চাঁদের আলো পোহাচ্ছিলো ছায়ার মতো কালো একটি শেয়াল, মুখ তুলে তাকে দেখতে পেয়ে ঠাকুরের ঘরের পেছন দিকের জঙলা ছায়ায় পালিয়ে গেল।

বাঁশবনের ওপার থেকে একটি মেঘ উঠলো আস্তে আস্তে, প্রায় ঢেকে ফেললো চাঁদটিকে। শ্যামল ফিরে দাঁড়ালো—নাঃ, এবার একটু ঘুম না এলে চলছে না। ঘরের ভেতর যাওয়া যাক, ভাবলো সে। তারপর ভাবলো, না, একটু পায়চারী করে নিই। পায়চারী করতে করতে ঘুরে গেল পেছন দিকের বারান্দায়। গিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো। বারান্দার ও প্রান্তে ছায়ার মতো কি একটা যেন।

পা টিপে টিপে এগিয়ে গেল, কাছে এসে দেখে দাদু দাঁড়িয়ে আছে বাইরের দিকে চেয়ে। এত রাত্তিরে?

"দাদু!"

সে চমকে উঠে ফিরে তাকাতেই চাঁদের আলো পড়লো তার মুখে।

মুখ তার চোখের জলে ভাসছে।

শ্যামল আর কিছু বলবার আগেই দাদু পাশ কাটিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে দরজার শিকল তুলে দিলো।

(ছয়)

লাতুরীর সঙ্গে শঙ্খের তার পরদিনই দেখা হোলো। পল্লীমঙ্গল সমিতির অফিসে ডিসপেনসারি কমিটির একটি মিটিং ছিলো।

মিটিং শেষ হতে শঙ্খকে এক পাশে ডেকে নিয়ে লাতুরী তাকে জানালো যে শ্যামল তাদের কিছু দামী ইনজেকশান জোগাড় করে দিচ্ছে এশিয়া কেমিক্যালস্ এ্যাণ্ড ফার্মাসিউটেকেলস্ থেকে।

"এখন কাউকে কিছু বোলো না শঙ্খদা," লাতুরী বল্ল, "খবরটা শুধু তোমার আমার মধ্যেই থাক। এলে পরে কমিটিকে জানানো যাবে।"

"কেন," শঙ্খ জিজ্ঞেস করলো, "এরকম একটি সুখবর—।"

"খবরটা চাপা থাকনা, পরপর দু'বার অনেক দামী ওষুধ চুরি হয়ে গেল, তাই এটির সম্বন্ধে একটু সাবধান হওয়া দরকার।"

"ও," একটু গম্ভীর হয়ে গেল শঙ্খ। তারপর বল্ল, "চলো, তোমার বাড়ি পৌঁছে দি। অনেক কথা আছে তোমার সঙ্গে। পথে যেতে যেতে বলা যাবে।"

ধুলোয় লাল আর ঝরে পড়া কৃষ্ণচূড়ার পাঁপড়িতে রঙিন সরু পথ ধরে বাড়ির পথে রওনা হোলো শঙ্খ আর লাতুরী।

কিছুক্ষণ পথ চলার পর শঙ্খ জিজ্ঞেস করলো, "শ্যামল তোমাদের ওখানে আর কদ্দিন থাকবে?"

"থাকবে কিছুদিন। কেন?"

"ওর সঙ্গে আর বেশী মেলামেশা কোরো না।"

লাতুরী অবাক হয়ে শঙ্খের দিকে তাকালো। জিজ্ঞেস করলো, "কেন? ওতো তোমার ভাই।"

শঙ্খ বাঁকা হাসি হাসলো একটু। বল্ল, "দেখ লাতুরী, তুমি হাজার হোক এ গাঁয়ের মেয়ে। তুমি শহরে থেকে পড়াশুনো করে আই-এ পাশ করেছো যদিও, তবু সবাই তোমায় এত ভালোবাসে যে গাঁয়ের অন্য মেয়েদের সবাই যে চোখে দেখে, তোমাকেও সে চোখেই দেখে। তোমাকে শহুরে ভাবে না, অর্থাৎ পর ভাবে না। তুমি মহিলা সমিতি, কিষাণ আন্দোলন ইত্যাদি নিয়ে পড়ে আছো বলে, লোকের নানা রকম উপকার করো বলে, তোমার এত খোলাখুলি বাইরে ঘুরে বেড়ানো, এত সহজ ভাবে আমাদের সবার সঙ্গে মেলামেশা কোনোরকম খারাপ চোখে দেখে না। তা নইলে সবাই এই চাইতো যে গাঁয়ের আর দশজন মেয়ের মতো তুমিও বাড়ি থেকে না বেরোও। যাই হোক, এতদিন কেউ কিছু বলে নি। কিন্তু ওই যে শ্যামল, সে এসে আমাদের ওখানে না উঠে তোমাদের ওখানে গিয়ে উঠলো, আর ওখান থেকে নড়বার নাম করছে না, আর তুমি তার সঙ্গে সকাল, দুপুর, সন্ধ্যে সব সময় সব জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছো, এ নিয়ে কিন্তু নানান জনে নানা কথা বলতে সুরু করেছে। আমি অবশ্যি ওসবে কান দিই না, কোনো গুরুত্বই দিই না ওদের কথায়, কিন্তু ভেবে দেখ, তুমি আর দুদিন পরে সেন বাড়ির বৌ হবে, তোমার নামে দশজন যে দশটা কথা বলবে সে আমি কি করে সহ্য করি বলো।"

লাতুরী চুপ করে শুনে গেল।

শঙ্খ বলে চল্ল, "আমি অবশ্যি তোমায় মানা করছি না শ্যামলের সঙ্গে মিশতে। শ্যামল আমার ভাই। তার সঙ্গে তোমার ভাব না হবে তো কি রাস্তার লোকের সঙ্গে হবে। আমি অন্য কারণে মানা

করছি।” তারপর গলাটা খাটো করে একটু ড্রামাটিক হবার চেষ্টা করে বল্ল, “জানো, ওর পেছনে পুলিশ ঘুরছে।”

“কেন,” লাতুরী জিজ্ঞেস করলো।

শঙ্খ আস্তে আস্তে বল্ল, “ও হোলো অরুণ গুপ্তের একজন সহকর্মী। আমায় হেমন্ত দারোগা বলছিলো সেদিন।”

“আমি বিশ্বাস করি না,” লাতুরী বল্ল।

“কেন ?”

“ও রকম সহকর্মী থাকলে দুদিনেই ওদের পার্টির বারোটা বেজে যাবে। বেশ খায় দায় ঘুমোয়, কানুনগোপাড়া কলেজে সপ্তায় দু'দিন ক্লাস নেয় আর আমাদের সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়।”

“মাঝে মাঝে চলে যায় না কোথায় ?”

“শহরে যায়। সেখানে ওর মেশোমশাই আছেন।”

ঘাড় নাড়লো শঙ্খ।

“তুমি কি বলতে চাও শহরে যায় কোনো পলিটিক্যাল কাজে ? সে হতে পারে না। তাহলে সে শহরেই থাকতো। এখানে এসে থাকতো না। আর এখানে তো ও কিছু করেনা। যেটুকু মেশে আমাদের স্কুলের লোকের সঙ্গেই।”

“তোমাদের খবর নিচ্ছে হয় তো।”

“আমাদের তো কোনো গোপন খবর নেই শঙ্খদা। আমাদের খোলাখুলি কাজ। তার জন্যে আমাদের পেছনে গুপ্তচর লাগাতে হয় না। তাছাড়া ওদের দলের কর্মীরা সব লুকিয়ে আছে। প্রায় প্রত্যেকের নামেই পুলিশের ওয়ারেন্ট আছে। দেখলেই ধরে নিয়ে যাবে। শ্যামলদা ওদের দলের লোক হলে এত প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াতো না। তা ছাড়া ও [illegible] কবিতা লেখে।”

"কবিতা লেখা শুধু সবার চোখে ধুলো দেওয়ার জন্যে। তুমি যাই বলো, আমি জানি যে শ্যামল ও দলের ছেলে," শঙ্খ বল্ল।

"আমি বিশ্বাস করি না এ কথা," লাতুরী বল্ল।

"আমার কথাও তুমি বিশ্বাস করো না ?"

"তুমি বল্লেই যে বিশ্বাস করতে হবে এমন তো কোনো কথা নেই।"

শঙ্খ আস্তে আস্তে বল্ল, "লাতুরী, যার সঙ্গে একদিন ঘর করবে তার সামান্য কথাটিও যদি বিশ্বাস না করো—"

"দেখ, তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে অতো ভাবপ্রবণ কথাবার্তা বলে আমাদের সম্পর্কটি অতো সস্তা করবার চেষ্টা কোরোনা শঙ্খদা," লাতুরী বল্ল, "আমি জানি যে তুমি শ্যামলকে পছন্দ করো না। কারণটা হয়তো পারিবারিক, কারণ তুমি তাকে এত কম চেনো যে তাকে পছন্দ না করবার কোনো ব্যক্তিগত কারণ থাকতে পারে না। সে যাই হোক, আমার অত্যন্ত ভালো লাগে শ্যামলকে, অত্যন্ত ভালো ছেলে সে। সেন পরিবারে তোমরা শুধু দুটি ছেলেই বেঁচে আছো, তুমি আর শ্যামল। আমি চাইনা যে তোমরা কেউ কারো কাছ থেকে দূরে সরে থাকো।"

শঙ্খ একটু হাল্কা হবার চেষ্টা করে হেসে বল্ল, "ওরে বাবা, শ্যামলের প্রেমে পড়ে গেছ মনে হচ্ছে!"

"কী বল্লে ?" লাতুরী ঘুরে দাঁড়ালো।

"না, না, কিছু নয়, এমনি একটু ঠাট্টা করছিলাম।"

"দেখ। তুমি আমাকে চেনো। আমায় ওরকম ঠাট্টা আর কোরো না।" লাতুরী আস্তে আস্তে বল্ল।

ওরা হাঁটতে হাঁটতে এসে দাঁড়ালো মোড়ের কাছে। সেখান থেকে একটি সরু পথ লাতুরীদের বাড়ির দিকে চলে গেছে। আরেকটি সোজা চলে গেছে সেন পাড়ায়।

"আমি আর যাবো না, এখান থেকে একা যেতে পারবে তো," শঙ্খ জিজ্ঞেস করলো।

লাতুরী ঘাড় নাড়লো।

একটু ইতস্তত করলো শঙ্খ। তারপর বল্ল, "আরেকটা কথা বলবো ভাবছিলাম—।"

"কি কথা," লাতুরী চোখ তুলে জিজ্ঞেস করলো।

গলাটি নরম করে শঙ্খ বল্ল, "আজকাল আমরা বড্ডো ঝগড়া করছি লাতুরী।"

"ঝগড়া আমরা সব সময় করবো," লাতুরী বল্ল।

"আমি আর একা কদ্দিন থাকবো লক্ষ্মীটি!"

লাতুরী শঙ্খের একটি হাত নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিলো। বল্ল, "আমি তো বলেইছি, তোমরা যা হোক একটি দিন ঠিক করে নাও।"

"বৈশাখের সাতাশে একটা ভালো দিন আছে।"

"বেশ। হাসি বৌদিকে বলো, দাদাকে বলো, দাদুকে বলো।"

"এই রোববার পর্যন্ত একটু ব্যস্ত আছি—"শঙ্খ সুরু করলো।

"রোববার আমাদের ইনজেকশানগুলো এসে যাচ্ছে," লাতুরী কথার মাঝখানে বল্ল।

"—সোমবার সকালে ডিসপেনসারি কমিটির আরেকটি মিটিং আছে—।" শঙ্খ বলে গেল।

"সেখানে ইনজেকশানের নতুন স্টকটির হিসেব দেওয়া হবে কমিটিকে—," লাতুরী আবার বল্ল কথার মাঝখানে।

"সেদিন বিকেলে মাকে নিয়ে তোমাদের বাড়ি যাবো সব কথা পাকা-পাকি করতে।"

"আচ্ছা, আর ওষুধের খবরটি এখন কাউকে জানিও না কিন্তু," লাহুরী বল্ল।

"ওষুধের খবর ?" শঙ্খ অবাক হোলো একটু। "কোন ওষুধ ? ও, হ্যাঁ," গম্ভীর হয়ে গেল সে। "না, কাউকে বলবো না।"

শঙ্খ চলে গেল। সন্ধ্যার ছায়ায় ছায়ায় বাড়ীর পথ ধরলো লাহুরী।

• • • • •

শুক্রবার শনিবার দুদিন সহরে কাটিয়ে রোববার সকালে আবুল মাঝির সাম্পান ভাড়া করে শ্রীপুরে ফিরছিলো শ্যামল। সঙ্গে একটা মস্তো বড়ো কার্ডবোর্ডের বাক্স।

"এটা কি দাদাবাবু," দাঁড় বাইতে বাইতে আবুল জিজ্ঞেস করলো।

সেদিন সকালে একটা গুমোট গরম, হাওয়া নেই। আবুল পাল খাটাতে পারেনি। আবুলের মেহেনত হচ্ছিলো খুব। ঘামে চিক চিক করছিলো তার প্রশস্ত ললাট। সেদিকে একবার তাকালো শ্যামল।

বল্ল, "কিছু ওষুধ পত্তর নিয়ে যাচ্ছি তোমাদের জন্যে।"

"আমাদের জন্যে ?"

"গোপাল সেনের দাওয়াখানার জন্যে। সে তো তোমাদেরই।"

"আমাদের ?" একটু দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়লো আবুল মাঝি। সাদা দাড়ির ফাঁকে একটুখানি হাসির আভাস দেখা গেল। মাথা নাড়লো সে।

বল্ল, "সে ওষুধ আর আমাদের জুটবে না দাদাবাবু।"

"কেন ?"

"জানেন তো সবই। আমি আর কি বলবো।"

আবুল আর কিছু বল্ল না। শ্যামলও চুপ করে রইলো। কালুর-ঘাটের পোল পেছনে রেখে উজান বেয়ে চল্ল আবুল মাঝির সাম্পান। দূরে গাছপালার আড়ালে একটুখানি ধোঁয়ার আভাস। কাল সাঁঝের

শোনা যায় খুব মৃদু মৃদঙ্গের বোলের মতো আওয়াজ। ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে আসছে।

ট্রেন আসছে শহর থেকে, দোহাজারির ট্রেন।

একটি বড়ো নৌকো পাশ কাটিয়ে গেল।

"আপনি শ্রীপুরে আর কদ্দিন থাকবেন," আবুল হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো।

"আছি কিছুদিন। কাঞ্চনগোপাড়া কলেজে চাকরী নিয়েছি শোনোনি বুঝি?"

একটু ইতস্তত করে আবুল বল্ল, "দাদাবাবু, কিছুদিনের জন্য বাইরে চলে যান।"

"কেন?" ফিরে তাকালো শ্যামল।

"মেজোদাদাবাবু, চৌধুরী বাবু এরা নাকি আপনাকে শিগ্‌গিরই পুলিশে ধরিয়ে দেবে।"

"কেন রে?"

"ওরা বলাবলি করছে আপনি নাকি ফেরারী আসামী। পুলিশ আছে আপনার পেছনে।"

শ্যামল হাসলো।

"আমরা অবশ্যি বিশ্বাস করিনা ওসব কথা। আসল কারণ হয়তো অন্য কিছু। তবে ওসব বড় ঘরের ব্যাপার। আমরা কিছু বুঝি সুঝি না।"

"এসব কথা তুমি কোথায় শুনলে?"

"লক্ষ্মী বলছিলো।"

"লক্ষ্মী?"

"হ্যাঁ। কানাই পুতুর মেয়ে লক্ষ্মী। হাসি ঠাকুরণদের বাড়ী যে কাজ করে—।"

"ও।"

আবুল বল্লে, "সেদিন কালাইয়ার হাটে লক্ষ্মীর সঙ্গে দেখা হতে সে আমায় একপাশে ডেকে নিয়ে বল্লে আপনাকে যেন এখবরটি আমি জানাই।"

"সে কি করে জানে?" শ্যামল অবাক হোলো একটু। আবুল কিছু বলার আগেই বল্ল, "আমায় নিজে এসে বলেনি কেন?"

"বলার সুবিধে হয়নি। ও বাড়িতে এত লোকজন, আপনাকে নিরিবিলি পাওয়া যায় না। তা'ছাড়া ওর একটা ভয় আছে, সবাই যদি জেনে যায় যে সে ওদের লোক—।"

"কাদের লোক?"

"মেজদাদাবাবুদের।"

"শঙ্খদের লোক?" শ্যামল আরো অবাক।

"হ্যাঁ। ওতো আগে কাজ করতো মেজদাদাবাবুদের ওখানে। যেদিন আপনি এলেন তারপর দিন থেকেই সে আপনাদের ওখানে কাজ নিলো। মেজদাদাবাবুই পাঠিয়েছিলো ওকে। আসল উদ্দেশ্য ছিলো আপনার উপর নজর রাখা। আপনি যে লাতুরী দিদিমণিকে বিয়ে করতে চান সে খবর তো সেই দেয় মেজদাদাবাবুকে—।"

"আমি লাতুরীকে বিয়ে করতে চাই? এরকম মিছে কথা—"

"সে কি আর আমি জানিনা দাদাবাবু। কিন্তু এখন লক্ষ্মী আঙুল কামড়াচ্ছে।"

"কেন?"

"বড় ঘরের এসব ব্যাপারে আমাদের কাণ দেওয়া উচিত নয় দাদাবাবু, কিন্তু আপনি জানতে চাইছেন যখন, বলছি। লক্ষ্মীর সঙ্গে দাদাবাবুর একটু—মানে—"

"থাক, আর বলতে হবে না, বুঝেছি।"

মেজদাদাবাবুর সঙ্গে যে লাতুরীর বিয়ে হবে তাতে লক্ষীর আগে কোনো ভাবনা ছিলো না। কারণ সে গোলামবাড়ির মেয়ে, বাড়ির ঝি চাকরানী ছাড়া আর কি হবে? সে আর কিছু চায়নি, চিরকাল মেজবাবুর বাড়িতে মেজবাবুর কাছাকাছি থাকতে পারলেই সে খুসি। এখন কিছুদিন লাতুরীদিদিমণিদের বাড়ি কাজ করে দেখেছে যে লাতুরী বড্ড কড়া মেজাজের মেয়ে, ওর চোখকে ফাঁকি দেওয়া যায় না। তাই মেজদাদাবাবুর সঙ্গে লাতুরীদিদিমণির সঙ্গে বিয়ে হলে ওবাড়ীতে লক্ষীর থাকা সম্ভব হবে না। সে চায় লাতুরীর সঙ্গে ওঁর বিয়ে না হোক, বিয়ে হোক কোনো বোকা ঠাণ্ডা মেজাজের মেয়ের সঙ্গে। তাই সে সম্প্রতি লাতুরীর নামে অনেক নোংরা মিছে কথা বানিয়ে বানিয়ে বলছিলো মেজদাদাবাবুকে। সেদিন একটা চড়ও খেয়েছে ওঁর কাছে। আমায় কেঁদে কেঁদে বলছিলো লক্ষী। কানাই পুতু আমার দোস্ত। লক্ষী আমার মেয়ের মতো। খুব বকে দিলাম তাকে। কানাই পুতু জানতে পেলে মেয়েকে খুন করে ফেলবে।"

শ্যামল চুপ করে শুনলো। তারপর হঠাৎ মনে হোলো একটা কথা। বল্ল, "একটা সিগারেট খাবে আবুল মাঝি?"

"ওই সাদা সাদা এক পয়সা দামের বিড়ি? না, বাবু, আমরা গরীব মানুষ—।"

"আমি দিচ্ছি, খাওনা একটা—। শোনো, একটা কথা আছে তোমার সঙ্গে।"

"বলুন।"

"আচ্ছা, আবুলমাঝি, তুমিতো অনেক কিছু জানো শোনো। পথ, প্রসাদ চৌধুরী এরা তো মাঝে মাঝে রাত্তিরে মাল চালান দেয় সহরে, কার নৌকো ভাড়া করে কিছু জানো?"

"আপনাকে কে বল্লে এরা রাত্তিরে মাল চালান দেয় ?"

"আমি জানি। কিন্তু কার নৌকো ওরা নেয় বলতে পারো ?"

"সে আমি জানিনা, দাদাবাবু," আবুল বল্ল।

শ্যামল একটু হতাশ হোলো।

"জানবার চেষ্টা করতে পারো ?"

"খুব সহজ কাজ নয় দাদাবাবু।"

"দেখনা চেষ্টা করে।

আবুল চুপ করে রইলো একটুখানি। হঠাৎ তার চোখ দুটো জ্বলে উঠলো যেন। বল্ল, "তবে একটা কথা বলতে পারি আপনাকে।"

শ্যামল ঝুঁকে পড়লো আবুলের দিকে।

"মাসদেড়েক আগে একদিন শঙ্খবাবু আমায় ডেকে পাঠিয়ে বল্ল, আবুল, খুব জরুরী দরকারে তোমার নৌকোটা ভাড়া করতে চাই। তিন ডবল ভাড়া দেবো। একটু কালুরঘাট যেতে হবে। তবে একটা কথা। কাউকে বোলো না একথা। মাঝরাতে বেরুবো, শেষ রাতে ফিরবো। আর নৌকো ছাড়বে খেয়াঘাট থেকে নয়। আরেকটু উত্তরে যেখানে গত বছর ডোমেদের বৌ একটা ডুবে মরেছিলো, তার কাছেই যে একটা অশথ্‌গাছ আছে পাড়ে ঘেষে, নৌকো ছাড়বে সেখান থেকে। শঙ্খবাবুর কথার ধরন ধারন আমার ভাল লাগলো না। আমি বল্লাম আমি বুড়ো মানুষ, রাতবিরেতে নৌকো নিয়ে বেরুতে পারবো না। সে বল্লে তা'হলে তোমার ছেলেকে পাঠিয়ে দাও। আমার রাগ হোলো, বল্লাম দাদাবাবু, তোমার কথা শুনে ভালো মনে হচ্ছে না। আমরা গরীব মানুষ। খেটে খাই। আমাদের ছেলেদের আমরা কোনো অন্যায় কাজে ভিড়তে দিতে পারি নি। একথা শুনে শঙ্খের মাথা গরম হয়ে

গেল। আমি তার বাপের চেয়ে বয়সে বড়ো। তাকে আমি এতটুকু থেকে দেখে আসছি। আর সে কিনা আমায় একটা চড় মারলে! আমি আর কিছু বল্লাম না। চলে এলাম সেখান থেকে। দিন দুয়েক পর একদিন রাত্তিরে দেখি ঘাট থেকে আবার নৌকোটা ডাঙায় তুলে কারা তাতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে।"

শ্যামলের পা থেকে মাথা পর্যন্ত আগুনের ঢেউ বয়ে গেল। বল্ল, "কাউকে জানাওনি এ কথা?"

"গরীবের কথা কে বিশ্বাস করবে দাদাবাবু। তবে খোদা জানেন। খোদা এর বিচার করবেন।"

"লাতুরীকে বলতে পারোনি।"

"ওঁর সঙ্গে মেজদাদাবাবুর বিয়ের ঠিক হয়ে আছে, তিনি আমাদের কথা বিশ্বাস করবেন কেন?"

"আমায় কি করে বিশ্বাস করলে?"

"বিশ্বাস করবেন সে আশা করে বলিনি। ওদের খোঁজ করলেন, তাই বল্লাম। যে আমাদের যতোই ভালোবাসুক, দরকারের সময় আপনারা বড়মানুষের ছেলেরা সবাই একদল।"

শ্যামল একটু হেসে চুপ করে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর বল্ল, "তুমি আমার সঙ্গে এসে এ কথা লাতুরীকে বলতে পারবে?"

"যদি আমার কথা কেউ বিশ্বাস না করে?"

"সে আমি বুঝবো'খন।"

দাঁড় বেয়ে চল্ল আবুল মাঝি। কর্ণফুলীর বুকে তখন ভরা জোয়ার, ঢেউয়ে ঢেউয়ে দুলে দুলে উঠলো আবুল মাঝির সাম্পান।

সোনালী রোদটা ঝাঁঝা হয়ে এলো আস্তে আস্তে।

"আমায় ন'টায় মধ্যে শ্রীপুর পৌঁছে দিতে পারবে?"

ঘাড় নাড়লো আবুল মাঝি।

* * * * * * *

তখন বেলা প্রায় বারোটা।

কড়া রোদ্দুরে হেঁটে এসে ঘামতে ঘামতে প্রসাদ চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করতে এলো শঙ্খকুমার।

"হঠাৎ এসময়?"

শঙ্খ বল্ল। শ্যামল কলকাতার এশিয়া কেমিক্যাল এণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল থেকে কিছু ইনজেকশান ইত্যাদি জোগাড় করে এনেছে ডিসপেনসারির জন্যে। এখন কাউকে জানাতে মানা করেছে লাতুরী। কাল কমিটির মিটিং বসলে সবাইকে জানানো হবে।

চুপ করে শুনলো প্রসাদ চৌধুরী। তারপর জিজ্ঞেস করলো, "কি কি এসেছে?"

"কুইনিন, কোরামিন, এমেটিন, মরফিয়া, ভিটামিন ট্যাবলেট ও ইনজেকশান ইত্যাদি।"

চোখ দুটো জলজল করে উঠলো প্রসাদ চৌধুরীর।

"কোথায় ওসব?"

"ডিসপেনসারির মাল ঘরে। আমি, লাতুরী আর শঙ্খকুমার সেখানে গিয়ে লোহার আলমারীর মধ্যে সে সব তুলে রেখে তালা এঁটে দিয়ে এসেছি।"

"হুঁ।" একটু ভাবলো প্রসাদ চৌধুরী। "আচ্ছা, তোমার কি মনে হয় ওরা আমাদের কথা কিছু জানে?"

"শুনে থাকতে পারে। লোকে তো কানাঘুষো করছে। তবে আমি যে এ সবের মধ্যে আছি সে কথা বোধ হয় ওরা কেউ জানে না," শঙ্খ বল্ল।

"তোমার কি মনে হয়না এ একটা ফাঁদ ?"

"সে কথাই তো বলতে এসেছি আপনাকে। আসল খবরটি পেয়েছি লক্ষীর কাছে। আজ রাত্তির থেকেই কড়া পাহারার ব্যবস্থা হয়েছে। ওদের ধারণা নতুন মাল এসেছে শুনলে ওসব আবার সরানোর চেষ্টা হবে।"

"আমার মনে হয় ওরা হয়তো তোমাকেও সন্দেহ করছে।"

"সে সম্ভাবনা আমিও যে একেবারে ভাবিনি তা'নয়। তাই আলমারীর চাবি, মাল ঘরের দরজার চাবি দুটোই লাতুরীকে দিয়ে দিয়েছি।"

"চাবি দিয়ে দিলে কি আর হবে। আমাদের কাছে তো নকল চাবি আছে।"

"সে ভরসাতেই তো দিলাম," শঙ্খ বল্ল।

"যাই হোক, এখন চুপ করে বসে থাকো। কিছু কোরো না।"

"আমি অন্য মতলব ভাবছি।"

"কি মতলব।"

"মনে করুন কাল যদি দেখা যায় ওষুধগুলো জাল, তাহলে শ্যামলকে সহজেই পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া যায়।"

"সে কি করে হয় ?"

"কেন হবে না। ওষুধ এনেছে শ্যামল। চাবিও ওদের কাছে। আর কারো পক্ষে তো রাতারাতি আসল মাল সরিয়ে ফেলে সেখানে জাল ওষুধ রেখে আসা সম্ভব নয়। আর যদি এটা দেখানো যায় যে গাঁয়ের মধ্যে এসব গোলমাল দেখে ভেজাল কুইনিন দিয়ে শ্যামল দু'পয়সা করবার চেষ্টা করছে, তা'হলে লাতুরী তক্ষুনি ওকে—"

"তুমি লাতুরীর ভাবনাতেই অস্থির। অতো জাল ইনজেকশান চট করে পাবো কোথায় ?"

"সব রকম জাল ওষুধের দরকার নেই। শুধু কুইনিন, ভিটামিন ট্যাবলেট এগুলো বদলে দিলেই হোলো। মরফিয়ার ক্যাপসুলগুলোও নিয়ে আসা যায়।"

"এসব করবে কখন?"

"আজ দুপুরে। রোববার দুপুর বিকেল তো ডিসপেনসারি বন্ধ। একটি দারোয়ান ছাড়া কেউ থাকবে না। সেও হয়তো ঘুমুবে। পাহারা যা'কিছু সব রাত্তিরে। লাতুরী তো ওদের গ্রামরক্ষী-বাহিনীকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছে। তবে দিনের বেলায় যে মাল সরানোর চেষ্টা হতে পারে সে হয়তো ভাবতে পারবেনা কেউ।"

অনেকক্ষণ ভাবলো প্রসাদ চৌধুরী।

তারপর বল্ল, "না, এসব করে কাজ নেই। এখন কিছুদিন চুপচাপ থাকো। শ্যামলকে এভাবে জড়ানোর চেষ্টা করে লাভ নেই। আমরা যা ভাবছি সে ভাবে করলেই ভালো হবে। আমরাতো শহরে যাচ্ছি পরশু। তখন হেমন্ত দারোগাকে বলা যাবে শ্যামলের কথা। সোজা রাস্তায় যা হয় তাই করো। অতো প্যাঁচের মধ্যে যাওয়ার দরকার নেই বাপু।"

"আপনি বলছেন সে কথা," শঙ্খ হেসে বল্ল।

প্রসাদ চৌধুরী বল্ল, "যা বলছি তাই করো। এখন কিছুদিন বসে থাকো চুপচাপ। শ্যামলকে পুলিশে ধরুক। লাতুরীর সঙ্গে তোমার বিয়েটা হয়ে যাক। তারপর আবার ধীরে সুস্থে........"

• • • • •

বেলা তখন দুটো। প্রচণ্ড রোদ। হাওয়া নেই। গাছের পাতাগুলো নড়ছে না। একটি ঘুঘু ডাকছে ঠাকুরঘরের চালের ওপার থেকে। পেছনের আমবাগানে মাটির উপর শুকনো পাতায় মাঝে মাঝে ধুপধাপ আম পড়ার শব্দ।

এমন সময় পা টিপে টিপে লক্ষ্মী এসে ঢুকলো শঙ্খের ঘরে। শঙ্খ তখন খাটের উপর চুপচাপ শুয়ে একটি পুরানো মাসিকের পাতা ওল্টাচ্ছিলো।

"তুই হঠাৎ কি মনে করে? কিছু খবর আছে?"

"না।"

"তা'হলে আবার কি করতে এলি?"

খাটের বাজু ধরে লক্ষ্মী আস্তে আস্তে বল্ল, "আপনার কাছে এলাম।"

শঙ্খ বল্ল, "না, না, এখন যাও এখান থেকে। কেউ আবার এসে পড়বে।"

"সবাই ঘুমিয়েছে।"

শঙ্খ কোনো উত্তর দিলো না।

"আপনার পা টিপে দেবো?"

"না।" তারপর বল্লে, "আচ্ছা দে!"

শঙ্খের পায়ের কাছে বসে পায়ে হাত বুলোতে লাগলো লক্ষ্মী।

তারপর আস্তে আস্তে বল্ল, "আমার কি ব্যবস্থা করলেন?"

"দাঁড়া, এদিকের গণ্ডগোল একটু মিটিয়ে নিই, তারপর দেখা যাক কি করা যায়।"

"কি আর করবে তারপর। লাতুরীদিকে বিয়ে করবে আর আমাকে বাড়ীতে ঢুকতে দেবে না।"

"না, না, তা হবে কেন। তুই কাজ করবি আমাদের এখানে—"

একটু চুপ করে রইলো লক্ষ্মী। তারপর বল্ল, "হ্যাঁ, ছোটোজাতের মেয়ে হয়ে যখন জন্মেছি, তখন যাকে আমার সবই দিলাম, তাকে নিয়ে যে অন্যলোকে ঘর করবে, তাই আমায় সয়ে থাকতে হবে আর তারই ঝি-গিরি করতে হবে।"

"তুই কি আশা করিস আমি তোকে নিয়ে ঘর করবো ?"

হঠাৎ লক্ষ্মীর চোখ দুটো জলে ভরে গেল। ধরা গলায় বল্লে, "না, আশা করি না মেজোবাবু। আমি তোমাদের ভদ্রঘরের মেয়ে নই, আমার কুল গৌরব কিছু নেই, টাকা নেই, বিদ্যে নেই, আমার পক্ষে সে আশা করাও অন্যায়। নেহাত ভগবান ঠাট্টা করে রূপটা দিয়েছেন, তা'তেই তোমার অনুগ্রহ পাওয়া গেল একটু, তাই মাথা পেতে নিলাম। তার বেশী আমি চাইওনি কিছু।"

"তোর একটা বিয়ে দিয়ে দিই লক্ষ্মী—।"

"আমার জাতের ছেলেরা আমায় বিয়ে করবে কেন, ওরা কিছু জানেনা ভেবেছো ?"

শঙ্খ একটু ভাবলো। তারপর বল্ল, "এক কাজ কর লক্ষ্মী, আবুল মিঞার ছেলেকে বিয়ে কর। ওর জমিটা প্রসাদ মামার কাচে বাঁধা আছে। চেপে ধরলে ও রাজি হয়ে যেতে পারে। আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। তুই পালিয়ে যা ওর সঙ্গে। তোকে যাতে জীবনে কোনোদিন কষ্টে পড়তে না হয় সে আমি দেখবো'খন।"

লক্ষ্মী একটু তাকিয়ে রইলো শঙ্খের দিকে। তারপর বল্ল, "তোমার আসল মতলব আমি বুঝি মেজোবাবু। গাঁয়ের হিন্দুমুসলমান চাষী জেলে মাঝি মজুর সবাই জোট বাঁধছে তোমাদের বিরুদ্ধে, এখন কোনো রকমে তাদের মধ্যে মনোমালিন্য করিয়ে দিতে পারলেই তোমাদের পোয়া বারো। একটি মুসলমান ছেলে একটি হিন্দুর মেয়ে নিয়ে পালিয়ে গেছে এর চেয়ে বড়ো ছুতো তার জন্যে আর কি হতে পারে, তাই না ? লক্ষ্মী তোমার মুখ চেয়ে অনেক অন্যায় করেছে, অনেক অন্যায় সয়েছে, আর বেশী কিছু তার থেকে আশা কোরো না মেজোবাবু।"

"তুই কি চাস লক্ষ্মী," শঙ্খ জিজ্ঞেস করলো।

"আমি আমার জন্যে কিছু চাইনা। তবে তোমার ভালোর জন্যে একটা কথা বলছি, আমার উপর রাগ কোরোনা মেজোবাবু, আমার কথা শোনো। কেন জানিনা, আমার মন বলছে তোমার বড় বিপদ আসছে। তুমি যা সব করছো, এতে পরের ক্ষতি করে নিজের কোনো দিন ভাল হয় না। এসব ছেড়ে দাও তুমি। লাতুরীদিকে বিয়ে কোরো না, ওকে বিয়ে করলে তুমিও সুখী হবে না, সেও হবে না। তুমি এ গাঁয়ে আর থেকো না। তুমি না আমায় একদিন বলেছিলে আমায় নিয়ে অনেক দূরে কোথাও চলে যাবে। তাই চলো। চলো আমরা অন্য কোথাও চলে যাই। সেখানে গিয়ে তুমি যাকে খুশি বিয়ে করো, আমায় শুধু তোমার বাড়ির ঝি করে রেখো, তার বেশী আমি কিছু চাইনা। এখানে বসে তুমি দেশ শুদ্ধ লোকের সর্বনাশ করে বেড়াবে, তারপর নিজের সর্বনাশ ডেকে আনবে, সে আমি হতে দেবো না।"

"তুই এখন যা লক্ষ্মী, আমার ঘুম পাচ্ছে।"

"তোমার ভালোর জন্যেই বলছি মেজোবাবু—"

"যা, যা, আজেবাজে কথা বলে আমায় আর বিরক্ত করিস নে—।"

"তোমার পায়ে পড়ি মেজোবাবু—।" শঙ্খের পা'দুটো জড়িয়ে ধরলো লক্ষ্মী।

অকস্মাৎ ধৈর্যচ্যুতি ঘটলো শঙ্খের।

"তোর সঙ্গে ভালো ব্যবহার করি বলে তোর বড্ড বাড় বেড়েছে লক্ষ্মী—।" বলে পা দিয়ে জোরে ঠেলে দিলো লক্ষ্মীকে।

আচমকা ঠেলা খেয়ে মাটিতে পড়ে গেল লক্ষ্মী।

বিদ্যুতের আগুন খেলে গেল লক্ষ্মীর চোখের জলে। আস্তে

আস্তে উঠে দাঁড়ালো সে। বল্ল, "কি ভুল করে যে তোমায় অন্ধ চোখে দেখেছিলাম মেজোবাবু, তাই ভেবে এখন আপশোষ হচ্ছে। যখন চাল নেই দেশে, আমার জ্ঞাতি স্বজনেরা উপোষ করে মরেছে, তখন তোমরা ধান নিয়ে কি করছো জেনেও কাউকে কিছু বলিনি, সে শুধু তোমারই জন্যে। দেশের লোক অসুখে বিসুখে মরছে আর তোমরা সমস্ত ওষুধপত্তর নিয়ে কি করছো, সে কথা জেনেও চুপ করে গেছি। এ পাপের শাস্তি আমার পাওনা ছিলো, মেজোবাবু। তোমার কাছ থেকে আজ তাই পেলাম।"

শঙ্খ আস্তে আস্তে উঠে বসলো খাটের উপর।

লক্ষ্মী বল্ল, "তুমি যখন আমার কথা শুনবে না, তখন আমি আর আসবো না তোমার কাছে। তবে অন্য লোকের কোনো ক্ষতিও তোমায় আর করতে দেবো না। আমি আজই ছোটোবাবুকে আর লাতুরীদিকে গিয়ে বলছি তুমি ছোটোবাবুর নামে পুলিশে খবর দিতে চাও আর ওদের জানিয়ে দিচ্ছি তুমি ওষুধ পত্তর নিয়ে কি করেছো, তোমাদের জাল ওষুধ সব কোথায় তৈরী করো আর কোথায় রাখো সে সব—।"

"লক্ষ্মী!" শঙ্খ উঠে এসে লক্ষ্মীর একটি হাত ধরলো, "তুই আমার সামান্য কথাতেই এত রাগ করলি। আমার মাথার ঠিক নেই লক্ষ্মী, তুই জানিস আমার উপর দিয়ে কতো ঝঞ্ঝাট যাচ্ছে।"

লক্ষ্মীর চোখ থেকে জলের ধারা নামলো।

"বাইরে যাওয়ার কথা যে আমি ভাবছিনা তা'নয়, তবে দাদুকে আর মাকে ছেড়ে দূরে তো কোথাও যেতে পারবো না। আর লাতুরীর কথা বলছিস; ও আমার বিয়ে করবে না বলে দিয়েছে। আমি এ গাঁয়ে আর থাকবো না। ভাবছি মাকে নিয়ে শহরে গিয়ে থাকবো। তুই যাবি আমাদের সঙ্গে?"

"কবে যাবে ?"

"এই কিছুদিনের মধ্যেই। আজ তুই এত পাগলামি করছিস কেন লক্ষ্মী, তোর কি শরীর খারাপ হয়েছে ? কদিন ধরে দেখছি তুই বড্ড রোগা হয়ে গেছিস। কি হয়েছে তোর ? সেই মাথাধরাটা কমেনি—?"

"না, মেজোবাবু, প্রত্যেকদিন সন্ধ্যার পর মাথাটা বড্ড ধরে।"

"তুই কি আজকাল হাস্রিদির বাড়িতেই ঘুমোস না কি ?"

"না, রাত্তিরে বাড়ি ফিরতে হয়, বাবাকে একটু দেখাশোনা করতে হয়। মা মারা যাওয়ার পর বাবাকে কতোবার বল্লাম আরেকটি বিয়ে করো, কিছুতেই শুনলো না।"

"কানাই পুত্র রাত্তিরে কখন ফেরে ?"

"আজ একটু দেরী করে ফিরবে। কালাইয়ার হাটে গেছে। ফিরতে অনেক রাত হবে।"

"আচ্ছা, আমি আজ আসবো একবার। তোকে একটা ওষুধ দেবো। একটা ইনজেকশান। ইনজেকশান নিতে তোর ভয় করে না তো ?"

"তুমি দেবে, ভয় কিসের। একটু লাগে, এই যা—।"

"কিচ্ছু লাগবে না। মাথাধরাটা সেরে যাবে একেবারে। শরীরটার একটু যত্ন নে লক্ষ্মী, শরীরটার একটু যত্ন নে।"

লক্ষ্মী তার জলে ভাসা চোখ নিয়ে তাকালো শঙ্খের দিকে।

কিন্তু শঙ্খের মাথায় তখন অন্য জিনিষ ঘুরছে। শ্যামল যে সব ওষুধ এনেছে, তার মধ্যে আছে মরফিয়া, সেটার ডোজ একটু বেশী করে দিলেই—।......কে আর জানছে এই গাঁয়ে, ছোটোলোকের মেয়ে, কেউ মাথাও ঘামাবে না......।

কিন্তু মরফিয়া তো বার করে আনতে হবে ওষুধের প্যাকেজ থেকে।

ঘড়ির দিকে তাকালো। ঠিক আড়াইটে। বাইরে রোদ্দুর খাঁ খাঁ করছে। বহু দূর আকাশ থেকে চিলের তীক্ষ্ণ চিৎকার ভেসে এলো।

না, এই বেলা বেরিয়ে পড়তে হয়।

এই ভরা দুপুরে কারো টের পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই, শঙ্খ ভাবলো।

● ● ● ● ● ●

থমথমে দুপুর। কড়া রোদ্দুরে শেতবন নেতিয়ে আছে।

তারই পাশ দিয়ে শুকিয়ে যাওয়া ডোবার রোদ্দুরে-ফাটা পাড় বেয়ে ডিসপেনসারির পেছন থেকে এসে পৌঁছালো শঙ্খকুমার। একলাফে পেছন দিকের নোংরা গড়টা পেরুতে অসুবিধে হোলো না। বাঁশের বেড়া ডিঙিয়ে ভেতরে ঢুকলো সে। রোববার দুপুর বিকেল ডিসপেনসারি বন্ধ। উঁকি মেরে দেখলো সামনের দিকের কুঠুরিতে চৌকির উপর নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে বুড়ো হারাণ কম্পাউণ্ডার। বাইরের বারান্দায় সিঁড়ির কাছে খাটিয়া পেতে ঘুমুচ্ছে ডিসপেনসারির চৌকিদার নিতাই-চরণ।

পা টিপে টিপে তার পাশ কাটিয়ে দুতলায় উঠে এলো শঙ্খ। বারান্দায় দাঁড়িয়ে চারদিক একবার তাকিয়ে নিলো। কোনো জন-মানবের সাড়া পাওয়া গেল না কোনো দিকে। শুধু বহুদূরে দত্তপাড়ার কাদের বাড়ির গোয়ালঘর থেকে একটি গরুর হাম্বারব ভেসে এলো। মালঘরটা পেছন দিকে। বারান্দা পেরিয়ে সেদিকে চলে গেল শঙ্খ। পকেট থেকে বার করলো নকল চাবি, একটি মালঘরের, আরেকটি লোহার আলমারীর। ঘরের তালাটা খুলো আস্তে আস্তে। ঘরের মধ্যে ঢুকে ভেজিয়ে দিলো দরজাটা। জানালাগুলো সব বন্ধ। ভিতরটা ঘুটঘুটে অন্ধকার। পকেট থেকে একটি টর্চলাইট বার করলো।

আস্তে আস্তে খুলো আলমারীর দরজা। বার করে নিলো ওষুধের কার্ডবোর্ডের প্যাকেজটি। নামালো ঘরের মেঝের উপর। আস্তে আস্তে জলে ভিজিয়ে লেবেলটি তুলে প্যাকেটটি খুলো। একটি একটি করে বার করে নিলো ইনজেকশানের বাক্স। রাগ হোলো শ্যামলের উপর। হতভাগা মরফিয়া রেখেছে একেবারে নীচে।

হঠাৎ একটি দমকা হাওয়া এলো। জানালাগুলো নড়ে উঠলো। খুলে গেল দরজাটা। চমকে ফিরে তাকালো সে।

দমকা হাওয়াটা হঠাৎ এসেছিলো সত্যি, কিন্তু দরজাটা হাওয়ায় খুলে যায়নি। দরজায় দাঁড়িয়ে কারা যেন! কারা? শ্যামল, লাতুরী —আর কে? ওরা ঘরে ঢুকলো একজনের পর একজন। অবনী দত্ত প্রকাশ গুহ, অশ্বিনী সেন,—তিনজনই ডিসপেনসারি কমিটির মেম্বার আর অরুণ চৌধুরী, বিমল মজুমদার—পল্লীরক্ষী বাহিনীর নেতা আর আরো অনেকে।

• • • • • •

কেটে গেল পাঁচ ছয়টি উত্তেজনাময় দিন।

লাতুরী শঙ্খকে বলেছিলো, "আগে যা সব তুমি এখান থেকে সরিয়েছো ওসব ফিরিয়ে দাও শঙ্খদা, তোমায় আর কিছু বলা হবে না।"

শঙ্খ বলে, "আমি কিছু জানিনা। তোমরা যা করতে পারো করো।"

পুলিশে খবর দেওয়া হোলো। পুলিশ এলো তদন্ত করতে। শঙ্খকে গ্রেপ্তার করা হোলো। দিন দুয়েক বাদে শঙ্খকে জামিনে খালাস করিয়ে আনলো প্রসাদ চৌধুরী। শঙ্খকে বাঁচাতে নানারকম তদ্বির করতে লাগলো সে। সবাই বুঝলো শেষ পর্যন্ত হয়তো ছাড়া পেয়ে যাবে শঙ্খ। কিন্তু ডিসপেনসারিতে ফেরার আর কোনো পথ তার রইলো না। কমিটি মেম্বারদের বেশীর ভাগ একযোগে হাটিয়ে

দিলো তাকে। প্রসাদ চৌধুরীর দলের লোক যারা ছিলো, কেউ কোনো কথা বল্ল না।

তবে সরানো গেল না প্রসাদ চৌধুরীকে। তার বিরুদ্ধে কোনো কিছু জানা নেই।

ডিসপেনসারির নতুন ডাক্তার এলো বরমা গ্রাম থেকে। অল্প বয়েসী ছোকরা। নতুন এল-এম-এফ্ পাশ করে বেরিয়েছে চাটগাঁ সহরের মেডিকেল স্কুল থেকে। নাম নির্মল সেনগুপ্ত।

* * * * *

দিন কয়েক পর একদিন সন্ধ্যেবেলা। কৃষ্ণপক্ষের গুমোট রাত প্রথম প্রহরেই থমথমে হয়ে উঠেছিলো নিসাড় গাছপালার অন্ধকার ডালে ডালে। আকাশের ঘুম-না-জানা তারাগুলো চোখ পিটপিট করে তাকিয়ে দেখছিলো ঝোপে ঝাড়ে ঝিকমিকে আলোর ফুলঝুরি ঝরানো জোনাকীদের, আর উঠোনের ওপাশের জঙ্গলে একটানা ডেকে চলেছিলো কয়েকটি নিরলস ঝিঁঝিঁপোকা।

শ্যামল তাড়াতাড়ি খাওয়াদাওয়া সেরে হ্যারিকেন লণ্ঠন হাতে নীচে থেকে উপরে উঠে এলো। এসে দেখলো তার বিছানা তৈরী, মশারী খাটানো। এদিক ওদিক তাকালো, যদি সামনের বা পেছনের বারান্দায় তার আভাস পাওয়া যায়, যদি মৃদু হাওয়ায় ভেসে আসে তার চুলের গন্ধ, বারান্দার আধো অন্ধকার থেকে যদি শোনা যায় তার দু'হাতের চুড়ির বা আঁচলের চাবির ক্ষীণ মিঠে শব্দ, যে প্রত্যেকদিন এসে তার বিছানা তৈরী করে যায়, খাটিয়ে দেয় তার মশারী, সাজিয়ে রাখে টেবিলের বইগুলো, ঢাকা দিয়ে রেখে যায় একগ্লাস জল, একবাটি জলে ভিজিয়ে রাখে কয়েকটি গন্ধরাজ ফুল,—কিন্তু সামনে আর আসে না।

কারো সাড়া পাওয়া গেল না। থমথমে রাত আরো নিথর হয়ে উঠলো।

হারিকেন লণ্ঠনটি টেবিলের উপর রেখে সলতেটি নামিয়ে আলো কমিয়ে দিলো। জানালার গরাদগুলির দীর্ঘ সরু সরু ছায়া পড়লো বাইরের বারান্দায়। দেখলো বাইরে পাটি পেতে বারান্দার রেলিঙে হেলান দিয়ে চুল এলিয়ে কে বসে আছে।

আলোটা আরো কমিয়ে দিয়ে শ্যামল বাইরে বেরিয়ে এলো।

"কে, শ্যামলদা ?"

লাতুরীর সঙ্গে এই ক'দিন খুব বেশী দেখা হয়নি। নানা কাজে খুব ব্যস্ত সে। বাইরে থেকে খুব বেশী পরিবর্তন দেখা যায়নি তার মধ্যে, দেখা হতে হেসে কথা বলেছে আগেরই মতন, কিন্তু তবু যেন মনে হয়েছে কারো সান্নিধ্য যেন খুব বেশীক্ষণ ভালো লাগে না লাতুরীর। কেমন যেন মনে হয়েছে হতাশ ক্লান্তির বিষণ্ণ ছায়া নেমেছে তার চোখের কোণে, তবু সে কাজের মেয়ে আরো বেশী কাজের মধ্যে ডুবে রইলো দিনের পর দিন।

"এসো, শ্যামলদা, এখানে এসে বোসো," লাতুরী বল্ল, "এই ক'দিন তোমার সঙ্গে গল্প করার সময়ই পাইনি। দাতু বলছিলো তোমার নাকি একা একা সময় কাটছে না কিছুতেই— ।"

"দাতু কি করে জানলো ?"

"ও নাকি দেখেছে তুমি হাতের কাছে যা'ই পাচ্ছো তাই পড়বার চেষ্টা করছো, জুনোর হাসিখুশি, কুন্তলা পিসীর মহাভারত, দাদার হোমিওপ্যাথিক বই," বলে হাসলো লাতুরী।

"দাতু কোথায় থাকে সারাদিন ? ওকে দেখতেই পাইনে," শ্যামল বল্ল।

"দাতু আর তোমার সামনে কোন মুখে বেরোয় বলো ?"

শ্যামল কোন উত্তর দিলো না। বাইরের অন্ধকারে একটানা ডেকে চল্ল ঝিঁঝি পোকাগুলো।

অনেকক্ষণ পর লাতুরী বল্ল, "আমি তোমায় খুঁজছিলাম সন্ধ্যের পর থেকে।"

"পুকুরপাড়ে বসেছিলাম চুপচাপ।"

"হ্যাঁ, হাসি বৌদি তাই বল্ল।"

কি ব্যাপার?"

"এমন কিছু নয়," লাতুরী আস্তে আস্তে বল্ল, "বৌদি একটি কথা বলছিলো আজ। ভাবলাম তোমায় জানাবো।"

শ্যামল শুনলো চুপচাপ।

"আমি চাইনা যে তুমি কোনো রকম দুঃখ পাও," লাতুরী বল্ল, "সে জন্যেই বলছি।" একটু চুপ করে রইলো লাতুরী। তারপর বল্ল, "হাসি বৌদি বলছিলো আমার বিয়ের কথা। কার সঙ্গে জানো? তোমার সঙ্গে। আচ্ছা, তুমি বলো শ্যামল দা, সে কি করে হয়? তুমি তো আমাকে জানো। অনেক কথা তোমায় বলেছি। তোমার কাছে এত সহজ কেন হতে পেরেছি, তাও তুমি জানো। তোমায় কি চোখে দেখি, কতোখানি আপন ভাবি, তাও তোমার অজানা নয়। এর পর তোমার সঙ্গেই বিয়ের কথা উঠলে আমার মনে লাগে না?"

কোনো কথা বল্ল না শ্যামল।

লাতুরী বলে গেল, "বৌদি আমায় বড্ড ভালোবাসে। তোমাকেও। তাই ভেবেছে শঙ্খদা'র ব্যাপারে আমার মন ভেঙে গেলে তোমার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে আমায় সুখী করবার চেষ্টা করবে। বৌদির দোষ নেই, ভায়ের সঙ্গে ননদের বিয়ে দিতে পারলে কোন বৌদি খুশি হয় না বলো, কিন্তু শ্যামল দা, মানুষের মনে জোড়াতালি দেওয়া কি এতই সহজ? জীবনে যেই একজনকে ভালোবাসলাম, সে যে এই ভালোবাসার দাম দিতে পারলো না, সে যে সমাজের, সংসারের,

সাধারণ মানুষের জীবনের আর আমার মতো সাধারণ মেয়ের সাদাসিধে সমস্ত সুখের শত্রু হয়ে দাঁড়ালো, নেমে গেল এমন একটি জায়গায় যেখানে প্লেগ কলেরার জীবাণুর চেয়েও বেশী ভয় পেতে হয় তাকে, এর চেয়ে বড়ো আঘাত কোনো মেয়ের জীবনে আসতে পারে? আজ আর সেদিন নেই যে ভালোবাসার কাছে আর সব কিছু তুচ্ছ মনে করে, যাকে ভালোবাসি তার সমস্ত দোষ ত্রুটি চোখ বুজে মেনে নিয়ে সমাজ সংসার ত্যাগ করে তার সঙ্গে ভেসে পড়বো। আসেপাশের মানুষকে নিয়েই আজকের দিনের জীবন, সেই মানুষের যারা শত্রু, তাদের ভালোবেসে তাদের সঙ্গে সংসার পাতলে জীবনে কোনো সার্থকতা আসে না। ভালোবেসে সুখের ঘর বাঁধা যায় শুধু তারই সঙ্গে, যে নিজের ঘর বাঁধতে গিয়ে আর দশজনের ঘর ভাঙে না।"

বলতে বলতে আনমনা হয়ে গেল মাতুরী, কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো অন্ধকার আকাশের দিকে, তারপর বল্লে, "কিন্তু শঙ্খদাকে ভালোবাসলাম যখন, তখন সে ছিলো আমাদের আর দশজনেরই মতো। তবু সে যে বদলে গেল, আমার ভালোবাসা কোনো দাগই কাটতে পারলো না তার মনে, ভালোবাসার চরম ব্যর্থতা এর চেয়ে বেশী আর কি হতে পারে? জানো শ্যামল দা, তবু আমি হার মানতে পারছি না। আমার চেয়ে অনেক বেশী প্রভাব আজকের দিনের এই যুদ্ধের নোঙরা আবহাওয়ার। আমি যেন তাকে সাধারণ মানুষের মধ্যে ধরে রাখতে পারলাম না, যুদ্ধের আবহাওয়া তাকে টেনে অনেক নীচে নামিয়ে দিলো, এ আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না। এ এক মস্তো সমস্যা শ্যামলদা, এ সময়ে অন্য কাউকে বিয়ে করে ফেললে সমস্যার সমাধান হয় না, যেটা হয় সে হোলো সমস্যাটা এড়িয়ে যাওয়া। আমার পক্ষে তো

সে সম্ভব নয়। সমাজের অন্যান্য কাজের ক্ষেত্রে আজকের দিনের দূষিত আবহাওয়ার চ্যালেঞ্জ আমি নিয়েছি, নিজের জীবনে সেটা এড়িয়ে গেলে চলবে কেন? আমার মনে হয় এখনো সময় আছে। শঙ্খদাকে আমি কিছুতেই নষ্ট হতে দিতে পারবো না।"

"ওর সম্বন্ধে তুমি এখনো আশা রাখো," শ্যামল জিজ্ঞেস করলো।

"হ্যাঁ রাখি বই কি," লাতুরী বল্ল, "কারো উপর আশা না রাখলে যে তার জন্যে কিছুই করা যায় না।"

আর কিছু বল্ল না শ্যামল।

"কিন্তু আমার মনে সব চেয়ে বেশী দাগা দিলে তুমি," লাতুরী বল্ল।

"কেন ?"

"সব জেনে শুনে এ ভুল তুমি করলে কেন ?"

"কি ভুল ?"

"আমায় চুরি করে ভালোবাসলে কেন ?"

হঠাৎ দুরুদুরু করে উঠলো শ্যামলের বুক। সামলে নিয়ে বল্ল, "কে বল্লে তোমায় ?"

"সে কথা থাক। সত্যি কিনা বলো—।"

"আমি ভুল ভেবে কিছু করি নি। কিছু আশা করেও করি নি," শ্যামল আস্তে আস্তে বল্ল।

শুনে লাতুরী চুপ করে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর প্রায় শোনা না যাওয়া গলায় বল্ল, "কিন্তু আমার তো কিছু করবার নেই শ্যামলদা।"

শ্যামল হেসে খুব সহজ গলায় বল্ল, "যাক গে, এসব সামান্য ব্যাপার নিয়ে তোমায় আর ভাবতে হবে না। তুমি শুয়ে পড়ো গে। আমিও শুতে যাই। অনেক রাত হোলো। ও কে আসছে ? হাসিদি না ?"

"তোরা শুতে যাস নি এখনো," হাসি দি নীচে থেকে উঠে এসে বল্ল। "করছিস কি তোরা?"

"এমনি বসে গল্প করছিলাম," শ্যামল বল্ল।

শ্যামল উঠে গিয়ে শুয়ে পড়লো। শুনলো হাসিদি আর লাতুরী গল্প করছে পাটির উপর বসে। কেমন যেন আনমনা মনে হোলো লাতুরীর দূর থেকে ভেসে আসা কথাগুলো। ঘুম পেয়ে এলো।

তারপর হঠাৎ কখন সাড়া পেলো হাসিদির। "শ্যামল, ঘুমিয়ে পড়েছিস?"

শ্যামল কোনো উত্তর দিলো না। পড়ে রইলো চোখ বুজে।

হাসি দি কপালে গলায় হাত দিয়ে দেখলো শ্যামল ঘামে নেয়ে গেছে। আঁচল দিয়ে মুখটা মুছে দিলো আস্তে আস্তে, পাখার হাওয়া করলো কিছুক্ষণ, তারপর মশারীটা নামিয়ে, চারপাশ গুঁজে দিয়ে চলে গেল।

তারপর দিন সকালে শ্যামল যখন চা খেতে নামলো জামাকাপড় পড়ে, কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে, লাতুরী জিজ্ঞেস করলো, "আজ হঠাৎ কোথায় চল্লে?"

"শহরে যাচ্ছি।"

"আজই ফিরবে তো, না থাকবে কিছুদিন?"

"ভাবছি দিন পোনেরো কুড়ি থাকবো—।"

"সে কি? এদ্দিন—।"

"মেশোমশাই বলছিলেন—।"

"আমার উপর রাগ করে চলে যাচ্ছো না তো?"

"পাগল না কি? কলেজ ছুটি হয়ে গেল, তাই ভাবছি দিন কতক ঘুরে বেড়াই এদিক ওদিক। কিছুদিনের মধ্যে মহামুনির মেলা সুরু হবে। সেটা দেখে তারপর ফিরবো।"

"এ রোববারের পরের রোববারের আগে ফিরো কিন্তু। আমাদের সমিতির বাৎসরিক অনুষ্ঠান হবে সেদিন। একটি মেয়ে তোমার লেখা একটি কবিতা আবৃত্তি করবে। কি চমৎকার আবৃত্তি করে, এলে শুনবে 'খন।"

একটু চুপ করে থেকে বল্ল, "আচ্ছা, শ্যামলদা, তুমি অনেকদিন লেখো নি, না?"

শ্যামল হেসে বল্ল, "ভাবছি আবার লেখা সুরু করবো।"

(সাত)

শ্যামল ফিরলো দিন দশ বারোর মধ্যেই।

ফেরার পথে সাম্পানের দাঁড় বাইতে বাইতে আবুল মাঝি জিজ্ঞেস করলো—"লক্ষ্মীর খবর রাখেন কিছু?"

"না। কেন?" শ্যামল বল্ল।

"ও অনেক বদলে গেছে এই ক'দিনে," আবুল মাঝি বল্ল, "ছিলো শঙ্খবাবুর সোহাগের তাঁবেদার, এখন বিয়ে করেছে জেলেপাড়ার দাশরথি ঘরামীর ছেলে ধনাকে।"

শঙ্খ নাকি লক্ষ্মীকে কথা দিয়েছিলো তাকে নিয়ে শহরে চলে যাবে। সে পুলিশ হাজত থেকে জামিনে খালাস পাওয়ার দিন দুই পর লক্ষ্মী তাকে গিয়ে বল্ল যে আমার কথা আগে শুনলে না, শুনলে এত কেলেঙ্কারী হোতো না। যা হবার হয়েছে, এখন আর বেশী কিছু গণ্ডগোল হবার আগে চলো আমরা এখান থেকে চলে যাই।

লক্ষ্মী বেশী কিছু আশা করেনি শঙ্খের কাছ থেকে। শুধু চেয়েছিলো চোরাই ব্যবসার কেলেঙ্কারী থেকে শঙ্খকে বার করে নিয়ে আসতে। তার ভয় শঙ্খ এসবের মধ্যে জড়িয়ে থাকার দরুণ কোনো সাংঘাতিক বিপদে না পড়ে যায়। সে শঙ্খকে ভালোবাসতো। তাই শঙ্খের বিপদের ভয়ে তার চোখে ঘুম ছিলো না। শঙ্খকে সে একেবারে নিজের করে পাবে সে আশা করেনি। সে শঙ্খকেও বলেছিলো, শঙ্খর মা'কেও বলেছিলো, শঙ্খকে শহরে নিয়ে এসে যেন যেখোজমে

একটি ভালো মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হয়, যে লাতুরীর মতো গাঁয়ে গাঁয়ে মিটিং করে বেড়াবে না, যে নিরিবিলি ঘর সংসার করবে আর দশজন গেরস্ত ঘরের মেয়ের মতো। সে নিজে শঙ্খের বাড়িতে ঝিয়ের কাজ করতে পেলেই খুশি।

কিন্তু কি জানি কেন লক্ষ্মীর উপর সম্প্রতি খুব রাগ করেছিলো শঙ্খ। লক্ষ্মীর কথা শুনে তার মেজাজ গরম হয়ে গেল। লক্ষ্মীকে ঘর থেকে বার করে দিলো চুলের ঝুঁটি ধরে।

সে কথা জানাজানি হয়ে গেল চারদিকে। লক্ষ্মীকে দেখলেই লোকে মুখ টিপে হাসে। তার জাতের কেউ তাকে দেখলেই থুতু ফেলে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

লক্ষ্মীর ভীষণ রাগ। ঠিক করলো এর শোধ নেবে।

শঙ্খের বাড়িতে অনেকদিন কাজ করেছে বলে এদের ব্যাপার স্যাপার কিছু জানতো। চুরি করে আনা ওষুধ আর জাল ওষুধ বা ভেজাল ওষুধ সে কোথায় জড়ো করে রাখতো লক্ষ্মী জানতো।

একদিন সে লোকজন নিয়ে চড়াও হোলো গোপাল সেনের বাড়ি। সে বাড়ির পেছন দিকে একটি পুরোনো গোলাঘর আছে যেখানে এখন কিছু আর রাখা হয়না। রাখা হয় শুধু কুড়ি পঁচিশ হাঁড়ি গুড়। সেখানেই লুকিয়ে রাখা হোতো ওষুধ পত্তর।

লক্ষ্মীর কথা শুনে অনেকেই গেল—লাতুরী, ভূপতি মজুমদার, অবনী দত্ত, অশ্বিনী সেন, প্রকাশ গুহ, ইত্যাদি, পল্লীমঙ্গল সমিতির অনেকেই। গিয়ে দেখলো পুরোনো গোলাঘর একেবারে ফাঁকা পড়ে আছে।

তখন আরেক প্রস্থ গালিগালাজ শুনতে হোলো লক্ষ্মীকে। লাতুরী না থাকলে শঙ্খ হয়তো সেদিন খুন করে ফেলতো লক্ষ্মীকে। লক্ষ্মীকে

দেখলে সবার মুখ টেপা হাসি বেড়ে গেল। তার জাতের কেউ কথা বল্ল না তার সঙ্গে।

কয়েকদিন মুখ বুঝে সহ্য করলো লক্ষ্মী। একদিন অসহ্য হয়ে উঠলো। অসহ্য হয়ে উঠলো সবার হাসি আর ব্যঙ্গ, অসহ্য হয়ে উঠলো আপনজনের অবজ্ঞা, অসহ্য হয়ে উঠলো তাদের জাতের সমস্ত সামাজিক অনুষ্ঠান থেকে তার নিজের বাদ পড়ে যাওয়া। সেদিন লক্ষ্মী একটি কলসী নিয়ে চলে এলো কর্ণফুলীর পাড়ে। খেজুর গাছের তলায় বসে অনেকক্ষণ কাঁদলো নিজের মনে। তারপর কলসী নিয়ে জলে নেমে পড়লো।

সে সময় নদীর মাঝখানে ডিঙ্গি নৌকো থেকে জাল ছুঁড়ে মাছ ধরছিলো জেলে পাড়ার দাশরথী ঘরামীর ছেলে ধনা।

সে নাকি লক্ষ্মীকে আগে কখনো দেখেনি।

দূর থেকে একটি মেয়েকে কলসী নিয়ে জলে নেমে পড়তে দেখে কি রকম যেন সন্দেহ হোলো ধনার। সে ডিঙ্গি বেয়ে চলে এলো ঠিক যেখানটায় লক্ষ্মী জলে ডুব দিয়েছে। এসে দেখে জনমানবের কোনো নিশানা নেই জলের বুকে। শুধু এক জায়গায় জলের ভিতর থেকে বুদ্বুদ উঠছে।

ধনা জলে ঝাঁপ দিলে সেখানে। একবার, দু'বার, তিনবার।

* * * * *

চারবারের বার উঠে এলো লক্ষ্মীর বেহুঁশ দেহটি নিয়ে।

"আমায় বাঁচালে কেন," জ্ঞান ফিরে আসতে লক্ষ্মী বল্ল।

"মরে যাওয়া কি ভালো," বল্ল দাশরথী ঘরামীর ছেলে ধনা।

"আমি কে জানলে বলতে আমার মরে যাওয়াই ভালো।"

"তুমি কে?"

"আমি কানাই পুতুর মেয়ে লক্ষ্মী।"

"ও!" লক্ষ্মীর কথা শুনেছিলো ধনা। এই লক্ষ্মী? বেশতো দেখতে! সেনেদের বাড়ির মেজো বাবুটির জন্যে জলে ডুবে মরতে চাই-ছিলো শেষ পর্যন্ত? হায়রে গাধা মেয়ে, সে ভাবলো, বড়লোকের ছেলের জন্যে নিজের সুনামটা দিলি বলে কি প্রাণটাও দিবি?

বল্ল, "চলো বাড়ি যাই এবার।"

"না", লক্ষ্মী বল্ল, "বাড়ি যাবো না।"

"কোথায় যাবে তা'হলে?"

"ওখানে" আঙুল দিয়ে নদীর জল দেখিয়ে দিলো লক্ষ্মী, "উঠে বসতে পারলেই আবার জলে ঝাঁপ দেবো। আমার কলসীটি কোথায়?"

"বাড়ি যাবে না কেন?"

"ওখানে আমায় কেউ ভালোবাসে না।"

"তা'হলে আমাদের বাড়ি চলো।"

"কেন?"

"ওখানে তোমায় সবাই ভালোবাসবে।"

"ওখানে কে কে আছে?"

একটু চুপ করে রইলো লক্ষ্মী। তারপর বল্ল, "আমার যে বড় বদনাম।"

ধনা বল্ল, "যার বদনাম তাকে আমি চিনিনা। দেবতারা সমুদ্দুর থেকে তাদের লক্ষ্মীকে তুলে এনেছিলো, আমার লক্ষ্মীকে আমি তুলে আনলাম কর্ণফুলী থেকে। দেখি কে আছে বাপের ব্যাটা তার নামে কিছু বলে। দেখিয়ে দেবো দাশরথির ছেলে ধনার হাতের লাঠির মার কি জিনিষ।"

দিন পাঁচেক পর লক্ষ্মীর সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল ধনার।

সেদিন থেকে লক্ষী বদলে গেল। লাতুরীর ডান হাত হয়ে জুড়ে গেল জেলে কিষাণ ক্ষেত মজুরদের মধ্যে নানা রকম কাজে। কোথায় কোন বাবুদের বাড়ি বেগার খাটায় তাদের সাত পুরুষের গোলাম বাড়ির মেয়েপুরুষদের, তাদের গিয়ে বলে, বেগার খেটোনা, ওরা গোলাম করে রেখেছিলো তোমাদের পিতামহের বাপ জ্যাঠাদের, তোমরা কারো গোলাম নও, বিনে পয়সায় কারো উঠোনের শুকনো পাতাও কুড়োবে না। কোথায় কোন মহাজন তাল ঠুকছে কবে সমস্ত ধান তুলে নেবে বলে, তার খাতককে গিয়ে বলে খবদ্দার, ধান দেবে না, বলো ধান বেচে টাকা দেবো, জোর জবরদস্তি করতে গেলে রক্তারক্তি হয়ে যাবে। আর বাড়ি বাড়ি গিয়ে বোঝায় তোমাদের জমি চাই, স্কুল চাই, দাওয়াখানা চাই, তোমাদের ন্যায্য মজুরী চাই, সুদ মাপ চাই, খাজনা মকুব চাই, তোমাদের ঋণ সালিশী বোর্ডে তোমাদের নিজেদের লোক চাই, ঘুষখোর জমিদারকে ঋণসালিশী বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট রাখা চলবেনা...

আবুল মাঝি বলে চলে, "ভদ্রলোকের ছেলেরা যারা কিষাণদের মধ্যে কাজ করে তাদের চেয়ে অনেক বেশী কাজ হোলো এই লক্ষীকে দিয়ে। শঙ্খবাবু ওর কথা শুনে ওকে শহরে নিয়ে গেলে ও কোথায় ভেসে যেতো দাদাবাবু, তাকে আর আমাদের মধ্যে পাওয়া যেতো না। বোধ হয় এরকমই হয় বাবু, গরীবের দরদ গরীবই বোঝে, ঘুরে ঘুরে আবার ফিরে আসে নিজের লোকের কাছে, যারা আসেনা তারা ভেসে চলে যায় দরিয়ার পানিতে ওই কুটোটির মতো।"

"লক্ষীর স্বামী ধনা প্রসাদ চৌধুরীর প্রজা," আবুল বলে চলে, "এ পর্যন্ত দু'বার আগুন লেগেছে তার বাড়িতে। লক্ষী তা'তে দমেনি। লক্ষীর বর ধনাও দমেনি। লক্ষী বলেছে, কর্তাদের দৌড় এপর্যন্তই।

এ আগুনে আমাদের কিছু হবে না। তবে যে আগুন আমরা জ্বালবো, তা'তে ওরা সব সাফ হয়ে যাবে।"

* * * * *

শ্যামল বাড়ি ফিরতেই হাসি দি বল্ল, "তুই এলি তা'হলে? এদ্দিন দেরী হোলো কেন? তোর আশাতো প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলাম রে। ওরা সবাই তোর পথ চেয়ে বসে আছে।"

"কারা?"

"লাতুরীরা—।"

"কেন?"

"অনেক ব্যাপার হয়ে গেছে এর মধ্যে। গোপাল সেন গার্লস্ স্কুল থেকে কয়েকজন মাষ্টারের চাকরী গেছে। ওরা সবাই লাতুরীর লোক। লাতুরীর চাকরীও গেছে। আর গেছে সাইর ঠাকুরের বৌ মাধুর চাকরী। বেচারি মাধু, ওদের বড় দুর্দিন যাচ্ছে। সেলাইএর মাষ্টারী করে ও কিছু টাকা ঘরে আনতো, তাও বন্ধ হোলো।"

"স্কুল তো দাদুর নামে। দাদু কিছু করতে পারলেন না?"

"স্কুলের প্রেসিডেন্ট প্রসাদ চৌধুরী। সেই সর্বেসর্বা। দাদুর কোনো ব্যাপারে আর হাত নেই আজকাল। বুড়ো হয়েছেন। কেউ ওঁর কথা শোনেনা।"

"কিন্তু স্কুল থেকে সবার চাকরি গেল কেন?"

"প্রসাদ চৌধুরী খুব ক্ষেপে গেছে লাতুরীদের উপর। শঙ্খেরও কিছু হাত আছে এ ব্যাপারে। তবে লাতুরীরা দমে যায় নি একটুও। লাতুরী যে ফ্রী প্রাইমারী স্কুলটি করেছিলো একটি তাই নিয়ে এরা সবাই উঠে পড়ে লেগেছে। ওরা একটি ছেলেদের স্কুলও খুলবে বলছে। তাই তোকে ওদের দরকার। ওটা হলে চালানোর ভার বোধ হয় তোকেই নিতে হবে।"

"কলেজে পড়িয়ে আমি কি এসব করে উঠতে পারবো," শ্যামল বল্ল, "তবে কলেজ তো মাস ছয়েকের জন্যে বন্ধ। দেখি, এসময়টুকু যা করা যায় ওদের জন্যে করবো'খন।"

হাসি দি বল্ল, "তুই কি ভাবছিস তুই কলেজের চাকরি রাখতে পারবি?"

"এ কথা বলছো কেন?" শ্যামল জিজ্ঞেস করলো।

"প্রসাদ চৌধুরী তোর নামে কি সব লিখেছে কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে। শুনছি তোকে ওরা আর রাখবে না।"

"ও। প্রসাদ চৌধুরী তা হলে আমার উপরও নেকনজর দিয়েছে।"

"তোকে দেশছাড়া করতে পারলে ও বেঁচে যায়," হাসি দি বল্ল, "তুই এসে যে এদের দল ভারী করেছিস সেটি ও খুব ভালো চোখে দেখছে না। আর শঙ্খের তো ভীষণ রাগ তোর উপর।"

"লাতুরীরা সব কোথায়," শ্যামল জিজ্ঞেস করলো।

"সবাই স্কুলে গেছে। দাতুও গেছে লাতুরীর সঙ্গে। সেও পড়াচ্ছে সেখানে। গিয়ে একবার দেখে আয় না। স্কুলটা কাছেই। রেবতী লালাদের বাড়ির ঠিক পেছনে।"

শ্যামল বেরিয়ে পড়ছিলো তক্ষুনি। হাসি দি বল্ল, "দাঁড়া, চায়ের জল চাপিয়েছি। খেয়ে যা। আর হ্যাঁ, একটা কথা তোকে বলবো কি বলবো না ভাবছিলাম। ছাখ, ওরা সব নানারকম বদনাম রটাচ্ছে তোর নামে। ওসবে কান দিস নে, বুঝলি। তুই যা ছেলেমানুষ, সামান্য কথাতেই মন খারাপ করে কি না কি করে বসিস তাই আমার ভয়। কোনো কিছু গায়ে মাখিস নে।"

"কি বদনাম রটাচ্ছে?"

"সে সব শুনে তোর কাজ নেই—।"

"শুনিই না। লাতুরীকে নিয়ে?"

"না।"

"তা হলে—?"

একটু ইতস্তত করে হাসি দি বল্ল, "দাতুকে নিয়ে। তবে তোকে কিছু ভাবতে হবে না এ নিয়ে। এসবের মূলে আছে শম্ভ। লোকে তাকে চিনে ফেলেছে। তাই এসব কথায় তেমন কান দিচ্ছে না কেউ—।"

চা খেতে খেতে শ্যামল ভাবলো অনেকক্ষণ। তারপর বল্ল, "হাসি দি। আমি এখান থেকে চলে যাই—।"

"কেন রে?"

"আমার এখানে থাকা নিয়ে যে কথা উঠছে তা'তে তোমার আমার কিছু যায় আসে না সত্যি, কিন্তু কুন্তলা মাসী পরে বড্ড অসুবিধেয় পড়বেন। মেয়েটিকে ওঁর বিয়ে দিতে হবে তো শেষ পর্যন্ত—।"

হাসি দি কোনো উত্তর দিলো না। কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো হাসি-মুখে। তারপর বল্ল, "দাতুর বিয়ের জন্যে তুই অতো ভাবছিস কেন। আমি কি নেই? ওর একটি ভালো বিয়ে আমি দেবোই যে করে হোক। ওর জন্যে একটু যদি করতে না পারলাম তো ওর বৌদি হয়ে এ বাড়ি এসেছি কেন?"

* * * * * * *

পথে সাইর ঠাকুরের বাড়ি পড়লো। শ্যামল ভাবলো, একবার দেখা করে যাই সাইর ঠাকুরের সঙ্গে। বড় কষ্টে আছে বেচারা!

"সাইর কাকা! সাইর কাকা!" উঠোনে দাঁড়িয়ে শ্যামল হাঁক ছাড়লো।

একটি ছোটো ছেলে বেরিয়ে এলো। বল্ল, "আপনি ভিতরে আসুন। বাইরে জুতো জোড়া খুলে শ্যামল ভিতরে উঠে এলো।

"সাইর কাকা কোথায়?"

"উনি পটিয়া গেছেন। বসুন। মাধু বৌদি বল্লেন আপনাকে ডেকে এনে বসাতে। উনি চাল ধুতে গেছেন পেছনের পুকুরে। আসছেন এক্ষুনি।"

একটু পরেই ঘরের ভিতর এসে ঢুকলো সাইর ঠাকুরের বৌ। ঘোমটা একটুখানি নামিয়ে বল্ল, "মেয়েকে বুঝি ভুলে গেলেন বাবা। এদ্দিন এখানে আছেন, সেই যে গেলেন আর এলেন না একবারও—।"

"নানা রকম ঝঞ্ঝাটের মধ্যে ছিলাম, জানেন তো সবই," শ্যামল বল্ল, "মাঝখানে কিছুদিন ছিলাম না এখানে। শহরে গিয়েছিলাম। আজ ফিরেছি। সাইর কাকা ফিরবেন কখন?"

"আজ তো ফিরবেন না। ফিরবেন কাল সকালে। পটিয়ার হারাণ মাঝির মেয়ের সঙ্গে হাওলার কৈলাস মণ্ডলের ছেলের বিয়ে। উনি বিয়েতে পুরুত হয়ে গেছেন পটিয়ায়।"

মুখে কিছু না কিছু বল্লেও একটি বিস্ময় ফুটে উঠলো শ্যামলের চোখে মুখে। সাইর ঠাকুরেরা খুব বনেদী বামুন। উঁচু জাত ছাড়া নীচু জাতের যজমানী করেন না।

"খুব অবাক হচ্ছেন না?" হাসলো সাইর ঠাকুরের বৌ। "আমরা এখন একরকম একঘরে হয়ে আছি জানেন?"

"একঘরে?"

"প্রায় তাই। ঠিক ধোপা নাপিত বন্ধ হওয়া নয়, কারণ কাপড় দু'চার খানা যা আছে আমিই কাচি, আর নিজের দাড়ি উনি নিজেই কামান, আর মাথায় তো আয়নার মতো টাকই", ধোপা নাপিত আমাদের দরকার হয়না" হাসতে হাসতে বল্ল সাইর ঠাকুরের বৌ। "তাছাড়া আজকালকার দিনে ধোপা নাপিত বন্ধ করা যায়ও না। ওদের চাল কেনবার পয়সা নিয়ে টানাটানি, খদ্দের বাছ বিচার করলে

ওদের চলে না। কিন্তু আমাদের যজমানেরা ওঁকে আর ডাকে না। অনেক বাড়িতেই ওঁর রোজকার পুজো করতে যাওয়াটা বন্ধ হয়ে গেছে।"

"কেন?"

"প্রসাদ চৌধুরী টিপে দিয়েছে সব বাড়ির কর্তাদের—।"

"ওসব বাড়ির ছেলেরা কি করছে। ওরা তো বেশীর ভাগই ওর উপর চটা।"

"ওরা চেষ্টা করছে অবশ্যি, কিন্তু বাড়ির ভিতরের ব্যাপারে ওদের কথা টেকেনি। ওরা এখনো চেষ্টা করছে কর্তাদের মত পাল্টানোর, কিন্তু এখন পর্যন্ত কিছু হয়ে ওঠেনি। বুড়োদের উপর ভীষণ প্রভাব প্রসাদ চৌধুরীর। ওরা সব জেনেশুনেও কিছু বুঝতে চায় না। আর, সবাই নানারকম বাধ্যবাধকতায় আছে চৌধুরী মশায়ের কাছে। ছেলেরা বলছিলো, দেখি অন্য কোন বামুন এসে পুজো করতে পারে, ঠেঙিয়ে হাড় ভেঙে দেবো। পুজো করাতে হয় তো এঁকে দিয়েই হবে, তা নইলে হবে না, বন্ধ থাকবে সবার গৃহ দেবতার পুজো। উনি বলেন, না ভাই ওসব করতে যেও না, আমায় ওরা একঘরে করতে চাইছে বলে গৃহদেবতাদের তোমরা একঘরে করবার চেষ্টা করতে যেও না, তাতে ভালো হবে না। আমি বল্লাম, সেটা বড়ো কথা নয়, একটি গরীব বামুনের রুজির ব্যবস্থা করতে গিয়ে আর দু'চারটি গরীব বামুনকে ধরে মার ধোর করাটা ঠিক হবে না, দোষ তো ওদের নয়। দরকার নেই আমাদের যজমানী করে, তার চেয়ে সুরেন ভটচাযদের কাছ থেকে বিঘে ছয়েক জমি বন্দোবস্ত নিয়ে তাতে হাল চষলে অনেক বেশী কাজ দেবে। উনি তো এক রকম রাজি হয়ে গেলেন। কিন্তু গাঁয়ের ছোটো জাতের লোকেরা হৈ হৈ করে ছুটে এলো। ওদের মোড়ল দেয়ারিচরণ বল্লে,

আমরা থাকতে আপনাকে হাল চষতে দেবো কেন ঠাকুর, যদি অপরাধ না নেন তো বলি, আমরা একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করছি হাটের পাশে বুড়ো বটগাছটির তলায়, আপনি সেটি দেখাশোনার ভার নিন। আমরা আপনাকে দু'বেলা খাইয়ে পরিয়ে রাখবো। আপনারা দু'জন লোক, কতোই বা লাগে আপনাদের চালিয়ে নিতে—। আমাদের জল অচল, তা' নইলে আমাদের বিয়ে শ্রাদ্ধ যা' কিছু সবই আপনাকে দিয়ে করিয়ে নিতাম।

"উনি একটু ইতস্তত করলেন। এতদিনকার সংস্কার একদিনে তো যায় না বাবা। কিন্তু আমার কাছে একটা কথা পরিষ্কার হয়ে গেল সেদিন। আজকের দুনিয়ার আর আগের দিনের জাতবিচার নেই। যাদের টাকা আছে, জমি আছে তারা একজাত। যাদের কিছু নেই, তারা একজাত। ব্যস, এই দু'জাতের লোক আছে দেশে। আমরা গরীব বামুন, তাই আমরাও এদের দলেই। ভরসা করলে এদের উপরই করতে হবে, বড় লোকদের উপর নয়। আমাদের দু'বেলা অন্ন জুটছে না বলে এরা ছুটে এলো, কই, আমাদের পাশের বাড়িতে ওঁর অতি নিকট জ্ঞাতি, সম্পর্কে আমার ভাসুর নাম করতে পারছি না, বেশ পয়সাওয়ালা, জমিদারী আছে বেশ কিছু, কই উনি তো খবর নিতে আসেন নি একবারও। বল্লাম, তোমারা আমার ছেলের মতো, তোমাদের যজমানী করবো না কে বল্লে সে কথা। তোমাদের জল চল কি অচল বুঝিনে, ভগবান যদি তোমাদের পূজো নিতে পারেন, তোমাদের সব কাজে কর্মে আমরাও পুরুতগিরি করতে পারবো।

"আমার কথা শুনে আপনার বামুন কাকা মূর্ছা যান আর কি," সাইর ঠাকুরের বৌ হেসে বল্ল, "কিন্তু মূর্ছা আমি যেতে দেবো কেন? জানেন বাবা, দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী হওয়ার সুবিধে অনেক। আপনার

বামুন কাকা কোনো আপত্তি না করে ওদের যজমানী করছে। ভটচায পাড়া অবশ্যি আমাদের সঙ্গে সব সম্পর্ক ত্যাগ করেছে, কিন্তু কিছু আসে যায় না তা'তে—। ভদ্রঘর বলতে যেখানে ওঁর দুবেলা পূজো করে আসাটা এখানো বজায় আছে সে শুধু আপনার হাসিদির বাড়ি।"

"তাই নাকি ?"

"হ্যাঁ, ওরকম মন আমি দেখিনি। ভূপতি মজুমদার যখন ওঁকে গিয়ে বল্ল যে বামুন কাকা ছোটলোকদের যজমানী করছে, ওঁকে দিয়ে আর গৃহদেবতার পূজো করানো চলছে না, হাসি দি বল্লে, ওঁর পূজোয় যদি গৃহদেবতার না চলে, তা'হলে আমি বাড়ির বিগ্রহ কর্ণফূলীর জলে ফেলে দিয়ে আসবো, তবু অন্য বামুন ডাকিযে পূজো করাতে পারবো না।"

"কিন্তু এত সব ব্যাপারের কারণটা কি ? সাইর কাকা কোনোদিন কোনো গোলমালের মধ্যে ছিলেন না—।"

সাইর ঠাকুরের বৌ বল্লে, "শঙ্খ যেদিন ধরা পড়লো, সেদিন লাতুরী এসেছিলো ওঁর কাছে। উনি ওঁকে শঙ্খ আর প্রসাদ চৌধুরীর সম্বন্ধে অনেক কথাই বলেছেন। সে কথা ওরা জানতে পেরেছে। তারপর ওসব কথা গাঁয়ে জানাজানি হয়ে গেছে। তাই ওদের ভীষণ রাগ ওঁর উপর। আর তো কোন ক্ষতি করতে পারবে না, তাই গরীব বামুনকে ভাতে মারবার চেষ্টা করলো তখন। গোপাল সেন গার্লস্ স্কুল থেকে আমার চাকরীটি গেছে, শুনেছেন ?"

ঘাড় নাড়লো শ্যামল।

"ভালোই হয়েছে," বল্ল সাইর ঠাকুরের বৌ। "ওরা পোনেরোটা টাকা দিয়ে পঁয়ত্রিশ টাকার রশিদ নিতো। লাতুরী নতুন স্কুল করেছে মেয়েদের জন্যে। এখন সেখানে সেলাই শেখাচ্ছি। এ সময়তো স্কুলেই থাকি। আজ উনি নেই বলেই বাড়ি থেকে বেরুইনি।"

একটু চুপ করে বল্লে, "অবশ্যি ওদের স্কুলে কি পাবো জানিনে, আদৌ পাবো কিনা তাও জানিনে, কিন্তু ওখানে কাজ করে বড়ো আনন্দ পাই।"

"আমাদের বাড়িও তো সাইর ঠাকুরের পূজো বন্ধ, না?" শ্যামল জিজ্ঞেস করলো।

"আপনাদের বাড়ি?"

"মানে গোপাল সেনের বাড়ি—।"

"ও হ্যাঁ। হ্যাঁ, সেখানেও বন্ধ।"

"দাদু সেটা সইলো—?"

সাইর ঠাকুরের বৌ বল্ল, "ওঁর কথা কে শোনে? শঙ্খই তো আসল কর্তা। আপনার বামুন কাকার ওবাড়ির ত্রিসীমানায় ঢোকা নিষেধ।" একটু চুপ করে থেকে তারপর হেসে ফেল্ল সাইর ঠাকুরের বৌ। "তবে বুড়ো গোপাল সেন একটি মজার কাণ্ড করেছে।"

"কি?"

"বাড়ির লক্ষ্মীনারায়ণের যুগলমূর্তি তুলে এনে দিয়ে দিয়েছে আপনার হাসি দি'কে। আপনার বামুন কাকা তো হাসি ঠাকরুণের বাড়ি যায় পূজো করতে, সেই সঙ্গে লক্ষ্মীনারায়ণের পূজোও হয়ে যায়।"

* * * * *

একটি বড়ো আটচালায় লাতুরীদের নতুন স্কুল। একদল অনাবৃত দেহ ছেলেমেয়ে সোরগোল করছিলো সেখানে। পাশের জমিটিও ভাড়া নেওয়া। কয়েকজন ঘরামী বাঁশ চাঁচছিলো সেখানে। স্কুলের জন্যে বেড়ার ঘর তুলে ফেলতে হবে শিগ্‌গিরই।

শ্যামল উঠে আসতেই দেখলো, সামনে দাদুকে ঘিরে বসেছে কয়েকটি ছেলে মেয়ে। প্রায় সবই জেলেপাড়ার। দু' একটি ওর কোলেই উঠে

বলেছে। একটি পেছন থেকে তার বিনুনী ধরে টানছে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্যে। সে নির্বিকার ভাবে অ আ ক খ পড়িয়ে চলেছে।

শ্যামলকে দেখে দাতু মুখ ঘুরিয়ে নিলো না আগের মতো। একটি স্নিগ্ধ হাসি হাসলো।

"দাতুরী কোথায় ?"

"ওই যে ওখানে—।"

দূরে এককোণে বসে দাতুরী আর গাঁয়ের ছেলে দু'চারজন কি যেন হিসেব পত্তর করছিলো।

শ্যামলকে দেখে দাতুরী একগাল হাসলো।

"আরে শ্যামলদা, তুমি এলে তা'হলে ? আমি আজ ক'দিন ধরে তোমার অপেক্ষায় বসে আছি। সব শুনেছো ?"

শ্যামল ঘাড় নাড়লো।

"তুমি কোন দলে শ্যামলদা, আমাদের না ওদের," দাতুরী জিজ্ঞেস করলো ছেলেমানুষের মতো।

শ্যামল হাসলো।

"আমাদের তো ? তা হলে ওই কোণে গিয়ে ওদের নিয়ে বসে পড়ো। ওরা তোমার কাছে ভূগোল পড়বে।"

দাতুরীরা উঠে পড়লো।

"তোমরা চল্লে কোথায় ?"

"আমাদের অনেক কাজ। কাল পল্লীমঙ্গল সমিতির বাৎসরিক অনুষ্ঠান। সব যোগাড়যন্তর করতে হবে।"

"স্কুল ফেলে চলে যাচ্ছো ?"

"তুমি তো রইলে—।"

তারপরদিন বিকেল বেলা। সূর্য্যি তখন পাটে নেমেছে।

লাতুরীদের সমিতির বাৎসরিক অনুষ্ঠানে বেশ ভিড়। লাতুরীর নিশ্বাস ফেলবার ফুরশত নেই। ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে চারদিকে।

শ্যামল চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো একপাশে।

একটি গান শেষ হোলো। হাততালি। আনমনা হয়ে গেল শ্যামল। কলেজী দিনের সোশিয়্যালগুলির কথা মনে পড়লো কি জানি কেন। মনে পড়লো কলকাতায় চেনাশোনাদের কথা। কলকাতা ছেড়ে এসেছে এইতো সেদিন। তবু যেন মনে হয় কতদিন হয়ে গেল। মনে পড়লো মায়ের কথা। অনেকদিন চিঠি লেখা হয়নি। ভাবলো আজ বাড়ি ফিরেই লিখতে বসতে হবে। ভিড় আর হৈ চৈ ভালো লাগছিলো না। পালানো যাক এখান থেকে, সে ভাবলো। আরো অনেক এলোমেলো ভাবনা ভিড় করে এলো মনের মধ্যে। তাকালো আকাশের দিকে। পশ্চিম আকাশ কমলা লেবুর রঙ ধরেছে। একটুকু হাওয়া নেই। গাছের পাতাগুলো নড়ছে না। গুমোট গরম।

সোরগোল থেমে গেল হঠাৎ।

"আকাশের লাল সূর্য দেখা দিলো
বিপ্লবের
রক্ত রাঙা পতাকার মতো—"

চমকে উঠলো শ্যামল। ফিরে তাকিয়ে দেখলো বছর এগারো বারো বয়েসের একটি মেয়ে রিনরিনে গলায় আবৃত্তি করছে।

"আমরা সৈনিক মতো
বজ্রমুঠি তুলেছি আকাশে,
নতুনের পাতা কিছু জুড়ে দিয়ে যাবো
ইতিহাসে।"

"শুনছো ?"

ফিরে দেখলো—লাতুরী। কখন পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

"মেয়েটি বেশ আবৃত্তি করে, না ?" লাতুরী জিজ্ঞেস করলো।

শ্যামল একটু হাসলো। কিছু বল্ল না।

"আমরা জেনেছি পথ
উপোষীর প্রতিরোধে, জনতার অশান্ত ভঙ্গীতে—
আমরা চিনেছি পথ
বঞ্চিতের বিদ্রোহের বিদ্যুৎবহ্নিতে।
আমরা চলেছি পথ
দুরন্ত আশায় দৃপ্ত নির্ভয় আশ্বাসে,
নতুনের পাতা কিছু জুড়ে দিয়ে যাবো
ইতিহাসে।"

"লাতুরী দি !"

শ্যামল, লাতুরী, দুজনেই ফিরে তাকালো।

একটি অচেনা ছেলে। শ্যামল তাকে আগে কোনোদিন দেখেনি। ভিন গাঁয়ের হয়তো। হাঁফাচ্ছে। অনেকটা পথ ছুটতে ছুটতে এসেছে বলে মনে হোলো।

"লাতুরী দি, একটু এদিকে আসবেন। জরুরী কথা আছে একটা।"

লাতুরী চলে গেল ওর সঙ্গে।

শ্যামল আবৃত্তি শুনতে লাগলো চুপচাপ।

"আমাদের ডাক আজ
দেহাতের ঘাসে ঘাসে
পাঠিয়ে দিলাম,
আমাদের আহ্বান

শহরতলির ঝোড়ো বসন্ত বাতাসে
পাঠিয়ে দিলাম—"

শ্যামল আবার ফিরে তাকালো। ছেলেটি খুব উত্তেজিত হয়ে লাতুরীকে কি যেন বলছে। লাতুরী শুনছে মন দিয়ে। চোখে মুখে উৎকণ্ঠা। শ্যামল ভাবলো, কি হোলো আবার।

এসব কিছু আর কারো চোখে পড়লো না। সবাই তখন মন দিয়ে আবৃত্তি শুনছে।

"কে তুমি দরদী বঁধু
সাড়া দাও নিরন্নের হেঁশেলের আধো অন্ধকারে,
কে তুমি দুঃখের সাথী
সাড়া দাও কারখানা ক্ষেতে ও খামারে,
কে অভিযাত্রী তুমি
সাড়া দাও যুগান্তের নবারুণ আসন্ন আভাসে
—নতুনের পাতা কিছু জুড়ে দিয়ে যাবো
ইতিহাসে।"

"শ্যামলদা!"

শ্যামল ফিরে তাকালো।

"চলো, একটু বেরুতে হবে।"

"কেন?"

"এসো, বলছি।"

শ্যামল বেরিয়ে এলো লাতুরীর সঙ্গে। বাইরে আরো চার পাঁচজন জড়ো হয়ে অপেক্ষা করছিলো। সবাই হাঁটতে সুরু করলো।

"কোথায় যাচ্ছি আমরা," শ্যামল জিজ্ঞেস করলো।

"প্রসাদ চৌধুরীর বাড়ি।"

ভটচায পাড়ার পেছন দিয়ে ঘুরে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের বড়ো রাস্তার উপর উঠে এলো ওরা। সে পথ শ্রীপুর থেকে কানুনগোপাড়া সারোয়াতলি খলঘাট হয়ে সোজা দোহাজারি চলে গেছে। ট্রাক, মোটরগাড়িও যেতে পারে সে পথ দিয়ে, দেখাও যায় কালে ভদ্রে দু'একখানি।

"প্রসাদ চৌধুরী সম্প্রতি নানারকম গোলমালে জড়িয়ে পড়েছে," লাতুরী বল্ল শ্যামলকে, "আয়করের ঝঞ্ঝাট, তার ব্যাঙ্কের ব্যাপারে গোলমাল, আরো কি সব যেন। একটু চুপ মেরে ছিলো কিছুদিন। আজ হঠাৎ এরকম করে বসলো কেন বুঝতে পারছি না।"

"কি করেছে সে," শ্যামল জিজ্ঞেস করলো।

লাতুরীর মুখে ব্যাপারটা শুনলো শ্যামল।

চরন্দীপে প্রসাদ চৌধুরীর যে সব প্রজা আছে তাদের অনেকের কাছে তার পাওনা পড়ে ছিলো। আজ দুপুরে কথা নেই বার্তা নেই লোকজন নিয়ে তাদের উপর চড়াও হয়ে তাদের কাছে মজুত ধান চাল যা পেয়েছে জোর করে তুলে নিয়ে এসেছে। পুরুষেরা অনেকেই বাড়ি ছিলো না তখন। কেউ বাধা দিতে পারেনি। খবর পেয়ে যখন সবাই এসে পড়লো ততক্ষণে এরা চলে গেছে। সবাই স্থির করলো যে আমাদের কাছে এসে আমাদর সঙ্গে সলাপরামর্শ করে কাল সকালে যা হোক একটা কিছু করবে। বিকেলে লক্ষ্মী বাড়ি ফেরার পথে হঠাৎ দেখলো একটি বড়ো ট্রাক এসে দাঁড়িয়েছে বড়ো রাস্তার উপর, যেখান থেকে একটি সরু রাস্তা চলে গেছে প্রসাদ চৌধুরীর বাড়ির দিকে, ঠিক সেখানটায়। সে প্রসাদ চৌধুরীর বাড়ির দিকে এগিয়ে গিয়ে দেখলো সেখানে একটি জীপও দাঁড়িয়ে আছে। লুকিয়ে বাড়ির ভিতর ঢুকে পড়ে আমবাগানে গা ঢাকা দিয়ে দেখলো।

তারপর তাড়াতাড়ি ছুটে এলো চরন্দীপে। সবাইকে বল্ল, তোমরা

করছো কি? চুপ করে বসে আছো এখনো। চৌধুরী যে ধান চাল সব পাচার করে দিচ্ছে। তোমাদের কাছ থেকে যা কেড়ে নিয়েছে তা'তো পাচার করছেই, তার নিজের কাছে মজুত যা ছিলো, তাও সব সরিয়ে দিচ্ছে। বর্ষা এসে পড়বে শিগ্‌গিরই। ধান চালের দাম তো তখন আকাশে উঠবে। খাবে কি?

ওরা বল্ল, আমরা কি করতে পারি। চলো যাই, সাঁতুরী মজুমদার, শ্যাম দস্তিদার এদের বলে দেখি।

লক্ষ্মী ক্ষেপে গেল। বল্ল, "ওরা কি করবে? যা করবার তোমাদেরই করতে হবে। ওদের জন্যে বসে থাকলে চলবে না। ওরা সব এখন নাচ গান থিয়েটারে ব্যস্ত। ওসব ছেড়ে ওরা আসবে? চলো, আমরাই যাই প্রসাদ চেধুরীর বাড়ি। কেউ যেতে না চাও তো আমি একা যাচ্ছি। গাঁয়ের ধান চাল গাঁয়ের বাইরে নেয়া চলবে না। কে যাবে আমার সঙ্গে?"

লক্ষ্মীর বর ধনা তার লাঠিটা তুলে নিলো। বল্ল, "আমি যাবো।"

আমিও যাবো, বল্ল আরেকজন।

আমিও—, শোনা গেল আরেকজনের মুখে।

আর কে যাবে, লক্ষ্মী জিজ্ঞেস করলো এক একজন করে। দেখা গেল জোয়ান মরদ যতোজন আছে সবাই এসে দাঁড়ালো লক্ষ্মীর পাশে।

একজন বুড়ো জিজ্ঞেস করলো, "যাবে তো বুঝলাম। কিন্তু গিয়ে করবে কি?"

"আমাদের ধান চাল যা সব কেড়ে নিয়ে গেছে সব উল্টে কেড়ে নিয়ে ফিরে আসবো," লক্ষ্মী বল্ল। "আর ট্রাক নিয়ে যারা এসেছে তাদের ঠেঙিয়ে তাড়াবো। তারপর যা হয় দেখা যাবে।"

"ওদের লোকজন আছে, বন্দুক আছে," বল্লে একজন বুড়ো।

"ওদের বন্দুক আছে বলে তোমার বৌ ছেলেকে উপোষ করতে হবে নাকি," বল্ল লক্ষী।

• • • • •

লক্ষীর সঙ্গে জন পঞ্চাশেক লোক যখন লাঠিসোটা নিয়ে চড়াও হোলো প্রসাদ চৌধুরীর বাড়ি, তখন লাতুরীদের সমিতির বাৎসরিক অনুষ্ঠানের প্রোগ্রাম পুরোদমে চলছে।

লাতুরীর কাছে খবর গেল সঙ্গে সঙ্গেই। খবর আনলো ভিন গাঁয়ের সেই ছেলেটি যে লাতুরীকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলো শ্যামলের কাছ থেকে।

"কিছু করবার আগে আগে আপনার কাছে এসে আপনার পরামর্শ নেওয়া উচিত ছিলো লাতুরীদি," বল্ল দলের একটি ছেলে।

লাতুরী মাথা নাড়লো বল্ল, "না। কোনো প্রয়োজন ছিলো না আমার পরামর্শের। আগামী দিনের ইতিহাস এর থেকে বুঝে নিতে চেষ্টা করো বিজয়। কাজের সময় দলকে যে চালিয়ে নেবে সে বেরিয়ে আসবে ওদের মধ্যে থেকেই। আমাদের তখন আর দশজনের মতো ওদেরই একজন হয়ে ওদের মধ্যে ভিড়ে যেতে হবে।"

তাড়াতাড়ি পা' চালিয়ে ওরা চলে এলো প্রসাদ চৌধুরীর বাড়ির কাছে। দেখে বড়ো রাস্তার উপর ট্রাক নেই। আছে শুধু লাল ধুলোর উপর টায়ারের দাগ।

বহু লোকের সোরগোল কানে এলো।

এরা গিয়ে ঢুকলো প্রসাদ চৌধুরীর বাড়ির ভিতর।

উঠোনে অনেক লোকের ভিড়। বেশীর ভাগই চরন্দীপের কিষাণ আর ছেলেরা। এদিক ওদিক থেকে জনকয়েক ভদ্রলোকও এসে জুটেছে। ভিড়ের সামনে লক্ষী। সবার মুখ বিষণ্ণ।

কি ব্যাপার ? না, এরা আসতে আসতে ওরা যা কিছু নেওয়ার নিয়ে পালিয়েছে। কি করে যেন খবর পেয়ে গিয়েছিলো।

প্রসাদ চৌধুরী কোথায় !

সে ওদের সঙ্গে ওদের জীপে চেপে চলে গেছে।

বাড়িতে চাকর সরকার গোমস্তা যে দু'চারজন ছিলো ওরা বল্লে যে প্রসাদ চৌধুরী আর এ গাঁয়ে ফিরবে না। সে কলকাতায় গিয়ে ব্যবসা করবে, সেখানে অফিস নিয়েছে। এখানে আর পোষাচ্ছে না, জড়িয়ে গেছে নানারকম গোলমালে। প্রসাদ চৌধুরীর বৌ দিন কয়েক আগে বাপের বাড়ি গিয়েছিলো ছেলেটিকে নিয়ে, সেখান থেকে সোজা কলকাতায় চলে গেছে। তাকে এদিকে ফিরতে দেয় নি প্রসাদ চৌধুরী, কারণ সে চায়নি এদিকের কেউ তার কলকাতা চলে যাওয়ার খবরটি জানুক।

তাই সে যাওয়ার আগে কিছু টাকা আয় করবার ব্যবস্থা করলো এভাবে। পাওনা যা ছিলো এভাবে তুলে নিলো, আর নিজের মজুত করা যা ছিলো তাও বেচে কিছু নগদ টাকা জোগাড় করে নিলো।

"যাক, প্রসাদ চৌধুরী যা নিলো শেষবারের মতোই নিলো," লক্ষ্মী বল্ল, "এবার চাষের সময়টা খুব কষ্টেই কাটবে দেখছি। আচ্ছা, আগামী ফসলটা খেটে খুটে ঘরে তুলি। তারপর দেখা যাবে কোন প্রসাদ চৌধুরী আমাদের ধান কেড়ে নেয়। চলো বাড়ি ফিরি এবার।"

তখন সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। সূর্যের শেষ রশ্মিটুকু মিলিয়ে গেল আঁধার-সবুজ গাছপালার ওপারে।

একজন বল্লে, "দেখছো, আকাশের ওধারে মেঘ করছে।"

শ্যামল তাকিয়ে দেখলো। ঈশান কোণে একটুখানি মেঘ করেছে। একটি ফ্যাকাশে বিজলী চমকে গেল সেখানে।

"রাত্তিরে ঝড় উঠবে," একজন বল্ল।

লোকজন সবাই প্রসাদ চৌধুরীর উঠোন থেকে বেরিয়ে এসে বাড়ির পথ ধরলো!

শ্যামল আর লাতুরী এলো সবার পেছনে।

"এখানে এত কাণ্ড হয়ে গেল," শ্যামল বল্ল, "আর ওখানে বোধ হয় অনুষ্ঠানের প্রোগ্রাম গান, আবৃত্তি পুরোদমে চলছে।"

লাতুরী হাসলো। বল্ল, "আক্ষেপ করছো কেন শ্যামল দা, ওসবেরও প্রয়োজন আছে।"

"প্রসাদ চৌধুরী শঙ্খকেও সঙ্গে করে কলকাতায় নিয়ে গেলে পারতো," শ্যামল বল্ল।

লাতুরী দাঁড়িয়ে পড়লো হঠাৎ। বল্ল, "তাইতো!"

"কি হোলো?"

"আমায় ঠিক সময়মতো মনে করিয়ে দিয়েছো তুমি। আমার খেয়ালই ছিলো না," বল্ল লাতুরী।

শ্যামল বুঝতে পারলো না লাতুরী কি বলছে। লাতুরী তার কোনো প্রশ্নের উত্তর দিলো না। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তাটি ছেড়ে শ্যামলকে নিয়ে আরেকটি আঁকাবাঁকা জঙলা পথ ধরলো। কিছুক্ষণ পথ চলবার পর দেখলো সেন পাড়ার কাছে এসে পড়েছে।

"দাদুর ওখানে যাচ্ছো?" শ্যামল জিজ্ঞেস করলো।

ঘাড় নাড়লো লাতুরী।

উঠোন পেরিয়ে বাড়ির ভিতর ঢুকে লাতুরী সোজা দু'তলায় উঠে এলো। শ্যামল এলো পেছন পেছন। লাতুরী সোজা ঢুকলো গিয়ে একটি ঘরের ভিতর।

সেটি শঙ্খের ঘর।

শঙ্খ তখন একটি বড়ো সুটকেসের ডালা তুলে ভিতরটা পর্যবেক্ষণ করছিলো। লাতুরীকে দেখে চটকরে সুটকেসটি বন্ধ করে তালা এঁটে দিলো।

তারপর বল্ল, "তুমি আবার কি মনে করে?"

শ্যামলকেও চোখে পড়লো, বল্ল, "ও, ছোটোকর্তাও এসেছেন। বেশ, বেশ। কিন্তু বড্ড অসময়ে এলে ভায়া। ঠিক মতো অভ্যর্থনা করতে পারছিনা। বড্ড ব্যস্ত। এত ব্যস্ত যে তোমাদের বসতেও বলবো না এখন। বরং এক কাজ করো। কাল সকালে এখানে এসে আমার সঙ্গে চা খেয়ো তোমরা দুজনে, কেমন?"

ঘাড় নাড়লো লাতুরী। আস্তে আস্তে বল্ল, "কাল তো তোমায় আর পাবো না—।"

একটু ফ্যাকাশে হয়ে গেল শঙ্খ। বল্ল, "পাবেনা মানে? আমি কি উবে যাবো না কি?"

"এক রকম তাই। তুমি সরে পড়ছো এখান থেকে। কলকাতা যাচ্ছো। আজকে তো বটেই। সম্ভবত এক্ষুনি," লাতুরী বল্ল।

চটকরে কোনো উত্তর এলো না শঙ্খের মুখে।

"প্রসাদ চৌধুরী সরে পড়েছে," লাতুরী বলে চল্ল, "এইমাত্র জানলাম সেকথা। মনে হোলো যেন প্রসাদ চৌধুরী এখানে না থাকলে তুমিও থাকবে না, থাকা নিরাপদ মনে করবে না। তাই দেখতে এলাম আমার অনুমান সত্যি কিনা। এসে বুদ্ধিমানের কাজ করেছি, কি বলো? নইলে দেখা হোতো না।"

শঙ্খ একটি রুক্ষ হাসি হাসলো। বল্ল, "তুমি কি আমায় আটকে রাখতে এসেছো লাতুরী?"

"না," লাতুরী বল্ল, "তোমার যেখানে ইচ্ছে যেতে পারো। আমি

এখন আর তোমায় আটকানোর কেউ নই। তবে," লাতুরী থামলো একটু, আরত চোখ রাখলো শ্যামলের ক্রুর হয়ে ওঠা সঙ্কুচিত চোখের উপর, তারপর বল্ল, "ওই সুটকেসটি আমায় দাও।"

শঙ্খ কোনো কথা বল্ল না। তাকিয়ে রইলো। কি যেন ভাবছে সে।

"ওই সুটকেসের ভিতরে যা আছে ওসব তোমার নয় শঙ্খদা। ওসব ডিসপেনসারির। তোমার তো কোনো অধিকার নেই ওসব নেওয়ার। ওসব তোমায় রেখে যেতে হবে।"

শঙ্খ উত্তর দিলো না। গায়ে একটি কোট চাপিয়ে নিলো।

শঙ্খের মা এসে ঢুকলো সে ঘরে। শ্যামল আর লাতুরীকে দেখে বিস্মিত হলো প্রথমটা। তারপর খুব গম্ভীর হয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিলো। একি আবার আপদ এসে জুটলো, ভাবলো মনে মনে। এদের জন্যেই তো তাঁর আদুরে ছেলেটির এত বেইজ্জতি। তাঁর ভাবনাগুলো তাঁর মুখের আয়নায় স্বচ্ছ প্রতিবিম্ব হয়ে ফুটে উঠলো।

"ভালো আছেন, জ্যাঠাইমা," শ্যামল জিজ্ঞেস করলো।

শঙ্খের মা কোনো উত্তর দিলো না।

লাতুরীর সঙ্গে কোনো লৌকিকতার বালাই ছিলো না। লাতুরীও তাকালো না শঙ্খের মায়ের দিকে, শঙ্খের মাও তাকালো না।

"জোয়ারের সময় তো হয়ে এসেছে। তুই বেরুবি না," জিজ্ঞেস করলো শঙ্খের মা।

"এবার বেরুবো।"

"কাল বিকেলেই ফিরবি তো?"

"কাল বিকেলে না হলেও পরশু সকালে তো বটেই," শঙ্খ উত্তর দিলো।

লাতুরী আর শ্যামলকে ভ্রূক্ষেপও করলো না শঙ্খ। সুটকেস আর নিজের ডাক্তারী ব্যাগটি তুলে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে চল্ল।

বুড়ো গোপাল সেন নীচে বসে মহাভারত পড়ছিলেন। সিঁড়ি দিয়ে একটি প্রোসেশান নামতে দেখে অবাক হয়ে তাকালেন। শঙ্খ, লাতুরী, শ্যামল।

"যাচ্ছিস কোথায়," তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

"শহরে," শঙ্খ উত্তর দিলো।

আর কিছু জিজ্ঞেস করবার আগেই মিছিল তাঁকে পেরিয়ে, উঠোন পেরিয়ে বেরিয়ে গেল।

"শঙ্খদা, তোমায় তো ওটি সুদ্ধ নিয়ে গাঁ ছেড়ে যেতে দেবো না।"

কোনো উত্তর নেই শঙ্খের মুখে। নদীর দিকে হনহনিয়ে চলেছে তো চলেইছে।

"জানো, লোকজন ডেকে ওটা কেড়ে নিতে পারি?"

"পারো তো কেড়ে নাও।"

দেউড়ি থেকে চারজন চোয়াড়ে চেহারার লোক সঙ্গ নিয়েছিলো, সেটা লক্ষ্য করছিলো লাতুরী। ওরা আসছিলো খানিকটা তফাতে।

"একেবারে বডি গার্ড নিয়ে চলেছো দেখছি।" লাতুরী বল্ল, "আমি দরকার মনে করলে আমাদের ছেলেদের দিয়ে ওদের পিষে ফেলতে পারি জানো? কিন্তু তোমার কাছ থেকে আমি কোনোদিন কিছু কেড়ে নিইনি, যা কিছু নেওয়ার চেয়েই নিয়েছি শঙ্খদা—।"

সন্ধ্যার অন্ধকার আরো ঘনিয়ে এলো।

পকেট থেকে একটি ছোটো টর্চ বার করলো শ্যামল। তারপর হাঁটতে লাগলো আট দশ পা' তফাতে।

ডিসপেনসারি থেকে সামান্য কিছু ওষুধ খোয়া গেলে আমাদের যে এমন

কিছু অপূরণীয় ক্ষতি হবে তা নয় শঙ্খদা, একটু অসুবিধে হলেও আবার জোগাড় করে নেওয়া যাবে। কিন্তু তোমায় যে আমরা হারালাম সেটা মস্তো বড়ো ক্ষতি। তোমার কাছ থেকে গাঁয়ের সবাই যে অনেক কিছু আশা করেছিলো, আর, আর আশা করেছিলাম আমি নিজে," ভিজে ভিজে হয়ে এলো লাতুরীর গলার মৃদু স্বর।

শঙ্খ কিছু বল্ল না। পথ চল্ল চুপচাপ। হাওয়ায় ঝির ঝির করে উঠলো পথের পাশে ভূতের মতো ঝাউ গাছটি।

"তোমার কাছে এগুলো আজ এভাবে চাইছি, শুধু এগুলোর জন্যে নয়, শঙ্খদা। শুধু এগুলোর জন্যে হলে কেড়ে নিতাম। চাইছি শুধু তোমার জন্যে। তোমায় আমি ছেড়ে দিতে পারি না শঙ্খ দা। ওগুলো আমায় দিয়ে দেওয়ার মন যদি তোমার হয়, তাহলে তোমার গাঁ ছেড়ে চলে যাওয়ার মনও হবে না। শহরে গেলেও ফিরে আসতে হবে তোমায়।"

গাছপালার ওপারে আকাশের কোণে একটি বিদ্যুৎ চমকে গেল।

"তুমি আগে না করেছো, করেছো। সে সব আমরা কেউ মনে রাখবো না যদি তুমি ওসব পুষিয়ে দাও। তুমি এ গাঁয়ের ছেলে, গাঁয়ের লোকের কাজে লাগলে না, শুধু ক্ষতি করে গেলে সবার, সে আমি কি করে সইবো।"

নদীর স্রোতের কলতান ভেসে এলো আবছায়া অন্ধকারে। ওরা নদীর পাড়ে করকরি তলায় এসে পড়লো। নদীর বুকে দু একটি নৌকো ভেসে যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে শুধু নৌকোর আলো। আকাশে চাঁদ নেই, তারা নেই,—।

"জামাল মিঞা!!!" ডাক দিলো শঙ্খ।

অন্ধকার থেকে সাড়া পাওয়া গেল।

"এই যে বেজো কর্তা!"

"নৌকো কোথায়?"

"ওইতো, আপনার ডাইনে। কিন্তু—।"

"শঙ্খ দা!"

"নৌকোর মুখটা এদিকে ঘুরিয়ে দাও। ওদিকে বড্ড কাদা—।"

"শঙ্খ দা, মনে পড়ে অনেক দিন আগে একদিন ওখানে পাড়ের উপর বসে আমায় বলেছিলে—।"

"ওসব কথা এখন আর বলে লাভ নেই লাতুরী। যা বলছো আমার এক কান দিয়ে ঢুকে আরেক কান দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে," এতক্ষণ পর শঙ্খ প্রথম বল্ল লাতুরীকে।

"তা হলে তুমি যাবেই," একটু দৃঢ় হোলো লাতুরীর গলা।

"তা'তো যাবোই।"

"আমায় সুটকেসটি দিয়ে যাবেনা," কঠিনতর হোলো লাতুরী গলা।

শ্যামল ওদের কাছে এগিয়ে এলো। ভাবলো এবার লাতুরীর হয়তো প্রয়োজন হবে তাকে।

"ছেলেমানুষি কোরো না লাতুরী," শঙ্খ বল্ল।

"কিন্তু আমি তো তোমায় ওটি নিয়ে যেতে দেবো না," ঝড়ের আগের মতো থম থমে মনে হোলো লাতুরী গলার স্বর।

কেউ কিছু বলবার আগেই জলেই বুকে দাঁড়ের আওয়াজ এলো। একটি সাম্পান এসে ঘাটে ভিড়লো। শ্যামল টর্চ ফেল্ল সাম্পানের উপর।

আবুল মাঝি বল্ল, "কে, দাদাবাবু?"

সাম্পান থেকে একটি লোক লাফ দিয়ে পাড়ে উঠলো। শঙ্খকে এসে ব্যাকুল ভাবে বল্ল, "ডাক্তার দা, আপনার কাছেই যাচ্ছিলাম, আপনাকে আমার সঙ্গে এক্ষুনি যেতে হচ্ছে—।"

"কে তুমি ?"

"আমি কোয়েপাড়ার নিবারণ দে।"

"কিন্তু আমিতো এখন—।'

"ডাক্তার দা, আমার বড়ো বিপদ, স্ত্রীর ছেলে হবে আজ রাত্তিরেই। কিন্তু ওর অবস্থা বড্ড খারাপ। দাই বল্লে, সে সামলাতে পারবে না। আপনাকে দরকার।"

"তোমাদের গাঁয়ের শীতল ডাক্তার কোথায় ?"

"সে শহরে গেছে। পরশুর আগে ফিরবে না।"

"এক কাজ করো। ডিসপেনসারির নতুন ডাক্তার এসেছে। তাকে ডেকে নিয়ে যাও—।"

"আবার এতোটা পথ যেতে হবে, তাছাড়া ও একেবারে নতুন। এটা শক্ত কেস, আপনি এভাবে আমায় বিপদে ফেলবেন না ডাক্তার দা। বৌয়ের এই প্রথম ছেলে হচ্ছে—।"

শঙ্খ এক মুহূর্ত নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

তারপর বল্ল, "আচ্ছা, চলো।" স্যুটকেসটা আস্তে আস্তে তুলে দিলো লাতুরীর হাতে। "খুশি হলে তো ?"

"আবুল চাচা," লাতুরী খুব নরম গলায় বল্ল, "তোমায় এই অন্ধকারে আর খেয়াপার করতে হবে না। তুমি স্যুটকেসটি নিয়ে হাসি বৌদিকে দিয়ে এসো। আমরা জামালের নৌকোয় যাচ্ছি—।"

"আমরা মানে—?" শঙ্খ জিজ্ঞেস করলো।

"আমিও যাচ্ছি তোমার সঙ্গে। তোমায় একটু সাহায্য তো করতে পারবো।"

"—কিন্তু আকাশে কি রকম মেঘ করেছে দেখেছেন," জামাল মাঝি বল্ল, "আমি নৌকো নিয়ে নদী পেরুতে ভরসা পাচ্ছি না।"

"ঠিক আছে, তোমায় যেতে হবে না," আবুল মাঝি বল্ল, "আমিই নিয়ে যাচ্ছি এঁদের।"

"তাহলে জামাল মাঝি, তুমিই স্যুটকেসটি পৌঁছে দিয়ে এসো হাসি বৌদির কাছে। শ্যামল দা, বৌদিকে বোলো—।"

"আমিও তোমার সঙ্গে যাচ্ছি লাতুরী," শ্যামল বল্ল, "আমি একা বাড়ি ফিরবো না।"

লাতুরী একটুখানি তাকিয়ে রইলো শ্যামলের দিকে। তারপর বল্ল, "আচ্ছা, চলো।"

সবাই উঠে পড়লো আবুল মাঝির সাম্পানে।

স্যুটকেস নিয়ে জামাল মাঝি চলে গেল।

"ওসব ওর হাতে ছেড়ে দিলে," শ্যামল জিজ্ঞেস করলো লাতুরীকে।

লাতুরী বল্ল, "এদের বিশ্বাস করা যায়। জন্মে অবধি এদের দেখে আসছি। এরা কি রকম সরল আর বিশ্বাসী তুমি ধারণা করতে পারবে না।"

আবুল মাঝির সাম্পান ছেড়ে দিলো। কোয়েপাড়া গ্রামটি কর্ণফুলীর ওপারে। খেলার-ঘাটে নেমে একটু খানি হেঁটে যেতে হবে।

শ্যামল আকাশের দিকে তাকালো। কেউ খেয়াল করেনি আকাশ কখন মেঘে মেঘে ছেয়ে গেছে। ঘন ঘন বিজলী চমকাচ্ছে চারদিকে। বিপুল স্তব্ধতা নেমেছে এপার ওপারের অন্ধকারে।

"খেলার ঘাটে পৌঁছুতে কতক্ষণ লাগবে আবুল মাঝি," শ্যামল জিজ্ঞেস করলো।

"বেশীক্ষণ লাগবে না। ঝড় উঠবার আগেই পৌঁছে দেবো।"

একটি তীব্র বিদ্যুৎ আকাশের একোণ থেকে ওকোণ চিরে নদীর বুক ঝলসে দিলো। তারই এক নিমেষের আলোয় শ্যামল দেখলো লাতুরী শঙ্খের একটি হাত টেনে নিয়েছে নিজের হাতের মধ্যে।

শ্যামলের পাশে বসেছিলো নিবারণ দে। বিপুল উৎকণ্ঠা নিয়ে সে বল্ল, "একটু তাড়াতাড়ি হাত চালাও মাঝি— ।"

এদিকে ভ্রূক্ষেপে নেই লাতুরীর। খুব আস্তে আস্তে বলছিলো শঙ্খকে, "কোয়েপাড়া থেকে আমরা আবার সোজা শ্রীপুরেই ফিরবো, কেমন ? বাড়ি গিয়ে কাজ নেই, নিশ্চয়ই অনেক রাত হবে। আমাদের ওখানেই খেয়ে নেবে। শ্যামলের ঘরে থাকতে দেবো তোমায়। কোন অসুবিধে:হবে না।"

"আকাশের যা' অবস্থা দেখছি, ফিরতে পারবো তো ? রাতটা কোয়ে-পাড়ায় কাটাতে না হয়," শঙ্খ বল্ল।

"ও, কিছু নয়," লাতুরী বল্ল, "ঘণ্টা খানেক ঝড় বৃষ্টি হয়ে থেমে যাবে। আমরা ঠিক ফিরে আসতে পারবো।"

শঙ্খ আর কিছু বল্ল না। শ্যামল মুখ ফিরিয়ে রইল অন্যদিকে। তার মনেও ঝড় আসছে তখন।

লাতুরী বলে চল্ল, "তুমি যা যা সব নিয়েছো ডিসপেনসারি থেকে, তুমি আর আমি মিলে একটু একটু করে সে সব ফিরিয়ে দেবো, কেমন ? তারপর আবার আগের মতন........"

লাতুরীর কথা শেষ হোলো না। হঠাৎ দমকা ঝড় এলো পশ্চিম থেকে, নদীর এপার ওপারের গাছপালার উন্মত্ত আলোড়নের সাড়া ঝড়ের সোঁ সোঁ শব্দে আর নদীর উত্তাল ঢেউয়ের উন্মাদ গর্জনে মিশে গিয়ে বিভ্রান্ত করে তুল্লো রাতের অন্ধকারকে। গর্জে উঠলো আকাশের মেঘ, নিষ্ঠুর উল্লাসে ফুলে ফুলে উঠলো অথৈ-জল কর্ণফুলী। আকাশটা দুলতে লাগলো ডাইনে থেকে বাঁয়ে, সামনে থেকে পেছনে। তারপর হঠাৎ পাক খেয়ে আকাশটি চলে গেল পায়ের নীচে, নদীটা উঠে গেল উপর দিকে, আর বিক্ষুব্ধ ঢেউগুলো শ্যামলকে টেনে নিলো তাদের অন্ধকার শীতলতায়।

"শঙ্খ দা।" ভেসে এলো যেন বহুদূর থেকে।

"এইতো,...আমি ধরে আছি তোমায়,...ভেসে থাকতে চেষ্টা করো একটুখানি......"

"শঙ্খ দা,......"

হুড়মুড়িয়ে বাজ পড়লো বহুদূরের একটি তালগাছে।

নিকষ কালো অন্ধকারে ডুবে গেল শ্যামলের সমস্ত অনুভূতি।

(আট)

অস্ফুট পাখীর ডাক, বহু দূর থেকে। ক্রমশ স্পষ্ট, আরো স্পষ্ট হয়ে এলো।

ধীরে ধীরে চোখ মেলে শ্যামল তাকালো। সামনে খোলা জানালা। নীল আকাশের বুকে কয়েকটি মেঘের টুকরো, রোদ্দুরের রঙে রঙিয়ে দেওয়া। এক ঝাঁক বক উড়ে গেল বহুদূর ওপারে। তাদের পাখার ঝাপটায় রোদ্দুরে শিহরণ জাগলো।

"দুধটা এবার খাইয়ে দাও।"

শ্যামল এদিকে ফিরে তাকালো। বিছানার পাশে ষ্টেথো হাতে দাঁড়িয়ে ডিসপেনসারির নতুন ডাক্তার নির্মল সেনগুপ্ত।

ওপাশে দাদু খাটের বাজু ধরে দাঁড়িয়ে।

দাদু দুধ নিয়ে এলো।

দমকা কাশি এলো শ্যামলের বুক ঠেলে।

"বেশী নড়াচড়া করবেন না," বল্ল নির্মল ডাক্তার, "সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিন কিছুদিন।" দাদুকে বল্ল, "আমি গিয়ে ওষুধটা পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

নির্মল ডাক্তার চলে গেল। শ্যামল একটা কথা জিজ্ঞেস করবার জন্যে মুখ খুললো।

"কোনো কথা নয়," দাদু বল্ল, "দুধটা খেয়ে ফেলুন তো লক্ষী ছেলের মতো।" তারপর বল্ল, "এ দু'দিন যা দুর্ভাবনা গেছে আমাদের। দু'দিন এক রাত বেহুঁশ, আর শুধু কাশছেন তো কাশছেনই।"

বল্ল খুব আস্তে আস্তে, মৃদু গলায়। শ্যামল ভালো করে তাকালো। দেখলো, বড় বিষণ্ণ তার মুখ। সারা বাড়ি নিঝুম, নিস্তব্ধ। বাইরের সবুজ গাছে গাছে রোদ্দুর ছড়ানো। নানা জাতের পাখীর মুখর কলরব।

"লাতুরী কোথায়," শ্যামল আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলো।

কোনো উত্তর পেলো না। দেখলো দাতুর চোখ দুটো জলে টলটল করছে।

দাতু বল্ল, "দাঁড়ান, হাসি বৌদিকে খবর দিই। আপনার খোঁজ করে গেছে একটু আগেও।"

দাতু বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

বাইরের সবুজ গাছে গাছে রোদ্দুর ছড়ানো। নানা জাতের অসংখ্য পাখীর মুখর কলরব। সারা বাড়ি, নিঝুম, নিস্তব্ধ।

• • • • • •

শ্যামল নিউমোনিয়ায় ভুগলো বেশ কয়েকটা দিন। তারপর আস্তে আস্তে সেরে উঠলো নির্মল ডাক্তারের চিকিৎসায় আর দাতুর অক্লান্ত সেবা শুশ্রূষায়।

একটু সেরে উঠতে দাতুর কাছে শুনলো কি করে তাকে বাঁচিয়েছে আবুল মাঝি। সে জলে পড়তেই আবুল মাঝি তাকে ধরে ফেলে ছিলো। তার সাম্পানে উল্টে গিয়েছিলো খেলার ঘাটের খুব কাছা-কাছি এসে। তাইতেই ঘণ্টা খানেক ঢেউয়ের সঙ্গে যুঝে শ্যামলকে সে পাড়ে এনে তুলতে পেরেছিলো। নিবারণ দে'ও প্রাণ বাঁচাতে পেরেছিলো কোনো রকমে।

ফিরে আসেনি শুধু লাতুরী আর শঙ্খকুমার। দু'দিন খোঁজা-খুঁজি করেও তাদের কোনো সন্ধান পাওয়া যায় নি।

শ্যামলের অসুখে তাকে দেখতে এসেছিলো গাঁয়ের সবাই। বুড়ো গোপাল সেন তার খবর নিতে আসতো রোজ দু'বেলা।

আসে নি শুধু শঙ্খকুমারের মা।

দাতুরীর শোকে প্রথমটা খুব মুষড়ে পড়েছিলো হাসি দি। তারপর সামলে নিলো আস্তে আস্তে। দৈনন্দিন জীবনযাত্রার প্রবাহ ছোটখাটো সুখ দুঃখের জোয়ার ভাটায় আবার ফিরে পেলো তার আগের গতি, স্মরণের একূল ওকূল ছাপিয়ে বয়ে চল্ল কর্ণফুলীর মতো।

শ্যামল সেরে উঠতে হাসি দি হাওলার কালচাঁদ ঠাকুরের বাড়িতে আর খলঘাটের বুড়োকালীবাড়িতে পূজো দিয়ে এলো সাইর ঠাকুর তার বৌ মাধু আর কুন্তলার সঙ্গে।

• • • •

সেবার বর্ষা নামলো খুব তাড়াতাড়ি। জ্যৈষ্ঠের মাঝামাঝি।

একদিন মেঘমেদুর বিকেল বেলা বাইরে থেকে ফিরে দুতলার বারান্দায় ইজিচেয়ার পেতে শ্যামল বসে রইলো চুপচাপ।

দাতু এলো চা নিয়ে। বল্ল, "কি অত ভাবছেন শ্যামল দা ?"

"এবার তো চলে যাওয়ার সময় হোলো," শ্যামল বল্ল, "মা লিখেছেন কলকাতায় ফিরে যেতে। এদিকের কিছু কাজ বাকি আছে এখনো। ভাবছি শহরে মেশোমশায়ের ওখানে গিয়ে থাকবো কিছুদিন। কাজগুলো সেরে তারপর চলে যাবো।"

দাতু চুপ করে রইলো একটুখানি। তারপর বল্ল, "কি কাজ ?"

"সামান্য কিছু বৈষয়িক কাজ," শ্যামল উত্তর দিলো। দাতু আস্তে আস্তে মাটিতে বসে পড়লো ইজিচেয়ারের পাশে। বল্ল, "যাওয়ার অতো তাড়া কিসের। আরো কিছুদিন থাকুন না।"

শ্যামল একটু ম্লান হেসে মাথা নাড়লো। বল্ল, "অনেক দিন

কাটিয়েছি, আর নয়। যেতে যখন হবেই, আর মায়া বাড়িয়ে কি হবে।”

দাতু একটি দীর্ঘনিশ্বাস চেপে গেল।

“তোমাদের এখানে কাটানো এ ক'টা দিন কোনোদিনই ভুলতে পারবো না,” শ্যামল বলে চল্ল, “তোমাদের কাছে আদর যত্ন ভালোবাসা যা' পেয়েছি, সে আর কোথাও পাইনি, তোমায় অনেক কষ্ট দিলাম দাতু, আমার অসুখের সময় তোমার বড্ড খাটুনি গেছে।”

দাতু চুপচাপ পায়ের নখ খুঁটতে লাগলো।

“তুমি এবার কি করবে দাতু,” শ্যামল জিজ্ঞেস করলো।

“আমি?” ম্লান হাসি হাসলো দাতু, বল্ল, “আমি আর কি করবো। লাতুরীদির স্কুলটি তো বন্ধ করে দেওয়া যাবে না। আপাতত সেটি আমাকেই চালাতে হবে। তারপর,—তারপর একদিন বিয়ে থা হয়ে যাবে, শ্বশুরবাড়ি চলে যাবো, এই আর কি,” বলতে বলতে মুখ ঘুরিয়ে নিলো দাতু।

শ্যামল একটু হেসে বল্ল, “আমি চলে যাবো বলে মন খারাপ হোলো বুঝি।”

মুখ না ফিরিয়েই উত্তর দিলো দাতু। বল্ল, “মন একটু খারাপ হোলো বৈ কি। তবে আপনি চলে যাবেন বলে নয়। আপনি চলে যাবেন এতো জানা কথা, এখানে চিরকাল থেকে যাওয়ার জন্যে তো আসেন নি। মন খারাপ হোলো শুধু একথা ভেবে যে আমাদের কাছে আদর যত্ন ভালোবাসা পেলেন, সেটুকুই দেখলেন, কিন্তু এযে আপনার পাওনা সে কথা বুঝলেন না কিছুতেই।”

শ্যামল একটু চুপ করে থেকে বল্ল, “হাসিদির কাছ থেকে যা পেয়েছি, মানলাম সে আমার পাওনা, কারণ ও আমার দিদি। কিন্তু তোমার কাছ থেকে যা পেলাম সে আমার পাওনা হতে যাবে কেন?”

"আমি জানি না যান," বলে দাতু উঠে পড়ে এগিয়ে গেল সিঁড়ির দিকে। তারপর নামবার মুখে একবার ফিরে তাকিয়ে বল্ল, "কিই বা পেয়েছেন। যা পেতে পারতেন, তার কিছুই পাননি," বলে আর দাঁড়ালো না, তর তর কল্লে নেমে গেল সিঁড়ি দিয়ে।

একটি দমকা হাওয়া একটুখানি নাড়া দিয়ে গেল শ্যামলের মন। আকাশের মেঘ আরো জমাট হয়ে এলো। গাঢ় হয়ে এলো সন্ধ্যার অন্ধকার। শ্যামল বারান্দার রেলিঙের কাছে এসে দাঁড়ালো। দেখলো একটি বাঁশের তিনকোনা চাঁই নিয়ে ভূপতিবাবু এগিয়ে যাচ্ছেন পুকুর পাড়ের দিকে। পুকুর থেকে জল বেরুনোর নালার মুখে রাখবেন সেটি। খুব জোরে বৃষ্টি নামলে পুকুরের উপচে-ওঠা জলের সঙ্গে বেরিয়ে যাওয়ার পর বাঁশের চাইটির ভিতর আটকে যাবে চাঁদা, মুরলা জাতীয় ছোটো ছোটো মাছ। তারপর ভাজা হয়ে পরিবেশিত হবে রাত্তিরের খিচুড়ির সঙ্গে। অন্য সময় হলে এ সম্ভাবনা সিক্ত করতো শ্যামলের রসনা। আজ সম্পূর্ণ নিরাসক্তি বোধ করলো এ ব্যাপারে। কান পেতে শুনলো পুকুর পাড়ে ব্যাঙের ডাক। জমাট বর্ষণপ্রতীক্ষ অন্ধকারে তখন ঝিঁ ঝিঁর গানে আর পাতা মর্মরে মেলামেশি। আকাশটা মেঘে মেঘে শাদা হয়ে এলো। দাতুর কথা মনে পড়লো প্রত্যেকটি বিজলী চমকানোর সঙ্গে সঙ্গে। আর দীর্ঘ নিশ্বাসের মতো দমকা বাদলা হাওয়ায় বার বার মনে পড়লো লাতুরীর কথা।

কখন যেন বৃষ্টি নামলো ঝমঝমিয়ে। নূপুর বেজে চলার মত বৃষ্টি।

রাত হোলো। নিঝুম থেকে নিঝুমতর হোলো ক্রমশ। তাড়াতাড়ি খাওয়া দাওয়া সেরে শ্যামল দু'তলায় উঠে এলো। হাসিদির ছেলে জুনো এসে আব্দার ধরলো, মামা, একটি গল্প বলো।

"কি গল্প বলবো? আচ্ছা শোনো—

এক যে ছিলো রাজা,
শিয়ালে খেলো মাজা,
কুকুরে খেলো ঠ্যাং,
রাজার দাড়ি ঝাপটে ধরে নাচে কোলা ব্যাঙ।"

ছড়াটি জুনো অনেকবার শুনেছে। সুতরাং অত্যন্ত হতাশ হয়ে, আপত্তি জানিয়ে, প্রতিবাদ জানিয়ে সে প্রস্থান করলো।

শ্যামল গা এলিয়ে দিলো খাটের উপর। কেটে গেল অনেকক্ষণ। কিছুক্ষণ লাতুরীর কথা ভাবলো, কিছুক্ষণ ভাবলো দাতুর কথা। এত সকাল সকাল ঘুমিয়ে পড়বার ইচ্ছে হোলো না কিছুতেই। কিছুক্ষণ গল্প করার লোভে উঠে এলো হাসিদির ঘরে। হাসিদি তখন ঘুম পাড়ানোর চেষ্টা করছে তার ছেলে জুনোকে। দস্যি ছেলে, কিছুতেই ঘুমুবে না, আব্দার ধরেছে একটি ছড়া শুনবে। হাসিদি একটি ছড়া বলতে সুরু করলো তার সুরেলা গলায়, যেটি চাটগাঁর ঘরে ঘরে প্রত্যেক মায়েরা জানে আর বাদলা দিনে শোনায় তাদের দস্যি ছেলেমেয়েদের। শুনতে শুনতে ঘুমের আমেজ এলো শ্যামলের চোখেও, শুনতে শুনতে তারও মনে গেঁথে গেল ছড়ার কয়েকটি লাইন—

বৃষ্টি পড়ে লোছা লোছা ডাঙায় ওঠে কৈ,
জুনোর বাপ চল্ল শহর, সাম্পানে নেই ছই।
জুনোর মা'ও সঙ্গে যাবে সবাইকে দেয় তাড়া,
জুনোর চোখে ঘুম নেমেছে, জুনোর নেই সাড়া।
কর্ণফুলীর দু'কূল ছেপে উজান এলো বান
এমনি দিনে একলা জেগে আমার শুধু গান।
ঘুম পাড়ানীর সই আমি যে কোল-দোলানী মাসী
আমার গানে দূর দেশী কোন ঘুমপিয়াসীর বাঁশী,

গান গেয়ে আজ কূল পেলো না ঘুম পাড়ানীর সই—
বৃষ্টি ধারা লোছা লোছা, ডাঙায় জলের কৈ।

হাসিদির ঘর থেকে শ্যামল বেরিয়ে এলো বাইরের বারান্দায়। খানিকক্ষণ দাঁড়ালো চুপচাপ। বৃষ্টির ছাট লাগলো তার মুখে। মুখ ভিজে গেল। এলোমেলো দমকা হাওয়ায় কখনো স্পষ্ট কখনোবা মৃদু অস্পষ্টতায় ভেসে এলো—

মেঘের নীচে মেঘলা রাত আকাশ ভিজে-ভিজে,
চমকে ওঠা বিজুল শিখায় দেখতে সে চায় কি যে,
বানের জলে খুশির জোয়ার পাগল গাঙের কৈ—
শহরে যায় জুনোর বাপ সাম্পানে নেই ছই।
জুনোর মায়ের চুল ভিজেছে, মুখ ভিজেছে জলে,
জুনোর বাপের ছাতায় ফুটো তাই বা কে আজ খোলে।
গানের জোয়ার আবুল মিঞার মনের দরিয়াতে,
সে গান ঘিরে বর্ষা এলো মেঘের ইসারাতে।
শুনবে সে গান কাশেম আলির বৌটি সে আজ কই,
বৃষ্টি পড়ে লোছা লোছা, ডাঙায় হাঁটে কৈ।

বর্ষণ আরো প্রবল হয়ে এলো। জল জমে গেল সামনের উঠোনে। দূরে পুকুরপাড়ে ব্যাঙগুলো কখন নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। আমবনের পাতায় পাতায় শুধু নিষ্করুণ বর্ষণের অবিশ্রান্ত সাড়া। হাসিদির দুরান্ত কণ্ঠস্বর তারই ছন্দে ছন্দময় হয়ে উঠলো।

ঝমঝমানো বাদলা রাতে জমজমানো ঘুমে
ছমছমানো ছায়ায় ছায়া স্বপ্নের মরশুমে
আজ কারো নেই মনেই হায় আজ কারো নেই খেয়াল
জুনোর কনের খোঁজ আনবে বন বাদাড়ের শেয়াল।

শেয়াল এলে নিমন্ত্রণে কী দেবো তার পাতে—
লাক্ষা মাছের শুঁটকী দেবো বাঁশ-কোড়লীর সাথে,
ব্যাঙের ছাতার ছেঁচকী দেবো লটিয়া মাছের ঝোল,
ঘুম পেলে তার রয়েইছে তো পাতাই আমার কোল।
এমনি দিনে নিখোঁজ সেও, কনের খবর কই,
বৃষ্টি পড়ে লোছা লোছা উজান ওঠে কৈ।

ক্রমশ ভারী হয়ে এলো, ঘুম-জড়ানো হয়ে এলো হাসিদির গলা।

জুনো ভীষণ দুষ্টু ছেলে শুনবে না সে গান
কী জানি কোন রাজকন্যার জন্যে অভিমান।
পাঠিয়ে দেবো শ্বশুর বাড়ি শুনবে বৌয়ের কথা,
থাকবে শুয়ে জড়িয়ে গায়ে বৌয়ের হাতের কাঁথা।
বৌয়ের চোখের কাজল জুনোর ঘুমের মতো কালো,
সে চোখ দেখে জুনোর যদি পছন্দ হয় ভালো।
কোথায় তেমন বৌ পাবো আজ ভোলাতে তার রাগ,
আকাশে আজ মেঘে মেঘে কাজ ভোলানোর ডাক।
কর্ণফুলীর এপার ওপার তালবনে হৈ চৈ—
বৃষ্টি পড়ে লোছা লোছা, ডাঙায় ওঠে কৈ।

ক্রমশ মিলিয়ে এলো হাসি দির কথা গুলো। কতক্ষণ কেটে গেছে, রাত আরো কতো গভীর হয়ে এসেছে, অন্ধকার আরো কত নিবিড় হয়ে এসেছে, খেয়াল নেই। হুঁশ হোলো যখন শুনলো পেছন থেকে দাদু বলছে, "একি শ্যামল দা, আপনি এখনো ঘুমুতে যান নি। এখানে দাঁড়িয়ে ভিজছেন কেন ?"

শ্যামল ফিরে দাঁড়ালো। হাসিদির ঘর অন্ধকার। হাসিদি কখন ঘুমিয়ে পড়েছে।

"এখন অনেক রাত," দাতু বল্ল, "সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে, আমিও শুয়ে পড়েছিলাম। জানালায় বিজলী চমকাতে মনে হোলো কে যেন বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। বেরিয়ে এসে দেখি আপনি।"

তারপর চট করে দাতুর মনে পড়লো প্রত্যেক দিনকার মতো সে শ্যামলের বিছানাটি করে দেয় নি, মশারি খাটিয়ে দেয় নি। "ও, তাই তো! আমার মনেই ছিলো না। আসুন, আপনার বিছানাটি করে দি'," বলে ঢুকতে যাচ্ছিলো শ্যামলের ঘরে, শ্যামল তার হাতটি ধরে বল্ল, "থাক, সে আমি নিজেই করে নেবো' খন। তুমি দাঁড়াও একটুখানি। সারা সন্ধ্যে ভাবছিলাম তোমায় একটি কথা জিজ্ঞেস করবো কিনা। এই মাত্র স্থির করলাম যে জিজ্ঞেস করবো।"

"হাতটা ছাড়ুন। কেউ দেখে ফেলবে," দাতু বল্ল।

দেখুক গে। বলো আমায় বিয়ে করবে কিনা।"

কোনো উত্তর এলো না দাতুর কাছ থেকে। বাইরে ঝুপ ঝুপ বৃষ্টি।

"এই ক'দিনে তুমি আমার মনের ভিতরটা একেবারে ওলট পালট করে দিয়েছো দাতু," শ্যামল বলে চল্ল, "তুমি খেতে না দিলে খেতে ভালো লাগে না, তুমি বিছানা করে না দিলে শুতে ইচ্ছে করে না, তুমি চা করে না দিলে চায়ে কোনো স্বাদ পাইনে। বুঝলাম যখন, ভাবলাম তাড়াতাড়ি পালাবো এখান থেকে। ভেবেছিলাম তোমায় কিছু বলবো না। বল্লে হয় তো ভাববে লাতুরী আজ আর নেই বলেই তোমায় বলছি। কিন্তু লাতুরীকে আমি কোনোদিনই পাওয়ার আশা করি নি দাতু। আজ যেই চলে যাওয়া স্থির করলাম তখন দেখি লাতুরীর

কাছ থেকে দূরে সরে থাকা গেলেও তোমায় ছেড়ে দূরে চলে যাওয়া যায় না।"

"তোমার কি ধারণা লাতুরী দির কথা ভেবে আমি তোমার উপর অভিমান করবো শ্যামল দা," দাতু ধরা গলায় বল্ল, "ওকে যে আমিও খুব ভালোবাসতাম।"

"আমায় বিয়ে করবে ?"

দাতু বল্ল, "মাকে আর হাসি বৌদিকে বলো।"

"আমি কিন্তু বেশীদিন অপেক্ষা করতে পারবো না দাতু," শ্যামল বল্ল, "দিন পোনেরোর মধ্যেই দিন দেখে বিয়েটা করে তোমায় কলকাতা নিয়ে যাবো। সেখানে আমার নানা রকম কাজ। সব তুমি আর আমি মিলে—।"

"তুমি এখানে থাকবে না"? দাতু জিজ্ঞেস করলো।

"এখানে ? না দাতু," শ্যামল বল্ল, "এ জায়গা আমার পক্ষে বড়ো ছোটো! এখানে এই একটুখানি স্কুল চালানো, একটি দাতব্য চিকিৎসালয় নিয়ে দলাদলি করা, গাঁয়ের কিষাণদের ছোটো খাটো দাবী দাওয়া নিয়ে গাঁয়ের মাতব্বারদের সঙ্গে ঝগড়াঝাটি করা, শুধু এতে আমার চলবে না। আমার কাজের পরিধি আরো বড়ো।"

"কিন্তু আমার পক্ষে এসব ছেড়ে চলে যাওয়া সম্ভব নয়, শ্যামল দা," লাতুরী বল্ল," দিদি স্কুল করে গেছে, সেটি আমায় গড়ে তুলতে হবে, দেশে ডাক্তার বদ্যি নেই, বিনা চিকিৎসায় লোকে প্রাণ দিচ্ছে, কোয়েপাড়ায় পোয়াতির জন্যে ঝড়বাদল তুচ্ছ করে ডাক্তার ডাকতে ছুটে আসতে হয় নদী পেরিয়ে শ্রীপুরে, আর তারই জন্যে প্রাণ হাতে করে নদী পাড়ি দিতে হয় ডাক্তারকে, দেশের এ অবস্থায় ওই সামান্য দাতব্য চিকিৎসালয়টি বাঁচিয়ে রাখতেই হবে যে করে হোক। দিদির স্বপ্ন ছিলো একটি প্রস্থতি সদন

করা। সেটি আজ আমারও স্বপ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে শ্যামলদা। আমি গাঁয়ের গেরস্ত ঘরের মেয়ে, বিয়ে হলে হবো গাঁয়ের গেরস্ত ঘরের বৌ, একটি গাঁয়ের মধ্যে যেটুকু জীবন হাতের নাগালের মধ্যে পাবো তার বেশী কিছু আমার পক্ষে চাওয়া সম্ভব নয় শ্যামলদা।"

শ্যামল দাতুর হাতটি নিজের হাতের মধ্যে চেপে ধরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো। কোনো উত্তর দিলো না।

"শ্যামল দা, তুমি থেকে যাও এখানে। তুমি আমি মিলে এখানে অনেক কিছু করবার আছে।"

দূর আকাশে বিজলী চমকাচ্ছে। শ্যামল তাকিয়ে রইলো সেদিকে বৃষ্টি একটু কমে এলো।

"আর যদি এ গাঁ' ছেড়ে যেতে হয়ই, তাহলে তোমায় একলাই যেতে হবে শ্যামলদা'—।"

দমকা একটি হাওয়া নাড়া দিয়ে গেল বাড়ির জানালা দরজা।

"দাতু—!"

"কি ?"

শ্যামলের কথা শেষ হোলো না। দেউড়ির ওদিক থেকে কুকুরটি হঠাৎ ডেকে উঠলো। পায়ের সাড়া পাওয়া গেল বাইরের উঠোনের জল-কাদায়।

শ্যামল রেলিঙের ধারে এসে দাঁড়ালো। দেখলো ছায়ার মতো তিনজন লোক দাঁড়িয়ে আছে উঠোনের অন্ধকারে।

"কে ?" শ্যামল জিজ্ঞেস করলো।

"আমি," চাপা গলায় উত্তর দিলো কল্যাণ রায়, "চলে এসো বড্ড দরকার। আমাদের সঙ্গে একটু যেতে হবে।"

"এক্ষুনি ?"

"হ্যাঁ।"

শ্যামল নিজের ঘরে এসে ঢুকলো। একটি ব্যাগ পেড়ে নিলো আলনা থেকে।

"এত রাত্তিরে যাচ্ছো কোথায়," দাদু জিজ্ঞেস করলো।

শ্যামল ফিরে দাঁড়ালো। হাত দুটো রাখলো দাদুর কাঁধের উপর। বল্ল, "ফিরে এসে বলবো। এখন কিছু জিজ্ঞেস কোরো না।" ভাবলো একটুখানি। তারপর বল্ল, "আমার একটা উপকার করবে দাদু? কাউকে বোলো না যে আমি এ সময়ে চলে গেছি বা কল্যাণ এসে আমায় ডেকে নিয়ে গেছে। হাসিদিকে বোলো আমি খুব ভোরে ভোরে উঠে শহরে গেছি। শেষ রাত্তিরে জোয়ার বলে বেলা করে বেরুনো সম্ভব হয়নি। যাওয়ার আগে তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছে কারণ তুমি ভোরে উঠে বাগানে ফুল তুলছিলে বা বারান্দায় পায়চারী করছিলে, এরকম একটা কিছু, যা মনে আসে বোলো, কেমন? বোলো, আমি দু'চারদিনের মধ্যেই ফিরবো।"

"তুমি সত্যি সত্যি কবে ফিরবে বলো তো," দাদু জিজ্ঞেস করলো।

"পাঁচ সাত দিনের আগেতো নয়।"

"আমার ভয় করছে শ্যামলদা।"

শ্যামল হাসলো একটুখানি। "ভয়ের কি আছে দাদু?"

"তুমি সত্যি সত্যি ফিরবে তো? তোমার এ ভাবে চলে যাওয়া আমার ভালো লাগছে না।"

"তোমার কাছে আমার যে ফিরতেই হবে দাদু।"

ব্যাগ হাতে নিয়ে শ্যামল চুপচাপ নীচে নেমে এলো। পেছন দিকে ফিরে ও তাকালো না। দেউড়ির কাছে এসে একবার ফিরে তাকিয়ে

দেখলো, দু'তলার বারান্দায় আবছা অন্ধকারে দাদু নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

*　　　*　　　*

ফিরতে ফিরতে পাঁচ সাত দিনের জায়গায় পোনেরো দিন হয়ে গেল।

লাম্বুরহাটে অপেক্ষা করে ছিলো আবুলমাঝির সাম্পান। কল্যাণ বলে দিয়েছিলো নোয়াপাড়া থেকে সোজা শহরে চলে যেতে। কিন্তু শ্যামল ফিরে চল্ল শ্রীপুর। দাদুকে কথা দেওয়া আছে।

সেদিন পরিষ্কার চাঁদনী রাত। কর্ণফুলীর নীল ঢেউগুলো চাঁদের টুকরো টুকরো প্রতিবিম্ব বুকে নিয়ে ঝিলমিল করছে। দূরান্ত ওপারে তাল আর সুপুরীর ছায়াময় রেখার এখানে সেখানে আলোর ফুটকি। একটুখানি শানাইএর রেশ ভেসে আসছে। আজ কালের মধ্যে একদিন একটি বিয়ের লগ্ন আছে হয়তো। আবুল আস্তে আস্তে তার গানটি ধরলো,—বন্ধু, ওপারে ওই টিনের ছাউনি দেখেছো, সেখানে থাকে কাশেম আলি কেরাণীর বৌ…… ……..।

লঙ্কাক্ষেতের পাশ দিয়ে, চৌধুরীদের আম বাগান ডাইনে ফেলে, স্কুল বাড়ি পেছনে রেখে, বাঁশবনের ওপাশের ছায়াঘন পথ পেরিয়ে এসে পড়লো ভূপতি মজুমদারের বাড়ির পেছন দিকে। বেড়া ডিঙিয়ে পেছনের পুকুরের পাড় দিয়ে ঘুরে এসে দেখে শানাই বাজছে এ বাড়িতেই।

নিরামিষ রান্নাঘরটি পেরুতেই হাসিদির সঙ্গে দেখা।

"তুই?"

মনে হোলো হাসিদি যেন খুব অবাক হয়েছে শ্যামলকে দেখে। খুশিতে মুখ হঠাৎ ঝলমল করে উঠলো যদিও, তারপর যেন আশঙ্কার ছায়া নামলো মুখের উপর। শ্যামলকে নিয়ে তাড়াতাড়ি দুতলায় উঠে

এলো, পেছন দিকের বারান্দা দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে তাকে ঢোকালো উত্তর প্রান্তের ছোটো ঘরটিতে যেখানে সাধারণত কেউ থাকতো না, সম্প্রতি বাক্স পেটরায় ঠাসাঠাসি, সবই নিয়ে আসা অন্য ঘরগুলো থেকে।

সামনের বারান্দায় একদল মেয়ের ভিড়। মাঝের ঘরটিতে শাঁখ আর হুলুধ্বনি শোনা যাচ্ছে। হাসিদি ঘরের জানালাটি বন্ধ করে দিলো।

"ব্যাপার কি হাসি দি?"

"কেউ তোকে লক্ষ্য করে নি। তুই যে এখানে ফিরে এসেছিস একথা কেউ জানতে না পারাই ভালো।"

"কেন," জিজ্ঞেস করলো শ্যামল।

"পুলিশ এসেছিলো তোর খোঁজ করতে," হাসিদি বল্ল।

পুলিশ? একদিন না একদিন আসবেই সে কথা শ্যামল জানতো কিন্তু এত তাড়াতাড়ি এসে পড়বে ভাবতে পারে নি।

"খাস নি তো এখনো। দাঁড়া, তোর খাবার এখানেই নিয়ে আসছি। শোয়ার ব্যবস্থাও এখানেই করে দেবো আজকের মতো। তারপর দেখা যাক কি ব্যবস্থা করা যায়।"

"সে দরকার হবে না হাসি দি। আমি কালই চলে যাচ্ছি। এলাম শুধু তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে।"

হাসিদির চোখ দুটো ছলছলিয়ে উঠলো।

"কিন্তু বাড়িতে এত হৈ চৈ কিসের? শানাই বাজছে, কি ব্যাপার।"

"বিয়ে।"

একটু চুপ করে থেকে শ্যামল জিজ্ঞেস করলো, "কার? দাদুর?"

মাথা নাড়লো হাসিদি। "হ্যাঁ। আজ গায়ে হলুদ।"

খানিকক্ষণ কিছু বল্ল না শ্যামল। তারপর খুব সহজভাবে জিজ্ঞেস করলো, "কোথায় বিয়ে হচ্ছে?"

"বন্না। ছেলেটিকে তুই চিনিস। ডিসপেনসারির নির্মল ডাক্তার।"

তাড়াতাড়ি খাওয়া দাওয়া সেরে নিলো শ্যামল। তারপর শুয়ে পড়লো। বাইরে শানাই বাজছে। শাঁখের আওয়াজ আর হুলুধ্বনি ঘরের রুদ্ধ দরজায় বার বার প্রতিহত হয়ে ফিরে গেল। তারপর সোরগোল কমতে লাগলো আস্তে আস্তে। শানাই ক্ষীণ হয়ে ক্রমশ থেমে গেল। আরো নিস্তব্ধ হয়ে এলো চাঁদনী রাতে।

শ্যামল উঠে পড়লো। দরজা খুলে বেরিয়ে এলো বাইরের বারান্দায়। সতরঞ্চির উপর চাদর পেতে পাশাপাশি শুয়ে পড়েছে একদল অতিথি। তাদের পাশ দিয়ে পা টিপে টিপে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এলো। উঠোন পেরিয়ে, দেউড়ি পেরিয়ে সামনের পুকুরের ঘাটে এসে বসলো।

সেখানে চুপচাপ নিথর হয়ে বসে রইলো শ্যামল। তন্দ্রা নামলো তার চোখে। ছেলেবেলায় শোনা রূপকথাগুলো মনে পড়লো একটার পর একটা। মনে হোলো যেন একজনের পর একজন রাজকন্যা তার পাশে এসে দাঁড়াচ্ছে আর চলে যাচ্ছে। তারপর একজন এলো আর গেল না। শ্যামল চোখ বুজে তার নিঃশব্দ সান্নিধ্য অনুভব করলো। তারপর মনে হোলো যেন সে রাজকন্যা বসে পড়লো তার পাশে। মিষ্টি গলায় অস্ফুট সাড়ায় জিজ্ঞেস করলো, "কতক্ষণ বসে আছো?"

"অনেকক্ষণ। কিন্তু তুমি এখানে এত রাত্তিরে? কেউ যদি দেখে ফেলে?

"সবাই শুয়ে পড়েছে। আমি হাসি বৌদিকে বলে এসেছি," বল্ল দাতু।

শ্যামল আর কিছু বল্ল না। "কিছু বলছো না যে," দাতু জিজ্ঞেস করলো।

"কি বলবো ?"

"কিছু বলবার নেই," দাতু জিজ্ঞেস করলো।

"থাকবে না কেন, আছে, কিন্তু ওসব মুখে না বল্লেই তুমি আরো ভালো বুঝবে।"

অনেকক্ষণ চুপ করে রইলো দাতু। তারপর বল্ল, "হাসি বৌদি বল্লে তুমি নাকি কাল চলে যাচ্ছো।"

"হ্যা।"

"কেন ?"

"আমাদের এখানকার কাজ ফুরিয়েছে দাতু। এখানে আর কিছু করবার নেই।"

"কেন ?"

"আসাম সীমান্তের ওপার থেকে আজাদ হিন্দ ফৌজ আক্রমণ সুরু করেছিলো কোহিমায়। সেটি ব্যর্থ হয়েছে। ওরা ফিরে গেছে। ওরা আর আসবে না। আমরা যে আশায় ছিলাম সে আশা সফল হোলো না। এদিকে আর কিছু করবার নেই। তাই চলে যাচ্ছি।"

"এর পর কি করবে ?"

"কি করবো জানিনা। কোনো বাঁধা প্রোগ্রাম নেই। তবে একটা জিনিস বুঝে নিলাম। যা হয়ে গেছে সেটা নাড়া দিয়েছে সমস্ত দেশকে। কিন্তু এবার কাজ সুরু করতে হবে দেশের সাধারণ মানুষগুলোর ভিতর থেকে, তা নইলে শেষ পর্যন্ত কিছুই করা যাবে না। এককালে ট্রেড ইউনিয়ান আন্দোলনের মধ্যে ছিলাম, এখন দেখছি আবার তারই মধ্যে ফিরে যেতে হবে।" একটু চুপ করে থেকে তারপর বল্ল, "এই ক'দিন এখানে থেকে অনেক উপকার হয়েছে দাতু। শহরের

কুলি মজুর কেরাণীদেরই চিনতাম। গাঁয়ের মানুষদের ভালো করে চিনতাম না। এবার তাদের সঙ্গে ভালো করে চেনা হয়ে গেল।"

দাদু কোনো কথা বল্ল না। চুপচাপ অনেকক্ষণ। চাঁদ ঢলে পড়লো বকুল গাছটির আড়ালে। শেয়াল ডাকলো বাঁশ বনের অন্ধকারে। দূরে কোথায় কাদের বাড়ির বাচ্চা কেঁদে উঠলো।

দাদু বল্ল, "তুমি আমার উপর রাগ করছো?"

"না," শ্যামল বল্ল।

দাদু আস্তে আস্তে বল্ল, "আমি চেয়েছিলাম তোমায় নিয়ে সংসার পাততে এ গাঁয়েই। সেদিন দেখলাম তুমি দোটানায় পড়ে গেছ, এ গাঁয়ে থেকে যাবে, না কলকাতায় ফিরে যাবে। আমি যখন বল্লাম যে আমি ওখানে যাবো না, আমায় থাকতেই হবে এখানে, তখন মনে হোলো যেন তুমি রাজি হয়ে যাবে। কিন্তু তোমার কিছু বলা হোলো না আমায়, ওরা এসে তোমায় ডেকে নিয়ে গেল।

"সেদিন থেকে আশায় আশায় ছিলাম যে তুমি ফিরে এসে বলবে, আমি রাজি দাদু, এ গাঁয়েই ঘর বাঁধবো আমরা। কিন্তু হঠাৎ একদিন পুলিশ এলো তোমার খোঁজে। শুনলাম তুমি একজন আণ্ডার গ্রাউণ্ড কর্মী, আণ্ডার গ্রাউণ্ডে অরুণ গুপ্ত নামেই তোমার পরিচয় যা'তে নিজের আসল পরিচয়ে তুমি বাইরে সহজ ভাবে ঘুরে বেড়াতে পারো। তখন বুঝলাম, তোমার এ গাঁয়ের জীবনের ছোটো গণ্ডীর ভিতর যে আটকে রাখবো সে দুরাশা।

"ভাবলাম, তার চেয়ে বরং আমিই চলে যাই তোমার সঙ্গে। কিন্তু দেখলাম সে হয়না। দাদুরীদি যদি থাকতো, আমি চলে যেতে পারতাম। এখন আর পারিনা। ওর অনেক কাজের ভার এখন আমার উপর।

"এমন সময় নির্মল ডাক্তারের বাড়ী থেকে বিয়ের প্রস্তাব এলো। ভাবলাম, এই ভালো। তোমার সঙ্গে দেখা হলে হয়তো আমার মনে আবার সব কিছু ওলট পালট হয়ে যাবে। তাই তখুনি রাজি হয়ে গেলাম।"

শ্যামল হাসলো একটুখানি। বল্ল, "আমার এখানে থাকবার কথা নয়। তবু কেন এসেছিলাম জানো? জানতে এসেছিলাম তুমি আমার জন্যে অপেক্ষা করবে কিনা। সামনের দু'তিন বছর আমার পক্ষে খুব নিরাপদ নয়। কিন্তু তারপর ফিরে এসে এখানেই থেকে যেতাম নিজেদের বাড়িতে। মাকেও নিয়ে আসতাম, আমি, তুমি, মা, দাদু, বেশ থাকতাম সবাই মিলে।—এসে দেখি, এ বাড়ীতে শানাই বাজছে। বেশ মিষ্টি সুর।

• • • •

শ্যামলের যাওয়ার কথা তারপর দিন সন্ধ্যের পর, যাতে তার আসার বা চলে যাওয়ার খবর কেউ জানতে না পারে। দাদুর বিয়ের লগ্ন অনেক রাত্তিরে। বর আসবে আটটা সাড়ে আটটা নাগাদ। সন্ধ্যে হতে না হতেই হাসি খাইয়ে দিলো শ্যামলকে। বল্ল, "লোকজনের ভিড় হওয়ার আগেই তুই বেরিয়ে পড়।"

দাদুর সঙ্গে দেখা করে নীচে নেমে দেখলো বুড়ো গোপাল, মেম, কুন্তলা মাসী আর শঙ্খের মা দাঁড়িয়ে আছেন। হাসিদিকে, কুন্তলা পিসিকে প্রণাম করলো শ্যামল। কুন্তলা আঁচলের খুঁটে চোখ দুটো মুছে নিলো। আর কিছু বল্ল না।

হাসি দি বল্ল, "দিদিকে ভুলে যাসনি যেন। খোঁজ খবর নিস্।"

"তোমার মতো দিদিকে ভুলে যাওয়া যায় হাসিদি" শ্যামল বল্ল। "আবার একদিন ফিরে আসবো তোমার কাছে।"

শঙ্খের মা'কে প্রণাম করতে উনি শ্যামলকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেল্লেন। বল্লেন, "আবার আসবি তো? তুই ছাড়া সংসারে আমার তো আর কেউ নেই বাবা—।"

"চল তোকে ঘাট পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসি," গোপাল সেন বল্ল।

শানাইয়ে তখন বেহাগের আলাপ ধরেছে বাইরের দেউড়িতে। সেদিক দিয়ে গেলনা শ্যামল, পেছনের পুকুরের পাড় দিয়ে বেরিয়ে গেল। বেড়ার ওপারে গিয়ে শ্যামল একবার ফিরে তাকালো। নিরামিষ রান্নাঘরের পেছনে হাসিদি তখনো একটি লণ্ঠন হাতে দাঁড়িয়ে। চোখ দুটো জলে টল টল করছে।

বটের ঝুরি জড়ানো অন্ধকার শিবমন্দির পেছনে ফেলে, ঝাউবন পেরিয়ে, শ্যামল আর বুড়ো গোপাল সেন এসে পড়লো লঙ্কা ক্ষেতগুলির পাশে। পেছন পেছন শ্যামলের স্যুটকেস বয়ে নিয়ে এলো একজন চাকর। লঙ্কা ক্ষেতের পাশ দিয়ে ওরা হেঁটে চলে এলো কর্ণফুলীর পাড়ে। সামনে বিস্তীর্ণ কর্ণফুলী টলমল করছে। চাঁদ উঠে এসেছে পূবের তাল আর সুপুরি গাছের আড়াল থেকে, দূর থেকে অস্পষ্ট ভেসে আসছে শানাইয়ের সুর, আর আকাশের চাঁদ মেঘে মেঘে দুলছে তো দুলছে তো দুলছেই। দপ দপ করে একটি মস্তো বড়ো তারা জলছে পূবের আকাশে, আর রূপালী হিম পড়ছে কর্ণফুলীর বুকে।

আবুল মাঝি সাম্পান এনে বসে আছে অনেকক্ষণ। দাদুকে প্রণাম করলো শ্যামল। গোপাল সেন বল্ল, "তোর মাকে বলিস আমাদের কথা। একবার যেন এসে বেড়িয়ে যায়।" একটি টিফিন কেরিয়ার তুলে দিলো শ্যামলের হাতে। বল্ল, "খাবার আছে এর মধ্যে। তোর জ্যাঠাইমা নিজের হাতে তৈরী করে দিয়েছেন তোর জন্যে।"

"এবার যাই দাদু।"

"আয় তা' হলে," দাদু ম্লান হেসে বল্ল, "বুড়ো দাদুর খোঁজ খবর নিস। তার বিয়ের সময় আমায় নিয়ে যাস কিন্তু।" একটু চুপ করে থেকে বল্ল, "কি জানি তোর বিয়ে দেখা আমার কপালে আছে কিনা। দের বাড়ির কোনো মেয়েকেই তো আমাদের বাড়ির বৌ করে আনতে রলাম না।"

শ্যামল আবুল মাঝির সাম্পানে উঠে বসলো। আবুল মাঝি খেজুর ছের গুঁড়ি থেকে সাম্পানের কাছি খুলে নিলো। তারপর দাঁড় ফেল্ল লের বুকে। আজ আর সে গান ধরলো না। দাঁড় বাইতে লাগলো চাপ। শ্যামলের মনে পড়লো একদিন আবুল মাঝির সাম্পান তাকে য় এসেছিলো এই নদী বেয়ে। সেদিন দাঁড় বায় নি আবুল মাঝি। দিন সে সাম্পানে পাল খাটিয়েছিলো।

নদীর পাড়ে বুড়ো গোপাল সেন চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলো নিথর য়ার মতো। ক্রমে তাকে আর দেখা গেল না। শানাইয়ের রেশ মশ ক্ষীণ হয়ে এলো দূর থেকে আরো দূরে। শ্যামল একবার রে তাকালো। বহুদূর উত্তরে একসার তাল গাছ যেখানে জড়ো-ড়া, সেখানে শ্রীপুর গ্রাম, দাদু সেখানে ঘর করবে নির্মল ডাক্তারের । দক্ষিণের বাঁকে সুপুরি গাছগুলোর আড়ালে ছায়ার মতো কটি ছোট্টো টিনের ঘর—সেটি কাশেম আলি কেরানীর বাড়ি যে য়ে করেছে একজনকে, যাকে আবুল মাঝি বিয়ে করতে পারেনি। পাশে চাঁদের আলোয় ঝিলমিল করছে কর্ণফুলী, যেখানে লাতুরী আর খকুমার হারিয়ে গেছে। ঢেউ দোলা দিলো সাম্পানের গায়ে। সাম্পান ভীষণ দুলতে লাগলো। দূ... লুর ঘাটের পোল নদীর এপার থেকে ওপার জুড়ে আছে উদ্ধত প্রশান্তিতে। তার উপর য়ে ধোঁয়া উড়িয়ে যাচ্ছে খেলনার মতো ছোটো একটি ট্রেনের

ছায়ারেখা। ট্রেনের হুইস্‌ল্‌এ শিউরে উঠলো নদীর ঢেউগুলো। উদ্দাম জোয়ারের জলে দু'কূল ছাপিয়ে, এখানে কূল ভেঙে, ওখানে কূল জুড়ে, এখানের শ্যামল চর ভাসিয়ে নিয়ে, ওখানে নতুন বালুর চর তুলে চিরদিনকার মতো বয়ে চলল ঢেউ-টলমল কর্ণফুলী।